পথে প্রান্তরে

বেদুইন



বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা ৯ ॥

॥ প্রথম প্রকাশ ॥

॥ অক্টোবর ১৯৫৮ ॥

॥ প্রচ্ছদ ॥

শ্রীনীলরতন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীঅমৃতলাল কুণ্ডু কর্তৃক. আলোদয় প্রেস (১৭, হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা ৯) হইতে মুদ্রিত ॥

তারপর !

অসমাপ্ত কাহিনীর যবনিকা টানতে অনেক অনাহূত স্মৃতি বিশেষভাবে মনের কোণায় উঁকি দিতে আরম্ভ করেছে। কার কথা বাদ দিয়ে কার কথা বলব। কাউকে বাদ দিতে গেলে তার উপর অবিচার করা হবে, আবার অবিচার করা হবে নিজের উপর। কাহিনী ও কাহিনীকার, উভয়েই বঞ্চিত হবে।

ছুনিয়াটা আসা-যাওয়ার পথ। পরিচিতি অনেকের সাথে; কেউ ছায়া, কেউ কায়া। যারা কায়া তাদের প্রভাব অনস্বীকার্য, আর যারা ছায়া তারাও স্তিমিত-স্মৃতির গহ্বর থেকে অবচেতন মনকে পাথেয় সংগ্রহের পথ দেখায়। বিশিষ্টতা হয়ত তাদের নেই, গৌরব করবার মতো বস্তু তাদের হয়ত ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, তবুও তাদের বাদ দিয়ে মানুষের জীবন অচল হয়ে ওঠে সময় সময়। সহসা সামান্যের সঙ্গে সামান্য সৌহৃদ্যও সংশয়াকুল সংসারে স্থায়িত্ব এনে দেয় অপরিমেয়। সেই অপরিমিত লাভের মূল্য নিরূপণ অসম্ভব !

পাতুর মা আমাদের কেউ নয়; যে নয় সে যে হয় না, একথা বলা ঠিক হবে কি ! কেউ না হয়েও সে আমাদের অনেক কিছু। পারিবারিক জীবনে সে অনেকটা স্থান অধিকার করে রেখেছিল অনেক দিন, তার প্রত্যক্ষ প্রভাব আজও অনুভব করি, অনুভূতির মাঝ দিয়ে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করি। যে কেউ না হয়েও স্নেহের ভাণ্ডার উজাড় করে

দিয়েছিল, যার মমতার আঙিনায় পিছলে পড়তাম অনবরত, সেই অনাত্মীয়া রমণীর কাহিনী না বললে কাহিনী হয়ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ছোটবেলায় এতই স্নেহ পেয়েছি তার কাছে, যার পরিমাপ করবার সামর্থ্য আজ পরিণত বয়সেও সম্ভব নয়।

হয়ত জামবাটি ভর্তি চিড়ে-দুধ-কলা মেখে খেতে দিল। সামান্য আপত্তি করে বললাম, অত খেতে পারব না মামীমা।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পাতুর মা সাথে সাথে বলত, খুব পারবি, খুব পারবি।

খিদে নেই যে।

খা-খা, খুব খিদে আছে। আগের দিনে বামুনের মুখ দিয়ে আগুন বের হত, কলির বামুন তোরা, তোদের পেটের আগুনও নিভে গেছে দেখছি। নে, খা।

আমার পেট, আমি জানিনে—বলেই অনুযোগকে হাসি দিয়ে শুধরে নিলাম।

মামীমাও হাসির বদলে হাসি দিয়ে বলল, তা বটে। তোর ক্ষিদের কথা তুই তো বেশী জানবি। তবে, আমি তো তোর পেটে হইনি, তুই আমার পেটে হয়েছিস, বুঝলি।

যুক্তির অসারতা বুঝাবার ক্ষমতা যেমন সেদিন ছিল না, তেমন তাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলবার সাহসও ছিল না। হয়ত অক্ষুধায় গুরুভোজন হয়ে যেত, তবুও রাগ করতে পারতাম না। মামীমার হুকুম তামিল করতে দশটা অসুরের বল সংগ্রহ হয়ে যেত। তবুও মামীমাকে অখুশী করবার সাহস পাইনি।

আমাদের বিন্তিদিদি এসেছে। বিন্তিদিদির নাম শুনেছি, চোখে দেখিনি কখনো।

শুনেছিলাম আমার যখন তিন বৎসর বয়স তখন বিন্তিদিদির বিয়ে হয়েছিল। বছর না ঘুরতেই বিন্তিদিদির কপাল পুড়ল। সেই থেকে বিন্তিদিদি জ্যাঠামশায়ের কাছে থাকে। আমাদের বাড়ি থেকে তাদের বাড়ি দুদিনের পথ। তাদের সাথে দেখাশোনা করবার

সুযোগ হয়নি এ পর্যন্ত। এই চৌদ্দ বছর বয়সে বিন্তিদিদিকে প্রথম দেখলাম। যাকে বলে ডাকসাইটে সুন্দরী, গৌরবরনে লালের প্রলেপ, টানা-টানা চোখ, স্বাস্থ্যের লালিত্য উপচে পড়ছে তার সারা শরীর বেয়ে। তাকিয়ে দেখবার মতো তার রূপ। সে বয়সে অমন সুন্দর কাউকে দেখেছি বলে স্মরণ হয় না।

বিন্তিদিদি এসেছে চিকিৎসা করাতে। কি রোগ নাম জানি না। পুরুষ ডাক্তারের সাথে আমাদের প্রভামাসী আসে। অনেক কথা হয়, নানাগন্ধের ওষুধ দেয়, আমি গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসি ডাক্তারখানা থেকে। বিন্তিদিদি খায়-দায় গল্প করে, দাঁতে পোড়া তামাকের গুল দিয়ে ফচাৎ-ফচাৎ করে স্থানে-অস্থানে থুথু ফেলে। জ্বর-জারি নেই, সবল মানুষ—তার আবার ডাক্তার দরকার হয় কেন?—ভেবেই পেতাম না।

হঠাৎ একদিন পাতুর মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হাঁ মামীমা, আমাদের বিন্তিদির কি হয়েছে? অত ডাক্তার আসে তবু কখনো শুয়েও থাকে না, জ্বরও হয় না।

মামীমা আমার মুখের দিকে অনিমেষভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখল। তার সেই অন্তরভেদী দৃষ্টির কথা আজও আমার মনে পড়ে। মামীমা বোধ হয় দেখে নিল, আমার কিশোরসুলভ জানার ইচ্ছার বাইরে অন্য কিছু আছে কি না। আমি ভয়ে ঘাবড়ে গেলাম। মামীমা তার স্বভাবকোমল কণ্ঠে বলল, কানু, ওকথা জেনে তোর দরকার নেই, যখন বড় হবি তখন আপনা থেকেই জানতে পারবি।

তার দৃষ্টিটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট, এরপর জিজ্ঞাসা করবার ক্ষমতা আমার ছিল না। তার শালীনতাবোধ যে কত সূক্ষ্ম তা আজকে বুঝছি, অথচ সেদিন আমাকে সুস্থতার মাঝ দিয়ে দুর্মদ করে তোলবার চেষ্টাও তার কম ছিল না।

পূজাটা সবে পেরিয়েছে, দু-একদিনের মধ্যেই লক্ষ্মীপূজা। ষষ্ঠীর দিন থেকে লক্ষ্মীপূজার পরদিন পর্যন্ত মামীমার আমি স্থায়ী অতিথি। ভালমন্দ আমার উদরে প্রবেশ না করিয়ে সে শান্তি পায় না। এই শিশুসেবায় তার কি যে পরিতৃপ্তি, সে হয়ত নিজেই বলতে পারত না।

দুপুরবেলায় নদীর কিনারায় বন্ধুবান্ধব মিলে গাছতলায় তাস খেলছি। নতুন ব্রীজখেলা শিখেছি, তাই উৎসাহ অত্যধিক বেশী। সুবিধেমতো পেটকোঁচড়ে এক প্যাকেট তাস নিয়েই ঘুরতাম ফিরতাম। স্থান-অস্থান কিছু নেই, নিরিবিলি হলেই হল। সেদিনও জটলা বসিয়েছি। এমন সময় মামীমার রাখাল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল, চলেন গো বাবুর বেটা, দ্যাব-গির্নি ডাকিচ্ছে।

তাসের আসর জমজমাট। এমন সময় বাধা পড়ল। সহ্য হচ্ছিল না, সুধীর তো রেগেই উঠল। তাদের থামিয়ে বললাম, কেন রে?

সংক্ষেপে সে উত্তর দিল, তা জা'ন্ না। তার উত্তর দান ও প্রস্থান একই সময় ঘটায় নেহাত অনিচ্ছায় মামীমার দুয়ারে হাজিরা দিতে হল।

মামীমা আমার আগমন প্রত্যাশায় বসেছিল। উৎফুল্ল হয়ে বলল, তোর জন্যই বসে আছি।

কেন মামীমা?

লক্ষ্মীপূজা এসে গেছে, জানিস তো।

তাই বামুন ভোজনের নেমতন্ন দিচ্ছ বুঝি! জান মামীমা, পেটে তিল থাকলে পেটুক হয়, আমার পেটে দুটো মস্ত বড় তিল রয়েছে।

বুঝেছি পেটুকরাম, কিন্তু পূজার যোগাড় করেছিস কিছু?

কি আনতে হবে বল, এখুনি তোমার বাজার করে দিচ্ছি। এত ভাবনা কিসের?

বাজার তোর মামাই করতে পারে, যে কাজ সে পারে না সেইটে তোকে করতে হবে।

মামা পারে না এমন কাজ দুনিয়ায় আছে বলে তো শুনিনি। সারা দুনিয়া ঘুরে মামা পয়সা রোজগার করে, আর লক্ষ্মীপূজার যোগাড় করতে পারে না, এ কেমন কথা। তবুও বললাম, আমার সাধ্যমতো হলে করব বইকি।

আমার একটা মানসিক আছে। সে মানসিকের জিনিস যোগাড় হয়নি। দশগণ্ডা পদ্ম দিয়ে লক্ষ্মীর পূজা করব বলে মানসিক করে-ছিলাম, তুই যদি চৌধুরীর বিল থেকে পদ্মফুল তুলে আনতে পারিস

তা হলে মানসিক পূরণ হত। পারবি যেতে, সোনা ছেলে আমার, যাবি চৌধুরীর বিলে ?

সে যে অনেক দূর মামীমা। শহর ছেড়ে এক-দেড় মাইল যেতে হবে যে।

তুই কেমন ছেলেরে ? চৌদ্দ-পনর বছরের জোয়ান মদ্দ, এককোশ আধকোশ পথ আবার পথ না কি, ওতো নস্যি। পায়ে ব্যথা হবে বুঝি, বেশ, গরম তেল পায়ে মালিশ করে দেব, কেমন ?

মামীমা হাসল।

মামীমার সেই হাসিতে শ্লেষ ছিল কি না স্মরণ করতে পারছি না, কিন্তু তার ক্ষুর দীপ্তিতে আমার সুপ্ত পৌরুষ যেন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। কিশোর বয়সের সেই জাগ্রত যৌবনের সন্ধিক্ষণে চৌধুরীবিলের পদ্ম তো কোন ছার, আরও কিছু প্রয়োজন হলে সংগ্রহ করতে পারতাম। বললাম, বেশ, তোমার লক্ষ্মীর পায়ে চৌধুরীবিলের পদ্ম দেবই দেব।

পা বাড়াতেই মামীমা হাত চেপে ধরে বলল, নতুন গাইটা দুধ দিচ্ছে, একবাটি দুধ খেয়ে যা, কেমন ? অনেকটা পথ যেতে হবে।

চোঁ-চোঁ করে একবাটি দুধ গলাধঃকরণ করে রওনা হলাম। কিভাবে পথ পেরিয়েছি, তার সবটা আজও মনে করতে পারছি না। শহর ছেড়ে নেমে পড়লাম মাঠের রাস্তায়, আল ধরে এগিয়ে চলেছি। যাবার সময় উসমান উকিলের আমবাগানের বেড়া ভেঙে একখানা বাখারি নিলাম। পদ্মবনে কাদা বেশী। বাখারি রইল ডাঙা থেকে ডগা ভেঙে আনতে। বাখারি বললাম বলে সেটা বাখারি নয়, মোটা লাঠির চেয়ে অনুপাতে কম নয়।

পড়ন্ত বেলায় পদ্মবিলের কাশবন পেরিয়ে দোপায়া রাস্তা বেয়ে এলাম জলের কিনারায়। পদ্মচাকের ব্যাপারীর দল ঐ দোপায়া পথ ধরে চাক তুলতে আসে। কিনারায় কোনো পদ্ম নেই, পদ্ম তখন অগাধ জলে ভাসছে। কিনারায় ব্যাপারীদের মাটির গামলা বাঁধা ছিল। লাফিয়ে উঠলাম তারই একটায়।

এক-দুই-তিন,—কোঁচড় বোঝাই হয়ে গেল পদ্ম ফুলে। ফিরে এলাম ডাঙায়। সূর্য তখন পাটে বসেছে। রঙ-বেরঙের ভাঙা-ভাঙা

মেঘে আকাশ তখন ঢাকা। অত খেয়াল করবার সময় কোথায়, পদ্ম তুলে সাফল্যের আনন্দে তখন ছুটে চলেছি।

পাশের কাশবন নড়ে উঠল।

নড়বার সাথে সাথে শোনা গেল ঘোঁত ঘোঁত শব্দ। ফিরে তাকালাম। দেখলাম সপরিবারে শূকরী ধেয়ে আসছে। ভাববার অবসর নেই, আত্মরক্ষার তাগিদ বেশী। উসমান উকিলের বেড়া-ভাঙা লাঠিখানা সম্বল। এই সামান্য হাতিয়ার দিয়ে বন্য শূকরীর গতি রোধ করে আত্মরক্ষা করা কল্পনাও করা যায় না। আশে পাশে কোনো গাছও নেই। শূকরীর ভাবও 'রণং দেহি,' আমার মনের অবস্থা বলবার মতো কোনো অভিধান তৈরী হয়নি। ভয়েই হোক আর ভক্তিতেই হোক, কাশবনের দোপায়া রাস্তায় সটান শুয়ে পড়লাম। জয় বরাহদেব। বরাহযূথ নিঃশব্দে আমার পিঠের উপর দিয়ে পাশের ঝোপে প্রবেশ করল। মিটিমিটি চেয়ে যখন দেখলাম পরাক্রান্ত অবতার অন্তর্হিত হয়েছে, পাশের কাশবন অচঞ্চল, তখন লাফিয়ে উঠে দিলাম চোঁ-চা দৌড়। শহরের কিনারায় এসে যেন চেতনা ফিরে পেলাম।

মামীমার লক্ষ্মীর পায়ে পদ্ম দিয়েছি সত্যি, কিন্তু সেদিন প্রাণ বাঁচাবার যে আদিম প্রবৃত্তি জেগে উঠেছিল, সেটা মনে হলে মাঝে মাঝে আজও আঁতকে উঠি। বাঁচবার এই চেষ্টাই তো সভ্যতার স্রষ্টা, প্রাণী-জগতের স্থিতিকাল-ভোর সমান্তরাল এর গতি।

শুধু আমি নই, সবাইয়ের আদিম বৃত্তি বাঁচা আর সৃষ্টি করা। এই দুইয়ের কোথাও কোনো ফাঁক নেই। গুহামানবও এমনি ধারা ছিল, আজ সভ্য মানবও এমনি ধারা রয়েছে। রূপের পরিবর্তন ঘটলেও স্ব-রূপের পরিবর্তন সামান্যতম ঘটেনি।

জেলখানায় ছিলাম। অনেকদিন ছিলাম। পাশের সেলে থাকত মিঃ জনসন। জনসন খাস ইংরেজ নয়, তিন-চার পুরুষ ধরে ইঙ্গ-বঙ্গ। গায়ের রঙ তামাটে, চুলগুলো কদম্ব ফুলের মতো, নাকের মাথা মোটা। ইংরেজ রাজ্যে ওদের কতকগুলো চাকরি ছিল একচেটিয়া। যেহেতু জনসন এবং যেহেতু সে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, সেই হেতুই পাঠশালায়

নাম লেখা শিখবার সাথে সাথে রেলের চাকরি জুটে গেল। চাকরি খারাপ নয়, মালগাড়ির গার্ড। জন্‌সনী ভাষায় বলব, it's nice but tedious (সুন্দর অথচ কষ্টদায়ক)।

জন্‌সন নিজেকে রয়েল ফ্যামিলির লোক বলে পরিচয় দিত। পরিচয় দেবার সঙ্গে সঙ্গে গর্বে বুকটাও ফুলে উঠত।

যখন সে বিচারাধীন তখন জন্‌সনের বন্ধুরা ঠাট্টা করত। বলত, His Royal Highness (রাজপুত্তুর) কিন্তু নারীহন্তা।

জন্‌সন বাংলায় কথা বলে না, বড়জোর চোস্ত হিন্দীতে দু-চার জবান ঝেড়ে দেয়, নইলে ইংরেজের খাসখামারের বয়ান বলতে তার জুটি নেই।

আমার প্রতিবাসী, তবুও সমবাসী নয়। তাই কথা বলবার দরকার হয়নি কখনো। মাঝে মাঝে এসে দু-একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে যেত। এইটুকুই আমার সাথে পরিচয়, সিগারেটের ধুঁয়োর সাথে সে পরিচয় উড়ে যেত। ঘনিষ্ঠতা করবার দরকারও হয়নি।

একদিন জন্‌সন আদালতে গিয়ে আর সেলে ফিরে এল না। পরের দিন সকালবেলায় শেঠজি এল ঘর সাফ করতে। জিজ্ঞাসা করলাম, শেঠজি, ওঘরের জন্‌সন কোথায় গেল।

তার হুকুম হয়ে গেছে হুজুর।

কতদিনের মেয়াদ হল ?

শেঠজি ফালতুদের মেট। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, এ মেয়াদ আর শেষ হবে না হুজুর। খুনী আসামী, সাজা হয়ে গেছে। ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে।

ফাঁসি! নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম। খুনী আসামীর সাথে চাক্ষুষ পরিচয় এই প্রথম। তার চেয়েও অভাবনীয়, ঐ তাজা মানুষটিকে আইনের কঠিন অনুশাসনে মৃত্যুকে অযাচিতভাবে অথচ স্থির নিশ্চয় জেনে বরণ করতে হবে। কল্পনায় তার মৃত্যুকে যেন দেখতে পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম।

অতি মৃদুকণ্ঠে শেঠজি জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছেন হুজুর ?

না, কিছু না। আচ্ছা শেঠজি, তুমি কত বছর জেলে আছ ?

জেলে। মনে মনে হিসাব করে বলল, ছাব্বিশ বছর হয়ে গেছে হুজুর। শেঠজির সাদা দাড়ির মাঝ দিয়ে কালো কালো দাঁতগুলো দেখা গেল। অর্থাৎ শেঠজি হাসল, এর বেশী সে কখনো হাসে না।

কেন এলে জেলখানায়, তোমার কি কেউ নেই ?

নেই ! আছে হুজুর। ষোল বছর বয়সে কোলকাতায় এসেছিলাম পেটের দায়ে। ঐ যে দেখছেন নতুন কয়েদখানা, ওটা তখন তৈরী হচ্ছে। এ পাড়ারই এক বস্তিতে থাকতাম, রাস্তার গ্যাসের বাতি জ্বালাতাম, বেতন পেতাম পাঁচ টাকা। তখনকার দিনে পাঁচ টাকা অনেক টাকা হুজুর। তবে বস্তি তো জানেন হুজুর। সেখানে মানুষ কখনো মানুষ থাকতে পারে না।

ছত্রিশ জাত, আটত্রিশ মত, বিহান থেকে রাত অবধি ঝগড়া-দাঙ্গা, বে-আইনী চোলাই, মিথ্যার বেসাতি, পাপের অন্ধকুঠরি, চোর-বদমায়েস, সব কিছুর আস্তানা যেখানে সেখানেই গড়ে ওঠে গরীব মানুষের বসতি। গরীব ভাল থাকতে চাইলেও নেমে আসতে বাধ্য হয় কাদায়, ধীরে ধীরে তলিয়ে যায় পাপের তলায়, মানুষ আর মানুষ থাকে না হুজুর। এমনি ধারা বস্তিতেই বাস করতাম। না করেও উপায় নেই, আমার সামর্থ্য ওর চেয়ে বেশি কিছু দিতে পারে না। তাই নিরুপায় মানুষকে অন্ধকারে নেমে যেতে হয় সবার অজান্তে। আমিও নামতে বাধ্য হয়েছিলাম। গরীবী দুনিয়ার সব চেয়ে বড় অপরাধ।

একদল উড়ে ছিল ঐ বস্তিতেই। সকালে দুপুরে রাস্তায় জল দিত। রাত তিনটেয় ওরা বের হত হোস্ ঘাড়ে করে। ওরাও বেতন পেত আমার মতোই, অথচ ওদের হাতে পয়সা থাকত অনেক। প্রায়ই দেখতুম দামী দামী শাড়ি ওরা দেশে পাঠাচ্ছে। ধীরে ধীরে ওদের সাথে পরিচয় হল, ওদের সাথে হৃদ্যতা জন্মাল।

পানিগ্রাহী ওদের সর্দার। সে-ই বলল, এসে যাও শেঠ, নামেই শেঠ হলে চলবে না, কাজেও শেঠ হও। সকালবেলায়, বিশেষ করে গুমট রাতের শেষে ঘুমটা যখন গভীর হয়, তখন খোলা জানালার মাঝ দিয়ে হাত ঢোকালেই কিছু না কিছু পাওয়া যায়। বুঝলে শেঠ।

যাদের আছে তারা তো দেবে না, তাই নিতে হয়, নিতে জানতে হয়। পাঁচ টাকায় নিজের পেট ভরানই কষ্ট, এর উপর ঘর সংসারও রয়েছে।

পানিগ্রাহী হাসত।

কেমন যেন মনে হত হুজুর। ভয় হল। ওদের সাথে সাথ দিতে পারলাম না। এমনি করে দুটো বছর পেরিয়ে গেল। মাঝে মাঝেই দেখতাম পুলিস হামলা করছে বস্তিতে, বেঁধেও নিয়ে যাচ্ছে অনেককে। তারপর ক'দিন চুপচাপ।

মাস ঘুরতে না ঘুরতে কেউ কেউ ফিরে আসত, কেউ আসত দুমাস ছমাস পরে। জরু-বিবি থেকে যেত কারও। মেয়াদ শেষ হলে ফিরে এসে কেউ জরু-বিবি ফিরে পেত, কেউ পেত না। কারও বুক ফাটত, কারও বিকারও হত না। যাদের বুক ফাটত তারা মাথা ফাটাত, দাঙ্গা করত, আবার ফিরে যেত কয়েদখানায়। নইলে সেও জোটাত নতুন জরু-বিবি।

তবে ওখানে জাতের বালাই নেই। হিঁদুর ঘরে মোছলমান বউ, বাঙালীর ঘরে খোট্টা মেয়ে সব সময়ই দেখতে পাবেন। এতে কারুরই বলবার কিছু নেই, সবাই ভুলে গেছে তাদের আদি, কখনো চিন্তা করে না তাদের অন্ত, বর্তমানই তাদের সব। গরীবের শ্রীক্ষেত্তর।

শেঠজি দম নিয়ে সেলের মেঝেতে চেপে বসল।

ঐ দলের তুমিও সামিল হলে, কেমন?

বস্তিতে বাস করলে এমন না হয়ে উপায় নেই হুজুর। তখন জোয়ানমদ্দ হয়েছি, মনে মনে ঠিক করেছি মাসে মাসে কিছু জমিয়ে ভুজার দোকান খুলব। জমিয়েও ছিলাম কিছু। ঠিক উলটো দিকের ঘরটায় থাকত বরকত। চোলাই মদের মামলায় দশমাস মেয়াদ হয়ে গেল। ঘরে রইল তার বন্ধ্যা স্ত্রী, বয়স হবে বছর তিরিশ। একমাস, দুমাস করে ছমাস পেরিয়ে গেল। এতদিন কোনোরকমে সাঙ্গাতদের সাহায্যে সে চালিয়ে নিচ্ছিল।

শেষে অচল হয়ে গেল। মাঝে মাঝে নতুন লোককে তার ঘরে দেখতাম। শুনতাম অনেক কথা। বস্তির জীবনে পুলিস আর

জরু-বিবি পালান ডালভাতের মতো। পুকুরের জলেও পাথর কুচি ছুড়লে ঢেউ ওঠে। এতে কিন্তু বস্তির জীবনে কখনো কোনো ঢেউ ওঠেনি, উঠবেও না।

অনেকটা রাত হয়েছে। কাঠগোলায় রাম-নাম শুনে ফিরেছি। রাস্তায় তেলুরিফুলুরি আর শুকনো চানা খেয়ে রাতের হাঙ্গামা মিটিয়েছি। তিন হাত চওড়া আর ছয় হাত লম্বা কামরায় সম্পত্তির মধ্যে একখানা ছেঁড়া মাদুর আর একটা লোটা। সারাদিনের কাজ শেষ করে ঘরে ফিরে অন্ধকারেই গা এলিয়ে দিতাম, আলো জ্বালান কখনো দরকার হয়নি। পুরাতন অভ্যাস, এ অভ্যাস নিঃস্বদের স্বভাবজাত।

শেঠজিকে বাধা দিয়ে বললাম, তুমি এমন সুন্দর কথার বিন্যাস কি করে শিখলে?

আবার সেই তুষারধবল দাড়ির মাঝে কালো কালো দাঁতগুলো দেখা গেল।

বলল, আপনাদের মতো কত স্বদেশীবাবুর সেবা করেছি হুজুর, তাদের কাছেই শিখেছি। বাইরের জীবনকে ভোগ করতে চেয়েছি, টাকা চেয়েছি, ভেতরেও শুকনো থাকিনি কখনো। তবুও কয়েদ-খানার ভেতরে এসে টাকার মোহ কখনো জাগেনি, সব সময় নিজেকে তফাত করে রেখেছি। যেটুকু অবসর, কেটেছে আপনাদের সেবা করে। ওহো, বলে শেঠজি দাঁড়িয়ে পড়ল।

কি হল শেঠজি?

আপনার ঘড়িটা। ওটা ওখানে রাখবেন না হুজুর, চুরি হয়ে যাবে।

জেলখানায় চুরি! বল কি?

জেলখানা তো কাশী-মক্কা নয় হুজুর, এদেশের রাজাও চোর, প্রজাও চোর।

হুজুর জেলে কয়েকবার ঘানি টেনে বেড়ালে বুঝতে পারতেন জেলখানার আসল চেহারা কি! কয়েদীরা গাঁজা-ভাঙটা করে, বিড়ি টানে। তাদের তো পয়সা কড়ি নেই, তাই ডিবিসানের বাবুদের পকেট মারতে হয়। সাহুকার সেপাইরা আপনার ছশো টাকার ঘড়ির বদলে পাঁচ টাকার মাল জোগাবে। জানেন তো হুজুর, সুপার ছাড়া সব

শালাই সাহুকার। ভাগ-বাটোয়ারা শুনলে আমাদের মতো পুরান ঘুঘুও থু-থু করতে লজ্জা পায়। সে-সব থাক হুজুর, ঘড়িটা সামলে রাখুন আগে।

ঘড়িটা হাতে বাঁধতে হল।

বললাম, তারপর শেঠজি!

তারপর! শেঠজি আবার বসে দম নিল। তারপর! কুলুপ খুলে ঘরে ঢুকে শোবার ব্যবস্থা করছি, এমন সময় মনে হল কে যেন ঘরে ঢুকেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কে-রে অন্ধকারে?

আমি! আমি রতিয়া।

রতিয়া বরকতের ঘরওয়ালী। বস্তিতে ওরাই জরু-বিবি, সব কিছু।

তা, এত রাতে কেন?

দুআনা পয়সা দেবে শেঠ, সারাদিন খাওয়া হয়নি।

মনে হল, বলি, দেব না। বলতে পারলাম না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে কাছে এসে দাঁড়াল, বলল, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

সন্তর্পণে অন্ধকারে আমার বাঁ হাতটা চেপে ধরে বলল, এই দেখ, সব হাড্ডি বেরিয়ে পড়েছে।

তার শুকনো কাঁধে হাতখানা রেখে বলল, দেখলে তো, না খেয়ে খেয়ে এমনি হয়ে গেছি।

এই বোধ হয় প্রথম মেয়েলোকের ছোঁয়া লাগল, চমকে উঠলাম; খুন চন-মন করে উঠল, কেমন যেন পাগল হয়ে উঠলাম। তার নিঃশ্বাস এসে গায়ে পড়ছে। গরম নিশ্বাসের তাপে সারা দেহটায় আগুন ধরে গেছে। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিতেই সে হুড়মুড় করে আমার দেহের উপর গড়িয়ে পড়ল। উঃ, হুজুর আর বলতে পারব না।

বলতে বলতে শেঠ থমকে গেল। প্রথম জীবনের নগ্ন সত্যটাকে সে যেন সহ্য করতে পারছিল না।

রতিয়া থেকে গেল সেই থেকে।

দুআনা পয়সা হুজুর। দুআনা পয়সায় যাদের পেটের খিদে মেটে, তাদের দেহের খিদে মেটাতে কতক্ষণ। রাতের পর রাত অভিসার

চলল এমনিভাবে, আহার্য জুগিয়ে চললাম নির্বিকার চিত্তে। তারপর শুরু হল বায়না। আজ শাড়ী, কাল চুড়ি, তারপর একদিন রতিয়া বলল, চল শেঠ, অন্য কোথাও আস্তানা দেখি, বরকত আসবার সময় হল।

একথা এতদিন মনে হয়নি। বরকত একমাত্র আমার উঠতি জীবনের অংশীদার। অংশীদারকে ফাঁকি না দিলে জীবনের পুঁজিপাটি ঘরে ওঠান যায় কি হুজুর। কিন্তু রতিয়ার মূলধন তার দেহ, আর আমার মূল্য পাঁচ টাকা। সব মিলিয়ে কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল।

বাবা আদম থেকে আরম্ভ করে আজ অবধি মানুষ ঘর চেয়েছে; ঘর চেয়েছে বলেই অপরের ঘর ভেঙেছে। আমিও ঘর ভেঙে ঘর বাঁধলাম।

বলেছি তো, মূল্য আমার পাঁচ টাকা।

আয় বৃদ্ধির রাস্তা নেই। দুবছর ধরে ভাল হবার সেই যে চেষ্টা, সে চেষ্টা উবে গেল। একদিন,—সেই হাতে খড়ি, আজও মনে আছে। সন্ধ্যেবেলায় গ্যাসের আলো জ্বেলে আসছিলাম। দেখলাম পথের মোড়ে পাঁচ-ছবছরের মেয়ে, গলায় তার সোনার হার। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। ভয় আর ভাবনার শেষ নেই। মইটা গ্যাসের পোস্টে লাগিয়ে মেয়েটার মুখ চেপে ধরলাম, মালা ছিনিয়ে নিলাম। কেউ দেখল না, কেউ শুনল না, অসহায় শিশুর মুখখানাও অন্ধকারে দেখতে পাইনি। তার মুখ দেখলে হয়ত ছিনিয়ে নিতে পারতাম না। মইখানা রেখেই পালিয়ে এলাম। না;—শেঠজি থেমে গেল।

তারপর হুজুর, কত লোকের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছি, কত লোক এল আর গেল আমার দলে। দল বাঁধতে না পারলে পেট ভরে না, বিপদ-আপদে কেউ দেখে না, তাই এ লাইনে দল বাঁধাই বড় কথা। আগের দিনের বড়দিনে লাটসাহেব কোলকাতায় আসত, তাদের সাথে আসত রাজা-মহারাজার দল। সেই রাজা-মহারাজাই আমাদের শিকার। তাদের ঘরের মেয়েরা চৌরঙ্গীতে আসত বাজার করতে। তাদের হাতের ব্যাগ, গলার মালা, এগুলো ছিনিয়ে নিতাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, এতে লাভ কি হত শেঠজি?

আমার তো কেউ নেই হুজুর। এক ভাই ছিল, সে দেশে গাঁয়ে রাখালি করত। তার নামে জমি কিনতে লাগলাম। আজ সেই জমির আয় প্রায় পনেরো হাজার টাকা। তার ছেলেরা সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছে। কখনো কখনো দেহ-মনে আলস্য অনুভব করলে সেখানে গিয়ে দু-একমাস বিশ্রাম করে আসি।

রতিয়ার কি হল শেঠজি ?

যার দাম দুআনা, সে কি ঘর করতে পারে। প্রথম যেবার জেলে এলাম, সেবারেই সে পালিয়ে বাঁচল। তাকে হারিয়ে মনমরা হয়ে পড়েছিলাম। সেদিন মনে হয়েছিল, রতিয়া পালাল, রেখে গেল তার দেওয়া বৃত্তি।

বাইরে ঘণ্টা বেজে উঠতেই শেঠজি উঠে গেল। যাবার সময় বলে গেল, ঘড়িটা সামলে রাখবেন হুজুর। জেলখানার রাজাও চোর, প্রজাও চোর।

নিয়মিত জীবনের বিরাট অধ্যায় গড়িয়ে গড়িয়ে চলছিল। ক্যালেণ্ডারের অভাবে দেওয়ালে দাগ কেটে দিনের হিসাব রাখছি। হঠাৎ একদিন ঝড়ের বেগে জন্‌সন ঘরে এসে ঢুকল। উস্কখুস্ক চুল, গাল বসে গেছে, চোখ দুটো যেন ঠিকরে পড়ছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হল জন্‌সন ?

New life, নতুন জীবন!

কুঁজোটা তুলেই ঢকঢক করে জল খেতে লাগল। অবাক হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে তোমার ?

রাজার দয়া পেয়েছি, Long live the King, রাজা বেঁচে থাকুক।

সিগারেটের কৌটাটা টেনে নিয়ে একটার পর একটা সিগারেট সে টানতে থাকে।

সে বেঁচেছে !

জন্‌সন রাজার দয়ায় জীবন ফিরে পেয়েছে।

অভিশপ্ত জীবনের এক অধ্যায় শেষ হয়েছে।

*　　　*　　　*

রেলের গার্ড জন্‌সন, রাজার জাত। সে দয়া পেয়ে বাঁচল, বাঁচল না থেরেসা, তারও বাঁচার ইচ্ছা ছিল, চেষ্টা ছিল। সে-চেষ্টা ছিল সাধারণের চেয়েও অনেক বেশী।

জন্‌সনকে বাইরে বাইরে কাজ করতে হয়। চার-ছদিন পর ফিরে আসে ডেরায়। থেরেসা একাই থাকে ঘরে। নতুন বয়স, প্রচুর অবসর, সেই অবসর যাপনের সুযোগ সৃষ্টি করতে সে কখনো কার্পণ্য করেনি। জন্‌সন অত জানতও না।

হঠাৎ একদিন জন্‌সন ফিরে আসল অসময়ে। থেরেসা তখন ফারলোতে বেরিয়েছে, জন্‌সনের আজ আসবার কথা নয়, তাই সেও নিশ্চিন্তে বয়ফ্রেণ্ড নিয়ে নিষিদ্ধ স্থানে নাচের আসর বসিয়েছে।

জন্‌সন ফিরে এসে থেরেসাকে না দেখে খুঁজে হয়রান। অবশেষে নিষিদ্ধ স্থানে তাকে আবিষ্কার করল। আবিষ্কার নয়ত কি। তখন থেরেসার বসনভূষণ লজ্জায় মুখ লুকিয়েছে, মুখ দিয়ে আনন্দের ফেনা বেরুচ্ছে, আর বয়ফ্রেণ্ডেরও সমাবস্থা। রাঙা চোখের পাতাও নড়ছে না। মৌতাত ও মৌজ শালীনতাকে ব্যঙ্গ করে মেঝের কার্পেটে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

জন্‌সন রাজার জাত! রাজরক্ত নারীর অবিমৃষ্যকারিতায় টগবগ করে উঠল। সইতে পারল না। পেনসিল কাটা ছুরি ছিল পকেটে, সেখানাই কয়েকবার প্রবেশ করিয়ে দিল হৃদয়হীনার হৃদিস্থানে। বয়ফ্রেণ্ডের জ্ঞান অনেকটা ফিরে এসেছে। সে বুঝল, বিপদ সমূহ এবং পলায়ন বিধেয়। চোখের রঙ মনের রঙকে আটকে রাখতে পারল না। সে দিল চোঁ-চা দৌড়। অবশ্য যাবার বেলায় জন্‌সনের স্নেহস্পর্শ না নিয়ে সেও যেতে পারল না।

থেরেসার মৃতদেহ পড়ে রইল। জন্‌সন গেল থানায়। অনুশোচনায় নয়, বিতৃষ্ণায়।

জন্‌সন ভালবাসত থেরেসাকে। থেরেসাও বোধ হয় ভালবাসত। কিন্তু বাস্তব ভোগকে গণ্ডীর মাঝে রাখতে চায়নি, এই তার অপরাধ।

জন্‌সন খুনী, সে নারীর উপর পুরুষের অধিকারকে কায়েম করতে চেয়েছিল। নারীকে ঘর দিয়ে ঘরনী করেছি আর দিয়েছি সন্তান, সেই নারী চায় কি না ভোগের সীমান্ত দর্শন করতে। জন্‌সনের ইঙ্গ-রক্তের চেয়ে বঙ্গরক্ত চনচনিয়ে উঠল, নীতি জ্ঞানটা হঠাৎ টনটনিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াল। বিচার করবার বয়সও তার নয়, ক্ষমতাও তার নেই। অসহনীয় অপরাধ। উত্তপ্ত মস্তিষ্কের ইঙ্গরক্ত স্থির করল, এ অপরাধের শাস্তি মৃত্যু।

যোগ্য শাস্তি নিয়েই থেরেসা যীশুর রাজ্যে ফিরে গেছে। একমাত্র সে-ই বোধ হয় তার স্বামীকে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে গেছে রাজার জয়গান করবার। জন্‌সন গদগদ হয়ে আবার বলল, Long live the King.

জিজ্ঞাসা করলাম, এই বাঁচাটাই কি তুমি চেয়েছিলে ?

বাঁচতে চায় না কোন বেকুফ! বাঁচার রাস্তা তো নির্দিষ্ট নেই, অনির্দিষ্ট রাস্তায় মানুষ বাঁচতে চাইলে কত ধাক্কা সইতে হয়, তা তো বোঝ।

তাহলে একবার দিয়েছিলে কেন ?

জন্‌সন আবেগের সাথে বলল, এক সময় মনে হত থেরেসাকে খুব ভালবাসি। এ জগতে তাকে যখন সম্পূর্ণভাবে পাইনি, তখন পরজগতে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারব, এই ছিল ইচ্ছে। তার পর! বুঝলে মিস্টার, দেখলাম থেরেসা আমার কেউ নয়, আমিও তার কেউ নই। তার মূলধন ছিল তার রঙিন দৃষ্টি, সেই দৃষ্টিতে আমায় ধাঁধিয়েছিল। আমায় কেন, অনেককেই ধাঁধিয়েছিল, সে ধাঁধা কেটে গেছে মিস্টার। তার চিহ্নও মনের কোণে কোনো আঁচড় রেখে যায়নি। সে চেয়েছিল ভোগের পরিপূর্ণতা আনতে, আমিই বা কেন চাইব না, হয়ত পরিণাম সুখের হবে না, তবুও জীবনকে বঞ্চনা করতে পারব না। ভুল হয়েছিল মিস্টার।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জন্‌সন চীৎকার করে উঠল, New life—New life.

নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছে জন্‌সন। সে বাঁচতে চেয়েছে, হয়ত

বেঁচেছেও। তার বাঁচার দাবি স্বীকৃতি পেয়েছে কি না, সে নিজেও হয়ত তা জানে না।

সেদিন কাশবনে শূয়োরের ধাক্কা সামলে ঘরে ফিরে এসে মনে হল, শূয়োরগুলো যে গায়ের উপর দিয়ে দৌড়ে গেল, সে তো বুঝতে পারিনি। ভীতির পরশে দেহের তন্তু ও কোষগুলোও বুঝিবা অবশ হয়ে পড়েছিল। নইলে জ্ঞান হারিয়েছিলাম ক্ষণেকের জন্যও।

মামীমাকে একদিন বললাম ঐ ঘটনা। মামীমা হাসল। কোনো রকম সহানুভূতি তো দেখালই না, একবার আহাও বলল না, বরং হাসল।

তুমি হাসলে যে মামীমা?

ভাল্লুকের গল্প পড়িসনি?

পড়েছি। কেন বল দেখি?

যে বন্ধু বিপদকালে পালিয়ে যায়, সে বন্ধু নয়।

এ আর নতুন কথা কি, কিন্তু সেদিন আমার কোনো বন্ধুই ছিল না।

ছিলরে ছিল, তুই দেখতে পাসনি।

একটু ভেবে বললাম, ভগবানই সেই অদৃশ্য বন্ধু, কেমন?

না! ভগবান অদৃশ্য, কিন্তু বন্ধু নয়; বন্ধু তোর মন, যে মন তোকে বাঁচতে শিখিয়েছিল।

বাঁচবার মন আর বাঁচার মতো সামর্থ্য সৃষ্টিই সব চেয়ে বড় বন্ধু।

অখ্যাত পল্লীর অশিক্ষিত মহিলার কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। আজ সেই শিক্ষাটাকে অস্বীকার করতে পারছি না। নিজের বাস্তব জীবনের সাথে সঙ্গতি রেখে মামীমা যা বলত, তাতে অহমিকা জেগে উঠত, দুর্দান্ত হয়ে উঠত দেহ, দুর্মদ হয়ে উঠত মন।

শেঠজিও বাঁচতে চেয়েছে, জনসনও বাঁচতে চেয়েছে।

সবাই বেঁচেছে। বাঁচার মতো বাঁচতে হয়ত কেউ পারেনি, হয়ত বাঁচার মতো বাঁচতে চেয়ে নিজেকে অণু অণু করে লয় করে দিয়েছে।

অদৃশ্য বন্ধু তাদের পথ দেখাতে পারেনি। যে পথে তারা পা দিয়েছে, সে-পথে মরণকে আপন করে বাঁচাকে ব্যঙ্গ করা ভিন্ন অন্য কোনো বৃত্তি নেই।

জেলখানার একঘেয়ে জীবনে এই হল নতুনত্ব, এই হল নব শিক্ষায়তনের নব শিক্ষা।

কত বাকি রয়ে গেছে জানবার। জানবার প্রয়োজন শেষ হয়নি, জানবার পথ বন্ধ নেই, তবুও জানবার কত বাকি!

লঙ্গর থেকে খাবার দিয়ে যেত তরিবত মিঞা।

সবাই বলত মিঞাঠাকুর।

মিঞাঠাকুর সাক্ষাৎ দ্রৌপদী। বড় বড় ডেকচিতে যখন নৌকার বৈঠার মতো হাতা খুন্তি নাড়ত, তখন মনে হত দ্রৌপদীর নব পুং-সংস্করণ না হয়েই যায় না।

এক গামলা হলদে রঙের জলে হাতা ডুবিয়ে ভাতের উপর ঢেলে দিত। ওর নাম মাছের ঝোল। ঝোলে জল থাকত, রঙ থাকত, মাছ থাকত না। মাছ থাকত সানকিতে। কোনো মেশিন দিয়ে যেন কাটা। অতি সন্তর্পণে আধ তোলা ওজনের মাছের টুকরো সানকিতে ফেলে দিয়ে মিঞাঠাকুর হাসত।

কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলত, গাঙের মাছ কর্তা রেসের ঘোড়া। লাগাম না হলে ঘোড়া যেমন কদম ওঠায় না, তেমনি সানকিতে না রাখলে কয়েদখানার মাছের টুকরা জিবের তলায় পৌঁছায় না। রেসের ঘোড়ার মতো টগবগিয়ে দৌড়ে বেড়ায়।

তরিবত হাসে।

একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, মিঞাঠাকুর, এত লোক থাকতে তোমার কপালে লঙ্গর কেন?

খোদার কুদরত হুজুর। ভালটাও পেয়েছি, মন্দটাও পাব। এই দুটো বাদ দিয়ে তো দুনিয়ার হাটে সওদা বিকোয় না।

তাই বুঝি ত্রিনশ ছেবট্টি।

হুঃ-হুঃ করে তরিবত হেসে আবার কাজে মন দেয়।

* * *

সেলাম কত্তা!

তরিবতের মুখের দিকে চেয়ে হাসলাম। জানতাম কোনো দরকার না হলে তরিবত লম্বা সেলাম দেয় না।

কি খবর মিঞাঠাকুর?

ওডোর হয়েছে কত্তা।

কার?

ঐ সুখিলবাবু, নেত্যবাবু, বিশেবাবু, আরও দশ-বারো জনের।

তরিবত খানিকটা ভেবে নিয়ে বলল, আপনার ওডোর হয়নি কত্তা?

ছাড়পত্র সই হয়নি মিঞাঠাকুর। যারা আজ খালাস পেল তারা কয়েদী নয়, তারা বে-আইনী আইনে আটক ছিল। প্রমাণ ছিল না, তাই খালাস পেল। আমার তো তা হবার নয়। তবে মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে মিঞাঠাকুর। বছর না ঘুরতেই ওডোর হবে।

তরিবত হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল।

কাঁদছ কেন তরিবত?

বাবুরা খালাস পাচ্ছে, দেশের লোকে গলায় মালা দিয়ে সোহাগ জানাচ্ছে কত্তা। আর, কি ভেরম করলাম, মেয়েলোকের পেছনে ঘোড়দোড় না করলে বোধ হয় এ-হাল আমার হত না। আপনাদের মতো যদি আসতে পারতাম!

চোখ মুছে তরিবত নেমে চলে গেল।

ভাবছিলাম দেশের জন্য আমাদের চেয়েও যাদের দান বেশী, দাম তাদের কত কম। সে কথা তরিবতকে বুঝিয়ে বলতে পারিনি। বোঝাবার মতো ক্ষমতাও বোধ হয় সেদিন ছিল না।

দিনগুলো পেরিয়ে যেত, আজও পেরোয়। অটোমেটিক যন্ত্রের চাকা ঘুরছে, কেউ থাকলেই কি, না থাকলেই কি, চাকার গতি শ্লথ হয় না কোনো সময়ই। জেলখানার একঘেয়ে জীবনও চাকার তালে তালে চলত।

তরিবতের জন্য বড়ই দুঃখ হত।

মানুষের সরল বিশ্বাস অজ্ঞতা সৃষ্টি করে, অজ্ঞতা আইনের চোখে নিরপরাধ গণ্য হবার মাপকাঠি নয়। তরিবত তা জানত না। গাঁয়ের ওসব সাদাসিধা মানুষ নিজেদের মন দিয়েই ভালমন্দ বিচার করে। ইংরেজের কঠিন আইনের নিগড়ে বেঁধে তাদের অসরল আর সভ্য করা হয়েছে। শাশ্বত মানবধর্মের দুয়ারে তাদের আবেদন ব্যর্থ হয়েছে, সভ্য মানুষকে তারা ভয় করে। সভ্য হতে ওরা পারেনি, হয়ত পারবেও না, তাই এত দুর্ভোগ।

তরিবতের চোখের জল শুকোয়নি, কাঁদার তার শেষ নেই, সকাল থেকে শোবার পূর্বমূহূর্ত অবধি পাঁচবার আল্লার দুয়ারে তার ভুলের মার্জনা চাইছে, মার্জনা সে পেয়েছে কি না জানি না, আরও তিনটে বছর তাকে খেসারত দিতেই হবে। মানুষের দুয়ারে সামান্য ভুলের যে মার্জনা পায়নি, সে আল্লার দুয়ারে মার্জনা পাবে কি?

অনেক দিন আমার সেলের মেঝেয় বসে তরিবত কেঁদেছে, জিজ্ঞাসা করেছে, খোদার বদদোয়া থেকে তার রেহাই আছে কি না। জবাব দিতে পারিনি।

একদিন বললাম, মিঞাঠাকুর, দুনিয়া বড় কঠিন ঠাঁই।

হাঁ কত্তা। তা না হলে, আমারই বিয়ে করা বিবি, সে-ই হল পর। আদালতে দাঁড়িয়ে বে-সরমী কথা বলল। বেইমানের মতো না-জবানী কথা বলল।

তা নয় মিঞাঠাকুর, আকালের বছরে তোমার ঘরে খুদকণাও ছিল না। যার থাকে না তার ঘর বাঁধবার অধিকারও থাকে না। সেটা তো তুমি জানতে না। তা যদি জানতে ···

তরিবত বাধা দিয়ে বলল, নছিরনকে কখনো কষ্ট দেইনি কত্তা, নিজে না খেয়েও তাকে খাইয়েছি। পীরপুরের মোকসেদ হল নাটের গুরু। সে-ই বিবি ভাগিয়ে নিয়ে গেল। তালাক দিতে বাধ্য করল।

মোকসেদ পয়সাওয়ালা, তারই তো ভোগ করবার অধিকার রয়েছে। তোমার সে অধিকার ছিল না মিঞাঠাকুর। আগের দিনে সংসার গড়ে

উঠত মহব্বত আর নেক দিয়ে, আজকের দিনে সংসার গড়ে উঠেছে রূপো দিয়ে। জমানা বদল হয়ে গেছে।

কিন্তু দু বছর যেতে না যেতেই আবার চাষ-আবাদে সোনা ফলল, আবার আমার গোলায় ধান উঠল, মরাই বাঁধলাম। ফিরে চাইলাম নছিরনকে। আমারই বিয়ে করা বিবি। একদিন পয়সা ছিল না বলে চলে গেছে, আজ পয়সা হয়েছে, সে কেন আসবে না? তালাকী বিবিকে নিকা করবার অধিকার আমার কি ছিল না!

কেন ছিল না সে কথা তুমি না বোঝ এমন নয়; তাই শোক জেগেছিল তোমার মনে। পুরান বিবির শোকে তাকে চুরি করে এনেছিলে।

তরিবত রেগে উঠল। বলল, চুরি, বলেন কি কত্তা। আমার বিবি, ক'দিন পরের ঘর করেছে, তাতেই কি সে পর হয়ে গেল। সাত বছরের সুখদুঃখের কথা সে বেমালুম ভুলে গেল।

তাই হয় মিঞাঠাকুর। অন্তত তোমাদের আইন তাই বলে।

তাই বলে! বলুক কত্তা, কিন্তু কি করে নছিরন আমার খেলাপী কথা বলল, তাই ভেবে পাচ্ছি না। ঘর না করলে খেলাপী কথা বলতে হবে, এ কোন বিচার। বিবি-জরু সব যাক তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু আমারই বিবি— তরিবত দুঃখে ফুঁপিয়ে উঠল।

তরিবতকে সান্ত্বনা দেবার কিছু নেই। সে সব সান্ত্বনার বাইরে। নিজের বিবি পর হয় এটা সে বিশ্বাস করেনি। তাই মাশুল দিচ্ছে। কে যে কার আপন, সে-কথা স্বয়ং স্রষ্টাও বলতে পারে না, আমি তুমি কোন ছার।

তরিবত চায় স্বদেশী বাবুদের মতো মালা গলায় দিয়ে বাইরে বের হতে। মানুষ যশ চায়, অর্থ চায়; মহিষমর্দিনী দেবীর পূজা তো এই কারণেই হয়ে আসছে যুগযুগান্ত ধরে। পায়নি কেউ, পাবেও না। আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি কোথায়!

তরিবত চলে যেতেই মনটা ব্যর্থতার অনুশোচনায় গুমরে উঠল।

•

সেই বন্দীশালার ক'টা দিনের স্মৃতি প্রখর করে তুলত তরিবত,

জন্‌সন আর বান্ধবদের দল। শেঠের শুভ্র দাড়ির মাঝখানটায় কালো কালো দাঁতগুলো আর তার সারা জীবনের ছোট ছোট কাহিনী মুগ্ধ করত, বিতৃষ্ণার আবরণ টেনে দিত অবচেতন মনে। জন্‌সন ভাবিয়ে তুলত ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্নকথা বলে। তরিবত গুমরে মরত, সেই গুমরানিতে আমিও কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়তাম।

দুর্দান্ত মানুষের ভুল আর নির্ভুল-ভরা জীবনগুলো মনের কোণে এমন রেখাপাত করেছে যে, তাদের ভুলতে পারিনি। বিস্মৃতির কোন অন্ধকারে এসব অশান্ত চিন্তা লুকিয়ে থাকে, তা কেউ বলতে পারে না। সময়ে অসময়ে মনের কোণে উঁকি দিয়ে শুধু মনকে আচ্ছন্ন করে তোলে।

পাতুর মা-ও কেমন একটা আবেশ সৃষ্টি করেছিল। মনে হয়, জীবনটা দুর্মদ দুর্দান্ত করে গড়ে তোলবার গোড়ায় তার কৃতিত্বই সব চেয়ে বেশী। পরবর্তী জীবনে নানা দেশের নানা শ্রেণীর লোকের সাহচর্যে জীবনটা হয়ে উঠেছে পথচারীর আক্ষেপপূর্ণ পদক্ষেপ-ভরা গতির মতো। তার গোড়ায় রয়েছে পাতুর মা-র প্রভাব। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে আজও সেটা অনুভব করে থাকি।

সেই পাতুর মা এখনো বেঁচে রয়েছে। যেদিন পাতুর বাবা মারা গেল, সেদিন তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম, এত বড় শোকটা সে ভুলতে পারবে কি, বাঁচবে কি সে এই শোকসন্তপ্ত জীবন নিয়ে? আমার সে-চিন্তাকে ব্যঙ্গ করেই শুধু সে বেঁচে নেই, সে বেঁচে আছে আরও অনেক কিছু হারিয়ে।

পাতুর বিয়ে। কাকারা বিয়ে ঠিক করেছে। করেছে না বলে বলা চলে করতে বাধ্য হয়েছে। পাড়ার দশজন পাতুর বয়সের দিকে চেয়ে কাকাদের স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল, বিয়েটা অতি প্রয়োজন। পাতুর বাবা থাকলে বিয়েটা অনেক আগেই হয়ে যেত, এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে অনেকে। অবশেষে বিয়ে একটা ঠিক হল। পাত্র ভাল—

সবল সুস্থ দেহ, ছাত্রবৃত্তি পাস করে আদালতের বটতলায় মুহুরীগিরি করে দু পয়সা কামাইও করে। বয়সের পরিমাপে মানাবেও ভাল।

পাতুর মা সন্ধ্যেবেলায় চুপিচুপি এসে বলল, পাতুর বিয়ে ঠিক হয়েছে, বুঝলি ?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে পাত্রের ঠিকুজি-কোষ্ঠী শুনে নিয়ে বললাম, ভালই হল।

বিয়ের সময় থাকিস কিন্তু।

কলেজ খুলে যাবে মামীমা। থাকার ইচ্ছা থাকলেও থাকতে পারব না।

পাতুর মা কোনো কথা বলল না, শুধু তার গাল বেয়ে চোখের জল নেমে এল।

হতভাগিনীর অব্যক্ত ব্যথা আমার বুকে শেলের মতো বিঁধতে লাগল। হঠাৎ বলে উঠলাম, বেশ, বিয়ের দিন থাকলেই তো হল।

আঁচলে মুখ মুছে বলল, ঐ তো একটাই আমার সম্বল, তার বিয়ে, তুই তার বড় ভাই, তুই না থাকলে বিয়ে সম্পূর্ণ হবে কি ? মনে আছে কি তোর, পাতু যেদিন জন্মাল সেদিন পাতাসী মাছ হাতে করে এসে তুই বলেছিলি, ওর নাম রইল পাতাসী ? সেই পাতাসীই তো তোদের পাতু। তার বিয়েতে তুই না থাকলে সব পণ্ড হয়ে যাবে।

কেমন লজ্জা বোধ হল, আরক্ত মুখে বললাম, সব জানি মামীমা, ওসব কথা থাক, বিয়ের দিন ঠিক আসব, তুমি জোগাড় করতে থাক।

পাতুর বিয়ের দিন প্রতিশ্রুতি মতো কলেজ কামাই করেও দুপুরে বাড়ি ফিরতে হল। বিয়েতে জোগাড় ভালই হয়েছিল। আমার করবার মতো কিছুই নেই। তবুও আসতে হয়েছে।

পাতুর মা-র সাথে দেখা করে এসে নিজেদের বৈঠকখানায় পিতৃ-পিতামহদের পুরাতন বইগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করছি, সন্ধ্যেও পেরিয়ে গেছে, এমন সময় দৌড়তে দৌড়তে পাতুর মায়ের সেই পুরান রাখাল এসে বলল, বাবুর বেটা, দ্যাব-গিন্নি ডাকিচ্ছে।

দ্যাব-গিন্নির ডাক অনেক শুনেছি। আজ বিয়ে-বাড়িতে ডাক পড়বে জানতাম, তবুও হন্তদন্ত হয়ে কেউ ডাকতে আসবে ভাবতে

পারিনি। তার পেছন পেছন তাদের বাড়িতে হাজির হলাম। প্রয়োজনটা যে গুরুতর তা বুঝতে কষ্ট হল না।

ভীষণ গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। পাত্র ও কন্যা উভয়পক্ষের 'রণং দেহি' ভাব। অনেক কষ্টে যা ঘটনার বিষয়বস্তু উদ্ধার হল, তাতে বুঝলাম একপক্ষের অপরাধ সংখ্যাতিরিক্ত বরযাত্রী আনয়ন, অপর-পক্ষের অপরাধ প্রতিশ্রুতি মতো অলঙ্কারের সামান্য কম সরবরাহ। বৈষয়িক ক্ষেত্রে দুইটিই অত্যধিক অপরাধ। আমার মতো কলেজে-পড়া ছেলের কাছে এটা মোটেই কিছু নয়। কিন্তু যাদের কাছে অনেক কিছু তারা সহ-অবস্থান নীতিকে স্বীকার করে না, তারা জানে মনুষ্যজীবনে এই একমাত্র সুযোগ যখন লেনদেনকে পুরোপুরি কায়েম করতে না পারলে জাগতিক বিধান অনুসারে মূর্খ বলে প্রমাণিত হতে হয়।

এই হট্টগোলের মাঝে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলাম না। যার আহ্বানে এসেছি তাকেই খুঁজছিলাম। রোদনমুখী মামীমাকে পেতে দেরি হল না। অন্তরালে ডেকে বলল, বাবা তুই না থাকলে এর মীমাংসা হবে না, আমার মেয়ের আর গতি হবে না। শেষে বিয়ে যেন ভণ্ডুল না হয়।

এক জোড়া সোনার বালা আমার হাতে দিয়ে বলল, এই বালা আমার শেষ সম্বল, এটা বিক্রি করে এখুনি বরযাত্রীদের ব্যবস্থা কর, আর বাকি সোনার ব্যবস্থা কর বাবা।

আমি একটু ধাঁধায় পড়লাম। এ রকম অভিজ্ঞতা এই প্রথম। তবুও সাহসে ভর করে বললাম, তুমি বালা তুলে রাখ মামীমা, যদি দরকার হয় তখন নেব। দেখি, সকলকে থামাতে পারি কি না। মিষ্টি কথায় ব্রহ্মা বশ হয়, আর মানুষ বশ হবে না।

বিয়ে আটকে রইল না। জোর করেই বরকে আসনে বসালাম, জোর করেই বরযাত্রীদের খাবার সংগ্রহ করতে বাধ্য করলাম। মনটা তবুও খুঁত খুঁত করতে লাগল। একটি পরিবারের সাথে অপর একটি পরিবারের বংশপরম্পরায় যে সম্বন্ধ সৃষ্টি হতে চলেছে, সেই শুভ প্রয়াসে এমন দোকানদারীই বা কেন আর এমন অশান্তিই বা

কেন। নিজের কাছে কোনো কৈফিয়ত খুঁজে পেলাম না, যুগ-যুগান্তের সামাজিক ক্লেদ কেমন যেন বোমার মতো ফেটে পড়ে বাইরের জগৎটাকেও নোংরা করে তুলেছে। ভেবেই পেলাম না এর মূল কোথায়।

কন্যাপক্ষের কৈফিয়ত অর্থের অপ্রতুলতা। তাহলে তার নিশ্চিত পরিণতি, অর্থ যার নেই, তার কি বিয়ে হবে না! তার জবাব সমাজ আজও দিতে পারেনি। বিয়ে দেবার যুক্তি তারা অস্বীকার করেনি অথবা করে না, কিন্তু সে-বিয়ে হবে অর্থের মানদণ্ডে, মেয়ে-পুরুষের প্রীতি-ভালবাসার মানদণ্ডে নয়, অভিভাবকের সামর্থ্যের মানদণ্ডে নয়।

অপর পক্ষ দোকানদার। তাদের যুক্তি নববধূকে চিরকাল ভরণ-পোষণ করতে হবে, যৌতুক না পেলে তারাই বা খুশী হবে কেন? মেয়ে তো আর কিছু সঙ্গে করে আনবে না। পুত্রের যোগ্যতার চেয়ে পুত্রবধূর মারফতে দোহন যেন পরিপূর্ণতা লাভ করে, এই হল যুক্তির সার।

অতীতের বিস্মিত চিন্তাধারার ক্ষেত্রে নিজেকে যখন দাঁড় করাই তখন আপনা থেকেই শিউরে উঠি। আজ তোমাকে এই কাহিনী শোনাতে বসে চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, নীরবে এই যুক্তিহীন যুক্তিগুলো আমরা পরিপাক করেছি, করছি এবং করে চলব। সুস্থ মানবজীবন গড়বার উপদেশ অন্যকে দিয়ে নিজে চুপিসারে নিজের সন্তানের জন্য অপরকে দোহন করে ভাগ্য সৃষ্টি করব। বাহ্যরূপ থেকে অন্তরকে চিনবার সব পথ রুদ্ধ করে অপরকে বঞ্চনা করব।

দারিদ্র্য যদি শাশ্বত জীবনের অন্তরায় হয়, সে-দারিদ্র্য জয় করবার পথ কোথায়? বেড়ালের বিয়ে দিয়ে পয়সা অপব্যয় করবার কারুর সামর্থ্য রইবে, আর অপরের সাধারণ সুস্থ জীবন যাপন করবার মতো ব্যয় করবার সামর্থ্য রইবে না কেন! সমতা নেই সমাজ-ব্যবস্থায়; তাই যদি থাকত, তাহলে অর্থের বিনিময়েও বিবাহের প্রয়োজন হত না, অর্থের অসঙ্গতি মানুষের জীবনে শুভকার্যে প্রতিবন্ধক হতে পারত না। এই সাম্যহীন সমাজে মানুষ বড় নয়, বড় তার রুপোর রূপ।

সেখানে স্নেহ, মায়া, মমতা শুধু আভিধানিক শব্দ, তার বিকাশ ঘটাবার পথ কোথাও নেই। অর্থহীনতা অপরাধ, দারিদ্র্য সর্বগুণ-সংহারক।

দুঃখের সাথেই অনিরুদ্ধ বলেছিল, দাদা, জীবনের বড় কাব্য অর্থ, আর বড় কবি ওমর খৈয়াম। ভোগ ও অর্থের প্রাচুর্য কবির কাব্য-কাহিনীকে সার্থক করেছে।

হাসপাতালের বেডে রুগ্ন অনিরুদ্ধ তখন বিশীর্ণ, মৃত্যুর ক্ষণ খুঁজছে। সেই অনিরুদ্ধের রুগ্ন ত্বকে দুঃখের হাসি ফুটে উঠল।

আমি চুপ করেই বসে ছিলাম। অনিরুদ্ধ কথার সাথে কথা জুড়ে বলল, স্বদেশী করে জেলে এসেছি, আজ জেল হাসপাতালে গো-চিকিৎসা পেয়ে নরজন্ম সার্থক করছি। সবই সত্যি, তার চেয়ে বড় সত্যি জীবনকে বঞ্চনা করেছি। বঞ্চনা করেছি, কেন না বঞ্চনা করতে বাধ্য হয়েছি।

তুমি থাম তো ভাই। অসুস্থ শরীরের চেয়েও তোমার মন বেশী অসুস্থ হয়ে উঠেছে, সেই অসুস্থতা আরও বেশী ভয়ঙ্কর।

অনিরুদ্ধ হাসল, বলল, আমরা কি চেয়েছি? ইংরেজ চলে যাক, নয় কি? কেন যাবে? আমরা আমাদের সুখদুঃখকে পরিচালনা করব, এই তো? তাই যদি হয়, তাহলে ভুল হবে দাদা। আমরা চাই ইংরেজ যাক, আমরা সুখে থাকি, দুঃখকে জয় করি। দুঃখ কোথায়? দুঃখের মূলসূত্র রয়েছে টাকার অঙ্কে। অঙ্ক কম হলে জাগতিক নিয়মকেও আমরা অস্বীকার করি। অঙ্ক ঠিক থাকলে জাগতিক নিয়মকে নিজের ইচ্ছায় চালাতে চেষ্টা করি। অঙ্ক যতদিন ঠিক না হবে, ততদিন দুঃখ যেরূপেই আসুক, সে-দুঃখ অর্থহীনতার নামান্তর মাত্র।

বলতে বলতে উত্তেজনায় অনিরুদ্ধ হাঁপিয়ে উঠল। তার কপালে হাত রেখে বললাম, হয়ত তাই, হয়ত নয়। তা বলে তুমি কেন উত্তেজিত হচ্ছ।

এই উত্তেজনার শীঘ্রই পরিসমাপ্তি ঘটল। ক'দিন পরে অনিরুদ্ধ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। তার মৃতদেহ জেলখানার শেষ কোণায় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে যাওয়া নিষেধ। যেতে চেয়েও যেতে পারিনি। সেলের দরজায় বসে অনিরুদ্ধের চিতার স্থান দেখতে

পেতাম। বিকেলে তাকিয়ে থাকতাম আর ভাবতাম, অনিরুদ্ধ অর্থকে যে চোখে দেখে গেছে, সে চোখ সবারই তো রয়েছে, চোখ থেকেও কেন তার সমাধান হচ্ছে না। হবে কি কোনো দিন ?

অনিরুদ্ধ ধনীর সন্তান, টাকাকে সে ভালবাসলেও, টাকার মোহ তার ছিল না। সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় সে স্বদেশী করেনি। সে এসেছিল ইংরেজকে রাজহীন করতে। তারপর একদিন সে উপলব্ধি করল, রাজহীন ইংরেজ তত সর্বনেশে নয়, যত সর্বনেশে তার শোষণ-ব্যবস্থা। ইংরেজ শোষক, সে দেশী শোষক সৃষ্টি করেছে উত্তরাধিকারী-সূত্রে, তাই সমাজের নীচের তলার লোকেরা সাধারণ সরল জীবন খুঁজে পায়নি সাদা-কালোর উৎপীড়নে, তাই তাদের ছুটে আসতে হয়েছে জেলখানায়। নইলে জগুয়ার মতো পাষণ্ড কেন এখানে আসল, আর কেনই বা সেদিন কাঁদল ?

কয়েদী রাজ্যে জগুয়া মানী লোক। সাত সাতবার নরহত্যাসহ ডাকাতি করে একবার মাত্র সাজা হয়েছে দশ বছরের। এমন গুণী লোক জেলখানায় কমই থাকে। সেই জগুয়া ভোরবেলায় আমার সেলের সামনে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন কাঁদছ মহারাজ ?

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে জগুয়া বলল, শোননি বাবু, শেষরাতের কান্না !

ওহো, আজ বুঝি মাল খালাস হল।

হাঁ বাবু, সেই মোছলমান মাগীটা, যে সোয়ামীকে বিষ দিয়েছিল।

একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কি তোমার কেউ হয় ?

না বাবু।

তবে কাঁদছ কেন ?

ও কাঁদছিল ওর ছেলের জন্য। ওর কাঁদা শুনে একটা কথা মনে পড়ে গেল। ডাকাতি করে দিন ভালই গুজরান হচ্ছিল বাবু। জগুয়াকে ধরবার মতো পুলিস হিন্দুস্থানে ছিল না। তবুও একদিন ধরা দিতে বাধ্য হলাম।

মানে, পুলিস তোমায় ধরতে পারেনি, ইচ্ছে করেই জেলে এসেছ।

পারেনি, পারত না কখনো। শেষ যেবার ডাকাতি করতে গেলাম, ওঃ সে কথা শুনে কেঁদে উঠবেন বাবু। মালদার লোক। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকেই সামনে পেলাম একটা মেয়েছেলে। তার কোলে ফুটফুটে সুন্দর একটা ছেলে। মদ্দা লোকটা খাটের তলায় লুকিয়েছিল, তাকে টেনে বের করে দু-চার ঘা দিতেই সে বউকে দেখিয়ে বলল, চাবি ওর কাছে। বউটার হাত চেপে ধরলাম, বললাম, চাবি দে। তার কাছে চাবি ছিল না। ছেলেটাকে বুকের সাথে জাপটে ধরে কেঁদে পা জড়িয়ে ধরে বলল, চাবি নেই বাবা, আমাকে মেরে ফেল কিন্তু আমার ছেলেটাকে বাঁচাও, ওকে মের না।

জগুয়া থেমে গেল। ফতুয়ার হাতায় চোখ মুছে বলল, জানেন বাবু, তার কথা শুনে আমার মনে হল, যেন আমারই মা আমাকে বুকে চেপে নিয়ে কাঁদছে। তখুনি ফিরে এলাম বাবু। আর সেই থেকে ডাকাতি ছেড়ে দিয়েছি, সেই দিনই থানায় গিয়ে ধরা দিলাম। জগুয়া ডাকাতের মৃত্যু হল! সেই মা, সেই মা কাঁদছিল আজ সকালে। তার অপরাধের অনুশোচনা নয়, তার মৃত্যুর পরোয়ানাকে ভয় করে নয়, সে কাঁদছিল তার সন্তানের জন্য! তাই বাবু ···

জগুয়া হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

নরহত্যাকারী ডাকাত জগুয়া কাঁদছে, বিশ্বাস হচ্ছিল না। তার কথার বেগ তখনও শেষ হয়নি, তাই ভেবে পেলাম না জগুয়া কাঁদে কেন, আর সত্যিই কাঁদে কেন!

অনিরুদ্ধ মরণের মাঝ দিয়ে কি পেল, জগুয়া জেলখানায় প্রায়শ্চিত্ত করতে এসে কি পেল! পাওয়া না-পাওয়ার দ্বন্দ্ব তাদের শেষ হয়েছে কি!

অনিরুদ্ধ ধনীর দুলাল। ভাবাবেগে এসে বুঝে গেছে, অর্থহীন সাম্যহীন সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ কত অসহায়। আর জগুয়া বুঝেই এসেছে, অর্থের চেয়ে বড় মানুষের হৃদয়, সেই হৃদয়ে আঘাত হানার চেয়ে হৃদয়কে সঞ্জীবিত করার পথ খোঁজা দরকার। জগুয়া তাই কাঁদছে, অনিরুদ্ধ মৃত্যুর মাঝ দিয়ে বিক্ষোভ জানিয়ে গেছে।

পাতুর মা-র কথা ভাবতে বসে এদের কথা কত ভাবেই মনে এসে ধাক্কা দিচ্ছে। ভাবতে পারছি না, সত্যি সত্যিই পাতুর মা-র ওটা প্রাপ্য কি না।

প্রাপ্য নয় বললেই তো দোষমুক্তি হয় না।

হঠাৎ খবর পেলাম তার একমাত্র বন্ধন পাতু সন্তান প্রসবকালে চিরবিদায় গ্রহণ করেছে, বিদায়ের পূর্বে কোনো উপচার সাজান হয়েছিল কি না তা জানা নেই, কিন্তু পাতুর মা-র পাতু নিঃশব্দে আরও অখ্যাত কোটি কোটি লোকের মতো এ জগতের দেনাপাওনা শোধ করে ভরণপোষণের এবং যৌতুকের মামলা মিটিয়ে দিয়েছে। এই বোধ হয় মৃতার সান্ত্বনা। কিন্তু পাতুর মা সান্ত্বনা পাবে কোথায়!

তার মৃত্যুর তিন বছর পর বাড়ি যেতেই পাতুর মা বলল, সব শেষ।

মনের শঙ্কা ও বিরাগকে কঠিন হস্তে চেপে ধরে মৃদুকণ্ঠে বললাম, আমাকে বলবার অপেক্ষায় বুঝি বসে আছ? কি শেষ? এ তো শেষ নয়, আরও বাকি রয়েছে।

আশাহত মাতৃত্ব ডুকরে উঠল, মামীমা অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলল, আমার আর কি রইল?

সবই তো থেকে গেছে। মামা মারা যাবার দিন মনে হয়েছিল, তোমার সব শেষ; পাতু মারা যাওয়াতে তুমি ভাবছ, সব শেষ। কিন্তু এতে কিছুই শেষ হয়নি। শেষ মানুষের মৃত্যুতে হয় না, শেষ হয় শোকের ঊর্ধে যেতে পারলে, তা পেরেছ কি? যেদিন নারীত্বের গরব ছিল সেদিন তা রক্ষা হয়নি, শেষ অবধি মাতৃত্বের বিরাটত্বও ধসে গেল। পেলে কিছু?

পাইনি, কিন্তু পাবার আশায় আজও তো বেঁচে রয়েছি। এবার আমি কোথায় যাব!

যাবার রাস্তা অনেক রয়েছে মামীমা, সব রাস্তায় চলা যায় কি? রাস্তাও খুঁজে নিতে হয়। প্রথমে বাপ মা-র আশ্রয়ে ছিলে, এলে স্বামীর আশ্রয়ে, এবার বিশ্বের আশ্রয়ে নিজেকে বিলিয়ে দাও মামীমা। তুমি আমাকে ছোটবেলায় বলতে, ভয় মানুষকে অমানুষ করে। আজ তুমিই ভয় পাচ্ছ।

এত আঘাত, বলেই পাতুর মা কাঁদতে থাকে। সান্ত্বনা দিয়ে নিজের কাজে বেরিয়ে গেলাম। কিন্তু ভেবে পেলাম না, সত্যি সত্যি ভয় পাবার মতো কিছুই কি নেই? মানুষকে অমানুষ করবার পথ তো হাজার হাজার খোলা আছে। ভয়ের রাস্তাটা খুঁজে নিতে হয় না, সে আপনি আসে অমানুষ তৈরি করতে। নতুন বর্ষার জল নামলে খালবিলের জল যখন বৃদ্ধি পায়, তখন জেলেরা জাল, সড়কি নিয়ে খালের ধারে নিশানা করে দাঁড়িয়ে থাকে। জল নড়লেই ঝপাৎ করে জাল ফেলে, মাছ ধরে। তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে মাছ পালিয়ে যেতে পারে কদাচিৎ। তেমনি ধারা দেখতে পেলাম ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের রেলস্টেশনগুলোতে। কেউ থামের আড়ালে, কেউ ছাউনির তলায়, কেউ গাছতলায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে অপেক্ষা করছে ঐ জেলেদের মতো। নতুন বান ডেকেছে, বানের জলে ভেসে আসছে আশ্রয়হীন জনতা, নরনারী। ওত পেতে বসে আছে এপারের-ওপারের জেলেরা, দাঁও বুঝে জাল ফেলবে। মাছ ধরলেই তাদের ব্যবসা চলবে। ধরা যে পড়ছে না তা নয়, অমানুষ তৈরীর এত বড় রাস্তাটা খুলে রেখে সরকারী ব্যবস্থাপকরা বাহবা পাচ্ছে, নির্লজ্জ কৌতুক অনুভব করছে। তাদের তো বানের জলে ভাসতে হয়নি, তাদের জীবনকে এমনিভাবে পরের করুণায় ছেড়ে দিতে হয়নি, তাই অসহায় লোক অসাম্যের নীতিতে মানুষ আর অমানুষ যাই হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। সেই অমানুষের রাস্তা খুলে রয়েছে সারা দুনিয়াতে যুগ যুগান্ত হতে, যারা নেমে যায় তারা ঘৃণা পায়, যারা নামায় তারা সিংহাসনে বসে থাকে। ব্যভিচারের এমন অবদানকে কে অস্বীকার করতে পারে।

রুদ্ধদ্বারে আঘাত হানতে হানতে পাতুর মাকে দাসীবৃত্তি বেছে নিতে হল ; যারা আপন জন, তারা নতুন বানের জলে তাকে ভাসিয়ে দিয়ে তার স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদকে গোপনে কুক্ষিগত করে নিল। বিধাতা যা দেবার তা পরিপূর্ণ করেই বোধ হয় ধ্যানে বসলেন। অসহায় নারী পথ খুঁজে পেল না।

বহুকাল পরে দাদার কাছে শুনেছিলাম পাতুর মা ভারতে আসতে চায়। মাথারও কিছু কিছু গোলমাল দেখা দিয়েছে।

উত্তর কি দিয়েছিলাম ঠিক মনে নেই, তবে এখানে আসতে মানা করেছিলাম, একথা বলতে পারি।

আজকে ভাবতে হচ্ছে, তাকে আসতে মানা করে ঠিক করেছি কি না! কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক, তা বুঝবার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি আজও হয়নি। অতীতেও ঠিক-বেঠিকের ধাক্কায় অনেক সময় বিব্রত হতে হয়েছে।

সিন্ধু দেশের রোরি স্টেশনে যখন পুলিস টেনে নামাল, তখন একবার ভেবেছিলাম, এখানে এসে ঠিক করেছি কি না! মনে হয়েছিল, পলাতক না হয়ে দেশে ফিরে আসলেই ভাল হত। যাদের মানসিক দ্বন্দ্ব বেশী তাদের চেয়ে গোঁয়ারতমি যারা করে তারা অনেক ভাল।

কিন্তু কি যে ভাল হত আজও ভেবে পাইনি। এটুকু বুঝি, যখনই কোনো মুশকিল আসে তার পেছন পেছন আসানও আসে। আসান অদৃশ্য থাকে বলে খুঁজে পেতে দেরি হয়। কোনো কোনো সময় স্বার্থসম্পন্ন লোকেরা সেই আসানকে এমন আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখে, যাতে করে মুশকিল কাটিয়ে উঠতে অনেকেই রুদ্ধশ্বাস হয়, আবার অনেকেই হয়ত তলিয়ে যায়। যারা তলিয়ে যায় তারা ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়, যারা রুদ্ধশ্বাস হয়েও টিকে থাকে তারা দৈব-অনুগ্রহ বলে সান্ত্বনা পায়। বুদ্ধির অগম্য বলেই তারা অলৌকিককেই মানতে বাধ্য হয়, কিন্তু যারা আমার মতো অশান্ত দুর্দান্ত জীবন নিয়ে ছেলে-খেলা করে চলে, তাদের কোনো বিকারই ঘটে না। তাই ঠিক-বেঠিকের দ্বন্দ্বে পরাজয় ঘটলেও নিন্দাভাজন হতে হয়নি।

মনে হয় এ যেন একখানা নাটক। যে নাটকের সূত্রপাত আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, তার চলন পথে থাকে ঘাত-প্রতিঘাত, শেষ দৃশ্যে থাকে নির্বিকার সমাহিত ভাব। নিতান্ত অসহায়ভাবে মোহমুক্তির পথ অন্বেষণ। সেই নাটক অভিনয়ে কত না আমাদের পারিপাট্য। চুলের খোঁপা তেরচা হবার উপায় নেই, টেরি না বাগালে মানই থাকে না। তারপর একদিন ! যাক সে সব কথা।

পান্তুর মাকে ভুলতে পারিনি, হয়ত পারবও না। কতভাবে তার প্রভাব রয়েছে আমার উপর, সে বলে শেষ করা যায় না।

ভয়কে জয় করবার অপ্রত্যক্ষ প্রভাব যে নারী সৃষ্টি করেছিল, সেই নারীকে যেদিন ভীতিপূর্ণ সন্ত্রস্ত পদক্ষেপ করতে দেখলাম, সেদিন নিজেকেই জিজ্ঞাসা করলাম, এই কি সত্যি !

অথচ এরই পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে যাচাই করে নিয়েছি বহুবার। এমন কি, কোনো সময় একজন বন্ধু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, চীনে স্মাগল করে যেতে ভয় পেলে না ?

বিস্মিতভাবে উত্তর দিয়েছিলাম, ভয় ! তা একটু হয়েছিল বইকি। তবে সুন্দরের সন্ধানে দুনিয়ার কত জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে, সেই সুন্দরকে হাতের কাছে পেয়েও কি 'ভয়' হতে পারে ? কতটুকু মূল্য আমাদের রয়েছে, নিজেকে ভালবাসি বলেই ভয়, যদি নিজেকে না ভালবাসতাম তাহলে ভয় পাবার কিছু ছিল কি ? বোধ হয় নিজেকে বেশী করে ভালবাসতে শিখিনি, তাই যেতে পেরেছিলাম দুর্গম পথ ধরে মৃত্যুকে সামনে রেখে।

ভয় ! ভয়ের স্মৃতি অ্যাডভেঞ্চাবের আনন্দের তলায় কি করে যে চাপা পড়ে তার উদাহরণও প্রচুর রয়েছে।

ইম্ফলে যাচ্ছিলাম।

ঘড়ঘড়ানি থামিয়ে ড্রাইভার যখন দুর্গম পার্বত্যপথে জানিয়ে দিল গাড়ি আর যাবে না, অন্তত যতক্ষণ মেরামত শেষ না হচ্ছে, তখন অনেকেই ব্যস্ত হয়ে উঠল, সাময়িক অসুবিধায় যেন ভীতির রাজ্য গড়ে উঠল। যাত্রীরা ভাড়া মিটিয়ে নিশ্চিন্ত মনে গালগল্প করতে করতে চলছিল, হয়ত কোনো কবি পার্বত্য অরণ্যানীর শোভা দর্শন করছিল। সব কিছুতে বাধা পড়েছে, নেমে এসেছে অশান্তির ছাপ। আমার মতো উদাসমনা ব্যক্তির পক্ষে গাড়ি সচল থাকলেও যা, অচল থাকলেও তা। ওদের তো তা নয়। শান্তির মাঝে অশান্তির উঁকিঝুঁকি ওরা সহ্য করতে পারে না, ভয়ে যেন মিইয়ে যায়।

নেমে পড়লাম। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম কয়েক গণ্ডা বিড়ি ও দেশলাই মজুত রয়েছে। রাস্তার কিনারায় পাথরে হেলান দিয়ে বসে ধূমপান করছি, লক্ষ্য করছি গাড়িকে সচল করবার জন্য চালক ও সহকারীর অক্লান্ত চেষ্টা। তার সাথে রয়েছে বিরক্তি আর ভীতির গুঞ্জন।

পেছন থেকে মোটরের শব্দ আসছিল। সবাই আশ্বস্ত হল। পশ্চাদ্‌বর্তী গাড়িতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারবে। আশায় উৎফুল্ল হল সবাই।

পেছনে বেসরকারী বাস বিনা আপত্তিতে প্রায় সবাইকে স্থান করে দিল। পথে এরকম তাদের নিত্যই করতে হয়। দেড়শ' মাইলের বেশী একটানা পথ চলতে অনেক সময়ই এরকম হয়ে থাকে, সাহায্যও এভাবে এসে থাকে। স্থান সবার সঙ্কুলান হল না। ক'জনকে থেকে যেতে হল। বেছে বেছে যারা কোহিমার যাত্রী তারাই থাকল, আর ইম্ফল যাত্রীদের মধ্যে রইলাম আমি একা।

সঙ্গিনী নাগা মহিলা আমাকে অনুরোধ জানাল। বলল, তুমিও চলে যাও।

বললাম, শিলং থেকে এতটা পথ তোমার সাথে এসেছি, শেষের বেলায় তোমায় ছেড়ে যাই কি করে। এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে।

সঙ্গিনী হাসল। অনুরোধ উপরোধ শেষ হলে সে নিরুপায়ের মতো বলল, তাহলে আজ আর ইম্ফল পৌঁছাতে পারবে না।

হাসির বিনিময়ে হাসি দিলাম, কথার বিনিময়ে নির্বাক হয়ে রইলাম।

সঙ্গিনী নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। আমি পাথরখানায় ভাল হয়ে বসলাম।

পাঁচতলা বাড়ির ছাদে উঠবার সিঁড়ির মতো ধাপের পর ধাপ কেটে চাষের জমি তৈরী হয়েছে পাহাড়ের গায়ে। ঝরনার জল ঝর-ঝরিয়ে ছুটে চলেছে পাহাড়ের খাদ বেয়ে। নীচে কোথায় যে সমতল তা ঝরনার জানা নেই, অধিবাসীরাও বোধ হয় জানে না। আকাশের ভাঙা ভাঙা মেঘ পাহাড়ের মাথায় লুকোচুরি খেলছে, আলোছায়ায় পাহাড়ের মাথা মাঝে মাঝে চকচক করে উঠছে।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে।

সঙ্গিনী এসে দাঁড়াল আমার পাশে।

কি করছ ?

দেখছি।

চল পথ ধরে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি। গাড়ি যতক্ষণ মেরামত হবে ততক্ষণ আমরা বেড়িয়ে আসতে পারব। চল। এমন সুন্দর বন, এমন সুন্দর পাহাড়, সেই পাহাড়ের বুক কেটে আরও সুন্দর এই পিচের রাস্তা। এই শান্ত সমাহিত সৌন্দর্যের মাঝে হাত ধরাধরি করে বেড়াবার এমন সুযোগ হয়ত জীবনে আর পাবে না।

ড্রাইভারকে বললাম, আমরা পায়ে হেঁটে চলছি, গাড়ি চালু হলে পথ থেকে তুলে নেবেন।

মনিপুরী ড্রাইভার বিস্মিতভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল, একা যাবেন না, এদেশের লোককে বিশ্বাস নেই।

সঙ্গিনীকে বললাম, ড্রাইভারের কথা বুঝলে ?

সে অসম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। তাকে বুঝিয়ে বললাম। আমার কথা শুনে সে ক্ষুব্ধ হল। মুখ রাঙা করে বলল, যা শোনা যায়, তা কি সত্যি হয় সব সময় !

সবটা না হলেও অনেকটা সত্যি হয়। যা রটে তার কিছু বটে।

তা বটে। বিদেশী যারা মাদার ইণ্ডিয়া পড়ে, তারাও মনে করে মাদার ইণ্ডিয়ার লেখক মিস্ মেয়ো সত্যি কথা বলেছে। তোমরা তাকে সত্যি বলে স্বীকার কর না, নয় কি ? আচ্ছা, তোমার দেশে শিক্ষিত সংখ্যা কত ?

শতে দশ বারো।

আর যাদের কথা শুনে এসেছ নরমুণ্ড শিকারী বলে, তাদের শিক্ষিত সংখ্যা তার তিনগুণ। সবাই পণ্ডিত না হতে পারে, তবুও তাদের চোখ, কান আছে। দুনিয়াকে জানবার শোনবার অস্ত্র তাদের ভোঁতা নয়।

কিছুটা পথ চলবার পর আবার বলল, তোমাদের দেশে শহরে-গ্রামে দেহপণ্য আইনানুগভাবে চলে ; বল, চলে কি না ?

ক্ষুব্ধভাবে বললাম, হাঁ চলো।

তাই দেখে একথা কি বলতে পারি যে সবাই ঐ ঘৃণ্য জীবন যাপন করে। তা পারি না। তেমনি কোনো নাগা যদি সত্যি সত্যি নরমুণ্ড শিকার করেও থাকে, তা থেকে এই ভ্রান্ত সত্যকে কেন স্বীকার করবে যে সব নাগাই নরমুণ্ড শিকারী! তবুও তোমাদের চেয়ে অনেকাংশে নাগারা অগ্রসর। তারা দরিদ্র, দারিদ্র্য কিন্তু তাদের মানবধর্মকে হত্যা করতে পারেনি। এদের দারিদ্র্য একজন অপর জনকে বঞ্চিত করতে শেখায় না। তোমাদের সমাজের বনিয়াদ অর্থনীতি, সেখানে শ্রেণী আছে, বৈষম্য আছে, অত্যাচার-অবিচার রয়েছে, অর্থবান অর্থ-হীনের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করে, ধরতে গেলে অনেক সময় নরক সৃষ্টি করে, তা আমাদের এই জংলী দেশে জংলী জাতের মধ্যে নেই। ভয়াবহ দারিদ্র্য প্রাচুর্যকে ব্যঙ্গ করে, তা বলে মানুষের হৃদয়-বৃত্তিকে হত্যা করে না।

প্রতিবাদ না জানিয়ে তার সাথে সাথে চলতে লাগলাম। পাহাড়ের বাঁকে মিশিয়ে গেল আমাদের বাহন, বলতে গেলে আশ্রয়।

পঁয়ত্রিশ মাইলের পোস্ট পেরিয়ে অনেকটা এসে গেছি। সামনে রাস্তাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে, সেই ঢালুর গা কেটে অনেকটা দূরে শ্বেত কপোতীর মতো নাগা গ্রামের টিনের বাড়ি গায়ে গা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তখনো বেলা বাড়েনি, গাছের পাতা চুইয়ে শিশিরকণা ভিজিয়ে রেখেছে পাহাড়ের গায়ের সবুজ দুর্বাদল। একটা পাহাড়ী দোপায়া পথ এঁকে বেঁকে এসে পিচের রাস্তার সাথে মিশেছে। সেখানে দুজনে বসলাম।

সঙ্গিনী সিগারেট বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, সত্যি করে কাউকে জানতে হলে তাদের দেশে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত, সে-দেশের লোকের সাথে নিজেদের মিশিয়ে দেওয়া দরকার, অর্ধ-সত্যকে অথবা অসত্যকে সত্য বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। অসত্যের চেয়ে অর্ধ-সত্য বেশী ভয়ঙ্কর।

অনেকক্ষণ ধরে সিগারেট টানতে টানতে হঠাৎ ছেদ দিয়ে বলল, যাবে আমাদের দেশে?

তোমাদের দেশেই তো এসেছি।

তা বলছি না, আমাদের গ্রামে যেতে পার কি ?

এ-যাত্রায় সম্ভব নয়। ফেরবার পথে চেষ্টা করব।

ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, কবে ফিরবে তার ঠিক নেই, সে-সময় থাকব কি না তারও ঠিক নেই। এমন অনির্দিষ্ট কথাকে স্বীকার করি কেমন করে, বল তো ? তোমার যাওয়াটা বোধ হয় এখনই বেশী সম্ভব হবে। গ্রাম তো আমাদের বেশী দূর নয়। পথেই মাও, মাও থেকে কয়েক মাইল পথ, মনিপুরের আরম্ভ আর নাগা পাহাড়ের শেষ যেখানে, সেখানেই আমাদের গ্রাম। যাবে ?

ভেবে দেখি। যাওয়াটা অসম্ভব নয়, কিন্তু···

মোটরের শব্দে দুজনে ফিরে তাকালাম।

আমাদের বাহন শক্তি সঞ্চয় করে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল। দুজনে উঠে দাঁড়ালাম।

পরিতৃপ্তির আনন্দে সঙ্গিনীর মুখ উজ্জ্বল, আমিও অখুশী হইনি।

আমাদের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়াতেই উঠে বসলাম। ড্রাইভার অনুযোগের সুরে বলল, এতদূর আসা ভাল হয়নি।

ভালমন্দের হিসাব শেষ করবার আগেই গাড়ি চলতে শুরু করল। আমরাও নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ধরালাম।

কোহিমা এসে যখন পৌঁছালাম তখন বারোটা বেজে গেছে। বাঁকের মাথায় উঁচু একটা ফলক। ফলকের নীচের দিকটা ঘাসের ঝোপে ঢাকা। ফলকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর দল ঘাতকের প্রশস্তি লিখে রেখেছে। মনে হল, পলাশীর ফলকের চেয়ে মর্মভেদী এই স্মৃতিফলক। ওরা পলাশীর মক্-ফাইটে দেশ জয় করেছিল, সেই জয়কে কায়েম করেছিল যেন কোহিমার পর্বত-কন্দরে।

> "তোমাদের ভবিষ্যৎ গড়িবার জন্যই আমাদের বর্তমান দিয়া গেলাম। যেদিন তোমরা দেশে ফিরিবে, একথা দেশবাসীকে বলিও।"

সেই সাথে একথা লেখা নেই যে, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎকে পেষণ, শোষণ আর শাসন করতে আমাদের বর্তমানকে দিয়ে গেলাম।

যারা ঘাতক তাদের স্মৃতিপূজা ইংরেজ করে আসছে শত শত বৎসর ধরে, আর যারা ঘাতকের হাতে প্রাণ দিল তাদের কথা বলবার কেউ নেই। আশ্চর্য!

গাড়ি ছাড়বার সময় হতেই সঙ্গিনী ডেকে নিয়ে গাড়িতে বসাল। বলল, যাবে আমাদের গ্রামে?

যাব, কিন্তু ···

ভয় পাচ্ছ বুঝি?

যখন যাব তখন ভয়কে পরোয়া না করেই যাব। ভাবছি তোমাদের দেশে যদি দেরি হয়ে যায়, তাহলে ইম্ফই পৌঁছাতেও দেরি হয়ে যাবে। অনেক কাজ রয়েছে সেখানে।

সঙ্গিনী কোনো জবাব না দিয়ে বসে রইল।

পথ চলাটা যদি অঙ্ক কষে করা যেত তাহলে পথচলার আনন্দ নষ্ট হত, পথ চলাটা যদি অনির্দিষ্টকে মাথা পেতে নিয়ে করা হয় তাতে পথচলার ক্লান্তি অপনোদনের মতো আশ্রয় পেতে বিলম্ব হয় না। যখনই নিশ্চল হয়ে থাকতে হয়েছে তখনই মনে হয়েছে, যারা সারা জীবন এভাবে থাকে তাদের প্রাণ সচল তো, না অচল তাদের দেহের গতি। প্রাণকে সচল আর আনন্দের আধারে রূপায়িত করতে যারা চায়, তারা জীবনকে যেন অঙ্ক দিয়ে, বাধা নিষেধ দিয়ে ক্ষুদ্রতম গণ্ডীর ভেতর টেনে না আনে। গতি আনন্দের পরিপন্থী নয়। গতি স্বাচ্ছন্দ্য দেয় না, আবেগ সৃষ্টি করে। সেই আবেগ সেই আনন্দকে পরিহার করতে পারেনি। বন্দীশালার অন্তরালেও সেই গতিশীল মন ছুটে চলেছে নদনদী খাল বিল পার হয়ে—দেহ গতি পায়নি সত্যি, তবুও মনের গতি স্তব্ধ দেহকে ক্লান্ত হতে দেয়নি।

সঙ্গিনীর নিমন্ত্রণ অবান্তর ঘটনার একটা দিক, জীবন-রূপায়ণে ওটা কেবলমাত্র দৈব-প্রসূত। তবুও তাকে বিমুখ করতে পারলাম না।

আমার সম্মতিতে তার মুখে জয়ের আনন্দ ফুটে উঠল, মৌন গিরি-সঙ্কটে প্রতিধ্বনিত মোটরের আওয়াজের মতো আমি নিজের কাছে নিজেকে ভাল আর মন্দের প্রতিধ্বনিতে ধ্বনিত করে আত্মস্থ

হয়ে পড়লাম। নিজের কাছে শতবার যে-প্রশ্ন জেগেছে, যে-প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেতে অনন্ত কাল ধরে মানুষ শুধু জিজ্ঞাসার চিহ্ন টেনে এসেছে, সেই প্রশ্নের মাঝে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

পুরান নয় অথচ নতুন বলতেও পারি না। উভয়ের সংমিশ্রণ। এই সংমিশ্রিত ঘটনার আওতায় অনেক দিন ভাবতে হয়েছে। সমাধান খুঁজে পাইনি।

সিমলা পাহাড়ে অপ্রত্যাশিত ঘটনার মাঝ দিয়ে বিগত যুগের রুক আর বর্তমান যুগের রোহনা—দুই ভাইবোনের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

জাত বানজারে, যাযাবর তাদের জীবন, জীবিকা বলবার মতো কিছু নয়, বলতে গেলে তাদের জীবিকা সুস্থ মানুষের চিন্তাধারাকে ধিক্কার দেয়। পাহাড়ের কিনারায়, সরল গাছের ঝোপের তলায় শহর থেকে সম্ভাব্য দূরত্ব রক্ষা করে ছেঁড়া কাপড়ের তাঁবু ফেলে বাস করছিল। সাথী-সঙ্গী যারা, তারা শীত কমতেই হিমাচলের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে রুজি-রোজগারের আশায়।

এঁকে বেঁকে রেলপথ তার বাসস্থানের পাশ দিয়ে অসাড়ে গা ঢেলে দিয়ে লুপের কোণায় লুকিয়ে গেছে। আধ মাইল পথ পার হলেই জুতোগের ডিসট্যাণ্ট সিগন্যাল। কার্ট রোডের একটু ঢালুতে টিলার উপর তাদের আস্তানা।

মহীন্দর নিত্যকার ভ্রমণ-সাথী। সেদিনও গল্পে গল্পে সামারহিল পেরিয়ে অনেকটা দূর এসে গেছি। পাহাড়ী মেঘ কখন যে বর্ষণ শুরু করে তার হদিস পাওয়া ভার, বলতে গেলে আবহাওয়াবিদরাও অনেক সময় গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে। আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলা চলে অনবরত।

যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই হল। ঝমাঝম বৃষ্টি নাবতেই পিয়াল-তলায় আশ্রয় নিলাম। একখানা ছাতায় কোনো রকমে মাথা বাঁচাতে

নিষ্ফল চেষ্টা করছিলাম। বৃষ্টির ঝমঝমানি শব্দ ভেদ করে হঠাৎ কানে ভেসে এল বাঁশীর শব্দ!

মহীন্দর বলল, শুনতে পাচ্ছ?

বাঁশীর শব্দ তো?

হাঁ, বেশ বাজাচ্ছে, বাজিয়ে বোধ হয় কবি। মেঘদূত পড়েনি, পড়লে এই উত্তর মেঘের সাথে মল্লার রাগিনী জুড়ে দিতে পারত।

বললাম, তাহলে কবি নয়, বিরহী।

অসম্ভব নয়। কিন্তু ওরা কারা? বাঁশী যখন বাজছে, তখন লোকালয় নিশ্চয়ই রয়েছে। চল, ঐ লোকালয়ে আশ্রয় পেতে পারি।

এমনি তো ভিজে ঝড়ো-বকের মতো অবস্থা, তার উপর আরও যদি যেতে হয়, তাহলে কিছুই বাকি থাকবে না। তাই প্রতিবাদ জানালাম।

মহীন্দর আমার প্রতিবাদ না শুনে টেনে নিয়ে চলল।

ছেড়া তাঁবুর তলায় বাঁশের টুল পেতে বাঁশী বাজাচ্ছিল রুক। রুক বানজারে, পরনে তার ঢোলা ছেঁড়া পাজামা আর শতছিন্ন কামিজের উপর অতিজীর্ণ ওয়েস্ট কোট। দর্জির হাত থেকে বেরিয়ে এসে কোনোদিন বোধ হয় জলের সাথে তার দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেনি। আমাদের দেখেই সে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল। মনে হল, সে যেন আমাদের প্রতীক্ষায়ই বসে ছিল। বাঁশের টুলটা টেনে বসতে দিয়েই ডাকল, রুনা।

ছেঁড়া পর্দার ওপার থেকে জবাব এল, হাঁ-জি।

বাবুরা মেহেরবানি করেছে, একটু গরম পানি তৈরি কর।

অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

হেসে জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছেন, বাবুজি?

তোমার কথায় মনে হচ্ছে আমরা যেন কত পরিচিত, আর আমাদের প্রতীক্ষায় তুমি বসে ছিলে!

বাবুজি আপনারা মেহমান।

বললাম, গরম পানির চেয়ে তোমার বাঁশী বেশী উপভোগ্য, তুমি বাঁশী বাজাও।

বাঁশী! বলে রুক চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

কি ভাবছ?

ভাল বাজাতে ভুলে গেছি বাবুজি।

মনে হল অতি বিনয় জানিয়ে সে কিছু আদায় করতে চায়, তাই বললাম, যা জান তাই শোনাও, বকশিশ দেব।

বকশিশ! তা বটে, বকশিশ দিয়ে গরীব বশ হয় সত্যি, তাদের প্রাণের টান সৃষ্টি হয় না বাবুজি। তবুও বাঁশী শোনাব, ভাল না লাগলে রাগ করবেন না, শিকায়েত করবেন না।

রুকের সাথে এই প্রথম পরিচয়। বাঁশী শুনে রুনার হাতে চা খেয়ে ফিরে আসছিলাম, পেছন থেকে রুনা ডাকল, বাবুজি!

ফিরে দাঁড়ালাম।

আবার আসবেন, কিন্তু রুককে বাঁশী বাজাতে বলবেন না।

ইচ্ছে হল জিজ্ঞাসা করি, কেন? অহেতুক ঔৎসুক্য দমন করে বললাম, আচ্ছা।

আচ্ছা নয়, আবার আসবেন।

রুনা রুকের স্ত্রী। শেঠের ভাষায় ঘরওয়ালী নয়।

তার ছেঁড়া কামিজের উপর সাপের মতো চুলের বেণী ঝুলছে, তার ভরা দেহের আনাচে কানাচে উঁকি দিয়ে মহনীয় যৌবন মানবজন্মকে ব্যঙ্গ করছে। বিধাতার অপূর্ব বিধান! রাজা বাদশাও হাঁ করে চেয়ে রইবে, লজ্জা পাবে হারেমের সুন্দরীদল, এমন তার গঠন।

ফিরে এলাম।

ক'দিন পরে একাই গেলাম সেখানে। রুক বসে চাটাই তৈরি করছিল, আমাকে দেখে সাদরে বসতে দিল, সেদিনকার মতো রুনা এসে চায়ের বাটি সামনে রাখল।

রুক বানজারে। বাপের পরিচয় দেবার মতো তার কিছু নেই। নিজেই বলল, বানজারে পরিচয় দেয় মায়ের, বাপ তাদের জন্মদাতা, অন্নদাতা নয়।

বানজারে মেয়েরা নেচে নেচে গান করে, পুরুষরা তালে তালে বাজনা বাজায়। যৌবনই তাদের মূলধন, সেই মূলধনের লভ্যাংশ তাদের জীবনযাত্রার সম্বল।

অনেক দিন রুক-রুনাকে দেখিনি। মনে হয়েছিল ওদের আস্তানায় আবাব যাব। মহীন্দর মানা করত, যেয়ে কাজ নেই বাবুজি। বানজারে ডাকাত, বানজারে খুনে, বানজারে মেয়েরা কসবী।

যাকে ছেড়ে থাকতে চাই সেই আঁকড়ে ধরে বেশী, নইলে রুক-রুনাকে কেমন করে আমার সাথে মিশিয়ে দেবার সুযোগ দিলাম, নিজেই ভেবে পাই না।

মলের সিঁড়ি দিয়ে কার্ট রোডের বাজাবে এসেছিলাম। সামনেই বিরাট ভিড় জমেছে। ভিড়ের মাঝ থেকে নারীকণ্ঠের গান আর হারমোনিয়ামের বাজনা ভেসে আসছিল। উৎসুক জনতার সাথে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে উঁকি দিলাম।

রুক-রুনা।

গান শেষ হয়েছে, ইরানী টুপিটা চিত করে পয়সা তুলছে রুনা।

পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। রুক ডাকল, বাবুজি। দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

অনেক দিন তশরীফ রাখেননি।

সময় পাইনি রুক।

রুক হাসল। হাসিতে কি বোঝা গেল জানি না, মনে হল সে যেন বলতে চাইছে, সময় না পাওয়াটা বড় পুরান কৈফিয়ত। একটু লজ্জিত হলাম।

রুনা এসে সেলাম দিল।

কোথায় যাচ্ছেন? বাড়ি? কোথায়? বাইলুগঞ্জ? ওপথেই আমরা যাব। চলুন।

আমার আস্তানা দেখেই তারা চলে গেল। বসতে বললাম, বসল না, এমন কি বাড়ির চত্বরেও পা দিল না। মনে মনে খুশীই হয়েছিলাম।

চুপি চুপি তাকিয়ে দেখলাম, সামারহিলের সিঁড়ি বেয়ে তারা নেমে চলেছে।

ক'দিন ধরে বৃষ্টি পড়ছে অনবরত। কোনো রকমে দৈনন্দিন কাজ শেষ করে বাসায় এসে বসি। নিরিবিলি সারা সন্ধ্যে কাঁচের শার্শি বন্ধ করে বাইরের আলোকমালার দিকে চেয়ে থাকি। সেদিনও তেমনি বসেছিলাম। হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে উঠতে হল। এই দুর্যোগপূর্ণ রাতে আবার কে এল!

দরজা খুলতেই সামনে দেখি রুনা।

রুনা, এত রাতে কেন? রুকের কথা মনে পড়ে গেল—জোয়ানী ওদের মূলধন। চমকে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, রুক কোথায়?

বড়ই বেমার। বুখার, ছাতিতে দরদ।

বড়ই বেমার তো তুমি এখানে কেন?

রুনা কেঁদে ফেলল।

আমার নিজের কর্কশ গলার শব্দে আমি নিজেই চমকে উঠলাম।

বললাম, কাঁদছ কেন?

ওকে বাঁচান বাবুজি, রোহনা ওর সর্বনাশ করেছে, এবার বুঝি আমাকেই সব হারাতে হয়। একটু মেহেরবানি করুন।

রোহনা, সে আবার কে?

ওরই বোন। রোহনা ওকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে, তাই না আজ ওর ঐ দশা।

স্তব্ধ হয়ে তার পাথরের মতো শক্ত মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

বাবুজি, মেহেরবানি। রুনা লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে।

তার হাত ধরে টেনে বসিয়ে বললাম, বাবুজি নই, ভাই। ভাই মেহেরবানি করে না রুনা, ভাই কর্তব্য করে।

সে-রাতেই রুককে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলাম।

রুনা রইল আমারই আশ্রয়ে। আশ্রয়ে ঠিক নয়, খাবার সময় আসত, কিছুক্ষণ রুকের অসুখবিসুখের কথা বলত, কিছুক্ষণ তাদের জীবনকাহিনী শোনাত, তারপর হাসপাতালের বারান্দায় ফিরে গিয়ে বসে স্বামীর আরোগ্য কামনায় যেন তপস্যা করত।

রুনার কাছেই শুনেছি। একই বৃন্তের দুটি ফুল রুক আর রোহনা। দুই ভাইবোন। মা-বাপহারা বোনকে রুক মানুষ করে তুলছিল।

রুক বাঁশী বাজাত, রোহনা গান গাইত, তার পায়ের নূপুর ঝুনঝুনন করে বেজে উঠলে দর্শক পাগল হয়ে উঠত। রোহনাকে বাদ দিয়ে রুকের বিষয় কল্পনা করাও যেত না। অতি আদরের রুনাও তার কাছে তুচ্ছ। মনে হত রুক-রোহনা অবিচ্ছেদ্য।

একদিন রোহনা পালাল। সওদা আনতে গিয়ে আর ফিরল না। বানজারের মেয়ে পায়ে সোনার শেকল পরে ঘরওয়ালী হল এক সাহেবের। তার রূপের গরব ছিল, জোয়ানীর চকমকি জ্বলত তার সারা গায়ে, আগুন যেন ঠিকরে পড়ত তার চাহনিতে। বুঝলাম না, সাহেবের টাকায় রোহনা পুড়ল, না রোহনার রূপে সাহেব পুড়ল।

রুক বলত, বানজারের মেয়ে ঘর বাঁধে না, যদি বাঁধে সে-ঘর থাকে না। যাবি যা, কিন্তু বলে গেলেই পারতি।

কোথায় গেল রোহনা? রুক ছুটল তালাশী নিতে। থানাদারের কাছে নালিশ জানাল। তারা হাসল, বলল, পাখী পিঁজরা ভেঙেছে, বুঝলি। রুক অবুঝ নয়, তবুও তার মন সান্ত্বনা মানল না। রোহনা বেইমান হতেই পারে না। তার মন যে দুশ' বছর পেছনে পড়ে রয়েছে, সে-কথা সে স্বীকার করে না। বিগত যুগের রুক, বর্তমানের রোহনার সাথে পারবে কেন! রোহনা আর এল না।

রুক আর বাঁশী বাজায় না। রোহনার জন্যই তার বাঁশী, সেই রোহনা যখন নেই, তখন তার বাঁশী শোনবারও কেউ নেই।

দিল্লী যেতে হল। যাবার বেলায় রুনাকে সব বুঝিয়ে দিলাম। দু-চার দিনেই ফিরে আসব, তাও বললাম। কিন্তু ফিরতে বড়ই দেরি হয়ে গেল। ফিরে এসে রুনাকে খুঁজে না পেয়ে হাসপাতালে ছুটে গেলাম। হাসপাতালে খবর পেলাম, ক'দিন আগে আরাম হয়ে রুক চলে গেছে। কোথায় গেছে বলতে পারল না।

রুক-রুনা চলে গেছে।

শুধু রুকের পুরান মনের সাথে রোহনার নতুন মনের সংঘর্ষের কথাটাই মাঝে মাঝে মনে হয়েছে। রুক তার বোনকে ভালবেসেছে, প্রত্যুপকার আশা করেছে, কল্পনার জালে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়েছে। সে আদিম ভাই, নতুন যুগের বোনকে সে চিনতে পারেনি। তাই তাকেও ঘর পালাতে হল, নইলে তাদের ঐ কাপড়ের তাঁবুর তলায় তাদের চলবার মতো রুজ্রি-রোজগারের কোনো অভাব তো হয়নি।

যাবার বেলায় হাসপাতালের দরওয়ানের কাছে রুক তার বাঁশীটা রেখে গেছে, রুনা রেখে গেছে তার ইরানী টুপি। আমাকে দিতে বলে গেছে। বিশ্বজোড়া তাদের আশ্রয়। তারা বেরিয়েছে। আমি তাদের ভুলতে পারিনি। ঐ বাঁশী আর টুপি বেশী করে তাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। মনে হয়, রোহনার স্বপ্ন দেখে নিজেকে তিল তিল করে বিলিয়ে দিয়েই রুক শান্তি পাবে।

রুক-রুনা যেমন আকস্মিক,— যেমন ওদের সাথে পরিচয়, তেমনই ঐ পরিচয়ের পরিসমাপ্তি। ঠিক এমনি ধারাই আকস্মিক এই নাগা সঙ্গিনী।

সন্ধ্যা তখনো গড়ায়নি। মাওকে পেছনে ফেলে এসে উঠলাম সঙ্গিনীর গ্রামে। বিশ-পঁচিশখানা বাড়ি চালে-চাল দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরিষ্কার তকতকে গ্রাম, ঝকঝকে গ্রামের আঙিনা। সারি বাঁধা কাঠের মাচান বাঁধা ঘর। কোনোটায় টিনের ছাউনি, কোনোটায় খড়। গ্রামের প্রবেশপথে পাথর দিয়ে ঘেরা কবর-স্থান। কবর পেরিয়ে খড়ের মস্ত একখানা ঘর। সঙ্গিনী বলল, এটার নাম মারাং।

নাগা সমাজ-জীবনে মারাং হল অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এটা তাদের ঘর, এটা তাদের বিশ্রাম-নিকেতন, এখানেই তাদের লয়লা-মজনু স্বপ্নের সৌধ গড়ে তোলে। এটা যুবক-যুবতীর পীঠস্থান। এখানে শুরু হয় জীবনের পাঠ, এখানেই হয় জীবনের মুক্তি।

আমাকে মারাংএ বসিয়ে সঙ্গিনী ছুটে গেল তার বাসস্থানে। সাথী ও বাহক নাগা মজুর দুজন আমার বিছানা স্যুটকেস নামিয়ে

রেখে মারাংএর আঙিনায় বসে নিজেদের ভাষায় কি যেন বলাবলি করছিল। আমি একাই বসে আকাশ-পাতাল ভাবছি, এমন সময় সঙ্গিনী তার ভাইবোনের হাত ধরে বাবামায়ের সাথে এসে আমায় অভ্যর্থনা জানাল।

অভ্যর্থনা আমার প্রাপ্য নয়, তবুও নিমন্ত্রিত বলেই অভ্যর্থনাটা বেশ সুখকর মনে হল। বিছানা সুটকেস সেখানে রেখে তাদের সাথে বেরিয়ে পড়লাম। আমার আগমন-সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে, গ্রামের আঙিনার দুপাশে লাইন বেঁধে মেয়েপুরুষ দাঁড়িয়ে গেছে। আমি এগিয়ে চলেছি, তারাও আমাকে দেখে হাত তুলে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। মনে হল, আমি যেন কোনো বিজয়ী বীর, আমাকে দেখবার জন্য অতি-প্রিয়জন যেন অপেক্ষা করছে।

রাত এগিয়ে চলেছে। গ্রামের আঙিনা মশালের আলোতে আলোকিত। সঙ্গিনী বলল, এবার মারাং যেতে হবে। সেখানে তোমাকে সম্মান দেখাবার আয়োজন হয়েছে। ঐ দেখ, সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

আঙিনায় এসে দাঁড়াতেই বাজনা বেজে উঠল। সঙ্গিনীর হাত ধরে তাদের সাথে সাথে মারাংএ এসে উঠলাম। দেখতে দেখতে মারাং লোকে ভরে উঠল।

সঙ্গিনী সবার সাথে পরিচয় করে দেওয়া মাত্র তার-যন্ত্র বাজাতে বাজাতে একদল নাগা পুরুষ এসে দাঁড়াল, তাদের সাথে নানা রঙের পোশাক পরে পলা-পুঁতির মালা গলায় কয়েকজন নাগা নারী এসে গান ধরল।

গান বড়ই করুণ মনে হচ্ছিল, আমার পক্ষে অকরুণ হল তাদের দেশী মদের গেলাস। কলসী বোঝাই দিয়ে মদ এসেছে, গোটা শুয়োর পুড়িয়ে তাকে টুকরা টুকরা করে পাতায় রাখা হয়েছে। সবাই সেই মাংস নুন মাখিয়ে মুখে দিচ্ছে আর মাঝে মাঝে মদের গেলাসে চুমুক দিচ্ছে।

চুপি চুপি সঙ্গিনীকে বললাম, এর কোনোটাই আমার রুচিকর নয়।

তবুও হাতে তুলে নিও। এরা তো বেশীক্ষণ সজাগ থাকবে না, উগ্র মদের নেশায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই ওরা বেহুঁশ হয়ে পড়বে। শুধু ওদের সম্বর্ধনাকে সম্মান দেখাতে মদের গেলাসটা হাতে তুলে নিও।

সঙ্গিনী সত্যিই বলেছে, দেখতে দেখতে মারাং‌এর মেঝেতে নারী-পুরুষ এলিয়ে পড়ল। আপন পর, পরিচয় অপরিচয় কিছুই তাদের নেই, নরনারীর আসব সেবনজাত অর্ধোলঙ্গ অক্ষম দেহগুলো পড়ে রইল মেঝের উপর।

সঙ্গিনী বলল, কেমন দেখলে।

অপূর্ব। আচ্ছা এরামা, এরা তো এভাবেই সারারাত পড়ে থাকবে ?

সঙ্গিনী হাসল। বলল, কাল মধ্যাহ্ন অবধি।

কিন্তু তোমাদের গান, তোমাদের বাজনা, সেই তালে তালে নাচ—এর তুলনা পাওয়া ভার। যাই হোক, আমার আশ্রয় কোথায় ?

হাত বাড়িয়ে সামনের গাছ দেখিয়ে বলল, ঐ গাছতলায়।

তাই চল, গাছতলায় আশ্রয় গড়ে নিয়েছি বিশ বছর আগে, সে-আশ্রয় ত্যাগ করতে চাইলেও, আশ্রয় আমাকে ত্যাগ করতে চায় না।

আকাশের চাঁদ তখন পাহাড়ের গায়ে গা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে, বাতাসের কনকনানি শুরু হয়ে গেছে। দুজনে এসে গাছতলায় বসলাম।

সারারাত জেগেই থাকবে ?

মনে থাকবে অনেক দিন, দেশে গিয়ে লোককে বলতে পারবে, অসভ্য নাগারা ঘুমোতেও দেয়নি।

ঘুম ! তা বটে। জান এরামা, বাল্যকাল থেকে নিদ্রাহীন রাত্রি-যাপন অনেকটা অভ্যেস করে রেখেছি। একবার এই রকম বিনিদ্র রজনীতে আরব্য উপন্যাসের কাহিনী শুনেছিলাম। সে-কাহিনীর বক্তা আর শ্রোতা সমাজের এমন দুটো শ্রেণীর, যাদের একজন ভোগ্য, আরেকজন ভোগী। সেদিন ভক্ষক আর ভক্ষ্য দুজনে প্রাণ খুলে এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনকে ধিক্কার দিয়ে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল। তুমি ঘুমোলে না কি এরামা ? মাঝে মাঝে 'হুঁ' দিও। আমাদের দেশে ছোটবেলায় শিশুরা যখন ঠানদির কোলে মাথা রেখে রূপকথা শোনে, তখন তারা 'হুঁ' দেয়। যখন 'হুঁ' বন্ধ হয়,

তখন ঠানদি তার কোল থেকে মাথা বালিশের উপর নামিয়ে নিজের কাজে বেরিয়ে যায়। বুঝলে, শিশু তখন ঘুমিয়ে যায়।

বুঝেছি, আরব্য উপন্যাসটা বুঝতে বাকি আছে। ছোটখাট হলেও আমি ডাক্তার। বিশ্লেষণ করে না দেখলে ডাক্তারদের বুঝতে কষ্ট হয়, তা বোধ হয় জান।

এরামাকে কাহিনী বলতে চেয়েও বলতে পারলাম না। চুপ করে বসে রইলাম, মনের কোণায় ভেসে উঠল অতি পুরাতন কাহিনী।

তার নাম সখজাদী।

বাবা মা যখন নাম রাখেন তখন শিশুর নাম রাখেন। শিশু বড় হলে তার নাম রাখলে সখজাদীর নাম বজ্জাতি রাখতে হত। তবুও মানুষ চিরকাল মানুষ। সখজাদীর সব বজ্জাতির ছিদ্রপথে মানুষ সখজাদীকে হয়ত মাঝে মাঝে দেখা যেত। সেইটেই আমি দেখেছি।

দরজায় ছিটকিনি আটকে হেলান দিয়ে বসলাম।

সখজাদী বলল, কি গো নটবর, ওখানে রাগ করে বসলে কেন?

জবাব দিতে পারলুম না। পুলিসের তাড়া খেয়ে পতিতালয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছি। এখনই যদি সে চীৎকার করে ওঠে, তাহলে বামালসমেত ধরা পড়ব। ইংরেজের রাজ্যে তাহলে পাঁচ বছর শ্রীঘরবাস নিশ্চিত।

সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, এপথে নতুন এসেছ? জবাব দিচ্ছ না কেন? পকেটে পয়সা আছে তো?

পাঁচ টাকার একখানা নোট বের করে তার হাতে দিয়ে বললাম, এই রাতটুকু আশ্রয় চাই এই টাকার বিনিময়ে।

সেকালে পাঁচ টাকা অনেক টাকা। সখজাদী পাঁচ টাকা এক সাথে পেয়ে অবাক হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চেহারা বদলে গেল, আমার মুখের দিকে অনিমেষে চেয়ে থেকে বলল, তুমি তো এ লাইনের নও, কেন এসেছ বাছা!

বাছা! তার মমত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বরে আমিও বিব্রত বোধ করলাম। বললাম, একটা রাতের আশ্রয় চাই, শুধু আশ্রয়।

বর্ধমানের মেয়ে সখজাদী। গ্রামের নাম আর বাবার নাম বলেনি।

শিশু বড় হয়েছিল আর পাঁচজন শিশুর মতোই। আরও পাঁচজন মেয়ের মতো পুতুলের বিয়ে দিত, বাড়ির আঙিনায় 'আনি মানি জানি না' খেলত।

তারপর একদিন তার বিয়ে হয়ে গেল। বয়স তখন বারো বছর পুরো হয়নি। ঘোমটা টেনে সখজাদী গেল স্বামীর ঘর করতে।

এক বছর দু বছর করে আটটা বছর কেটে গেল। সখজাদী বন্ধ্যা। লোকে বলত আটকুঁড়ি। সকালে উঠে কেউ তার মুখ দেখত না। স্বামীর সাথেও বিশেষ দেখাশোনা হত না।

আবার একদিন নহবত বাজল, মোল্লা এল, মৌলবী এল, উকিল এল। মজিবর নতুন সাদি করে ঘরে এল। সখজাদী সন্তানের বদলে সতীন পেল। মা হতে না পারার দুর্ভাগ্যকে মাথায় পেতে নিল। স্বামী তার পর হয়ে গেল।

সখজাদী ফিরে এল তার বাপের আস্তানায়। দু মাসেই সে ক্লান্ত হয়ে উঠল। আবার গেল স্বামীর ঘরে। তার ঘর তখন বেহাত হয়ে গেছে। রহিমা তখন বাড়ির কর্ত্রী, সখজাদী তার বাঁদী। যে-রাজ্যে তার ছিল বাদশাহি, সে-রাজ্যেই সে হল বাঁদী। ইংরেজের রাজা চার্লস যদি তার অপরাধ স্বীকার করত, তাহলে তার প্রাণদণ্ড নিশ্চয়ই হত না, কিন্তু প্রভু হয়ে সে ভৃত্যের কাছে প্রাণভিক্ষা নিতে পারেনি। সখজাদীও পারল না বাঁদীগিরি করতে। তবুও একটু দয়া, একটু স্নেহ সে যদি পেত মজিবরের কাছ থেকে, তাহলেও তার বঞ্চিত মাতৃত্ব নারীত্বকে ধিক্কার দিতে পারত না, নারীত্ব লাঞ্ছিত হত না।

সব হারিয়ে সখজাদী চাইল শোধ নিতে। পথ হারাল। অন্ধকার পিচ্ছিল পথে পা দিয়ে তার সারা জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিল।

সখজাদী ভাসতে ভাসতে এসে দাঁড়াল কোলকাতার ঘৃণ্য পল্লীতে। মাতৃত্ব তাকে মহীয়সী করতে পারত, নিষ্ফলতা তার নারীত্বকে বিপথে দাঁড় করাল।

তারপর কত বছর কেটে গেছে। সেই কিশোর আমি আজ যৌবনের প্রান্তসীমায়। আজও সখজাদীর দেওয়া পরোক্ষ শিক্ষা ভুলতে পারিনি।

আমার নীরবতায় এরামা অস্থিরভাবে বলল, চুপ করে রইলে কেন? তোমার আরব্য রজনী শেষ হতে না হতেই নাগা পাহাড়ের এক রজনী শেষ হতে চলেছে।

সঙ্গিনীর মৃদু হাসির শব্দ কানে এল।

মনে থাকবে অনেক দিন, কেমন? আরও একটা রজনী বোধ হয় তোমায় থাকতে হবে? এই নির্জন পার্বত্য বনানীর মধ্যে।

সহ্য হবে কি?

বলতে পারি না।

নাগা জীবনের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেতে হলে আরও ক'টা দিন এখানে থাকবার প্রয়োজন রয়েছে। অসহ্য হলেও থাকব, দেখব, জানব। এরামার কথায় উত্তেজিত হবার মতো কিছু নেই, শুধু গ্রহণ করার সামর্থ্যের আবশ্যকতা রয়েছে।

সকালের আলো ফুটে উঠতেই এরামা উঠে দাঁড়াল, বলল, চল—ঝরনায় স্নান করে আসি।

অনিদ্রার জড়তা থেকে মুক্তি পেতে হলে স্নান বিধেয়। কিন্তু স্নানের পরই ঘুমে যখন চোখ ভেঙে পড়বে, তখন কি উপায় হবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর?

আমাদের বাড়িতে গিয়ে গরম গরম চা খেয়ে দিব্যি ঘুম দেবে।

দি আইডিয়া। সানন্দে তার সাথে ঝরনার সন্ধানে গেলাম।

এরামা স্নান শেষ করে উঠে আসলে আমি ঝরনার তলায় গিয়ে বসলাম। এক এক কণিকা জল এক একটি হিমকণা, সমস্ত দেহকে যেন জমিয়ে দিতে লাগল। তবুও স্নান করতে হল; এরামার পক্ষে যা সম্ভব, তা আমার পক্ষে অসম্ভব হবে কেন? পৌরুষে আঘাত লাগবে, তা সহ্য হচ্ছিল না। এখানেও কমপ্লেক্সিটি রয়ে গেছে, নারীর সাফল্য আমার মতো পুরুষকে হীনমনা করে তোলে।

কাপড়জামা পালটে তাদের গৃহে বসবার ঘরে আগুনের পাশে জড়সড় হয়ে বসলাম।

অতিথি সেবায় এরামা পুরোগামী।

জিজ্ঞাসা করলাম, এরা তো সবাই প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ, এদের কাপড়-জামা পরতে শেখাও না কেন? এরা কি সভ্য হতে চায় না?

চা ঢালতে ঢালতে এরামা হাসল, বলল, কাপড়জামা পরলে সভ্য হয় সত্যি, কিন্তু তা কিনবার মতো সভ্য-সামর্থ্য ওদের আছে কি না, তা তো জিজ্ঞাসা করলে না। এই প্রচণ্ড শীতের দেশে যারা আগুনকে ভরসা করে বেঁচে থাকে, তারা কি জানে না, আবরণ থাকলে আবহাওয়ার নির্মমতা থেকে তারা বেঁচে উঠতে পারে। তারা জানে, কিন্তু সেই আবরণ সৃষ্টি করবার মতো কোনো সম্পদই তাদের নেই।

ঐ যে এদের রঙচঙে পোশাক, এ থেকেই বুঝতে হবে এদের গ্রাম আর গোষ্ঠী; এদের মাথার পাগড়ি আর পাখীর পালক দেখে ঠিক করতে হবে এদের সামাজিক মর্যাদা। ঐটুকু নিয়েই এরা বেঁচে আছে। সমতার স্নেহস্পর্শ থেকে অভাব অনাচার আর অসরলতার মাঝে এদের টেনে আনবার মতো বৃত্তি আমাদের নেই।

আমরা অসভ্য, বন্য, হিংস্র, নরখাদক, কত কি শুনে এসেছ এতকাল। অসভ্য মানুষ, তাদেরও সমাজ রয়েছে; বন্য মানুষ, তাদেরও গৃহ রয়েছে; হিংস্র মানুষ, তাদেরও আতিথেয়তা রয়েছে; নরখাদক মানুষ তাদেরও সন্তানপ্রীতি রয়েছে। সমাজ, গৃহ, আতিথেয়তা আর সন্তানপ্রীতি যাদের রয়েছে, তারা সত্যিই কি তোমাদের অভিধানগত নীচ স্তরের নরমুণ্ড শিকারী!

নাগাদের তো তোমাদের সমাজে ডেকে নাওনি। তোমরা এসেছ নাগাদের শাসন করতে, শোষণ করতে। ইংরেজ যেমন করত, তেমনি তোমরাও করতে চাও। শোষিত ও শাসিত জনতাকে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা শোষক আর শাসক চিরকাল করে এসেছে। তোমাদের মাঝে নতুনত্ব নেই, তাই অভিধান থেকে বেছে বেছে বিশেষণ দিতে তোমরা কার্পণ্য কর না।

ও কি, খাওয়া বন্ধ করলে কেন?

এসব কথা কার সম্বন্ধে বলছ ?

নির্দিষ্ট কাউকে নয়, তোমরা যারা সভ্য বলে নিজেদের দাবি কর তাদেরই বলছি, বিশেষ করে ভারতীয়দের বলছি।

তুমি কি ভারতীয় নও ?

ভারতীয় হবার সংজ্ঞা কিছু আছে কি ? আমরা লেখাপড়া শিখলাম ইংরেজদের পাঠশালায়, অক্ষর পেলাম তাদের কাছ থেকে, ধর্ম পেলাম তাদের যীশুর দয়ায়, শহরবাসীরা পোশাক-আশাক পর্যন্ত পেয়েছে ইংরেজদের অনুকরণে, গায়ের রঙ আমাদের হলদে, রক্তে আমরা মঙ্গলয়েড, ভারতীয় হবার কোনো লক্ষণ কি আমাদের রয়েছে ? তুমিই বল।

তারপর ?

ভৌগোলিক সীমানা ! গোটা পৃথিবীই তো এক ভূমির বন্ধনে রয়েছে, সেই বন্ধন বড়ই শিথিল। তোমরা আমাদের ভালবাসনি, আপন করে নাওনি, অসভ্য বন্য বলে এতকাল দূরে সরিয়ে রেখেছ। তোমরা যারা এসেছ তারা এসেছ শাসন করতে, নইলে শোষণ করতে। এক জাতীয়তার বিকাশ ঘটে প্রতিটি জাতি উপজাতির মাঝে ভালবাসার সৃষ্টিতে। কৃত্রিম জাতীয়তায় ভালবাসা সৃষ্টি হয় না।

আর শুনতে চাই না এরামা। বিশ্রাম তাহলে বেঘোরে মারা যাবে।

এরামা হাসল। এ হাসিতে যেন শ্লেষ ফুটে উঠল !

আমি প্রতিবাদের সুরে বললাম, তোমার যুক্তিকে সুযুক্তি বলে মনে করতে পারছি না। যারা তোমাদের চিন্তাধারায় বিভেদ ও ভ্রম সৃষ্টি করেছে তারা অভারতীয়। ভারতকে তারা ভালবাসেনি, ভারতের মঙ্গল তারা চায়নি, তারা চেয়েছে শাসন করতে, তাই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছে শাসিতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে। সরল সহজ মানুষের হৃদয়ে বিষ পরিবেশন করেছে শতাধিক বৎসর থেকে। উত্তরপ্রদেশীয় যেমন ভারতীয়, দক্ষিণীরা যেমন ভারতীয়, তেমনি ভারতীয় নাগারা। সমস্বার্থের অদৃশ্য সূত্রে সবার ভাগ্য সমভাবে জড়িত। যে পার্থক্য দেখছ, তার বনিয়াদ সমাজব্যবস্থায়

শ্রেণী বৈষম্য। আমাদের দুর্ভাগ্য, একে রোধ করবার মতো সামর্থ্য আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি।

অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, এগুলো আমার কথা নয়। আমি জানি জাতীয়তার মূল্য, আমি বুঝি ঐক্যের শক্তি, কিন্তু ঐ সাধারণ লোকেরা আমার মতো বোঝে না। ওরা যা বোঝে, তাই বললাম। রাগ কর না।

বিছানা পাতাই ছিল। গা এলিয়ে দিয়ে তার কথা শুনছিলাম, শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে গেছি। ঘুম যখন ভাঙল তখন অনেক বেলা হয়েছে, তখনো এরামার ভাইবোন মা-বাবা কেউ মারাং থেকে ফিরে আসেনি। আমারই পায়ের ধারে বিছানা পেতে এরামা ঘুমুচ্ছে। জানালা দিয়ে পূর্বাহ্ণের সোনালী রোদ এসে তার মুখের উপর পড়েছে, খোলা চুলের কয়েক গোছা এসে তার মুখের উপর হাওয়ার তালে তালে গড়িয়ে চলেছে। আমার স্থির দৃষ্টি হয়ত জাগ্রত এরামাকে বিব্রত করত।

ডাকলাম, এরামা, ও এরামা।

এ যেন মরণ-সুপ্তি। ঘুমন্ত দেহ তার কেঁপে উঠল, জবাব পেলাম না। আস্তে তার মাথায় হাত রেখে ধাক্কা দিলাম।

এরামা ওঠ, অনেক বেলা হয়ে গেছে।

এবার তার সাড়া মিলল, চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসল।

বাবারে বাবা, তোমার যা ঘুম। আমাকে বুঝি যেতে হবে না! একটার মধ্যে মাও থেকে গাড়ি ছাড়বে।

কুণ্ঠিতভাবে এরামা বলল, আজ না গেলেই কি নয়?

যাতায়াতের পথে এই বিশ্রামটুকুই যথেষ্ট নয় কি। তোমাদের দেশে এলাম, তোমাদের কত কথা শুনলাম, কত দেখলাম, এই যথেষ্ট। আর আপত্তি কর না এরামা।

সঙ্গিনী বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, আজ তোমার যাওয়া হতেই পারে না। কালকের হৈ-হাঙ্গামায় তোমার খাওয়া পর্যন্ত হয়নি, আজকের দিনটা থেকে যাও। আর অনুরোধ করব না। এ জীবনে হয়ত তোমার সাথে দেখা হবে না, হয়ত তুমি ভুলেই যাবে।

নিষ্ঠুর নিয়তির মতো বলতে পারলাম না যে আমি যাবই যাব। জিজ্ঞাসা করলাম, থাকলে খুশী হও।

নিশ্চয়ই! লুফে নিল আমার কথা। অবিন্যস্ত চুলগুলো গুছিয়ে নিয়ে বলল, পথেই দেখা, পথেই পরিচয়, পথেই বিদায়, তবুও স্মৃতির বুকে আঁচড় থাকবে অনেক কাল।

এরামা বেরিয়ে গেল পাশের ঘরে।

আমি খোলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থেকে ভাবছিলাম। কত অল্পে মানুষের সাথে মানুষের সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। সে-সম্বন্ধ গড়বার মতো মন আর মানসিক বৃত্তি তৈরি করবার জন্য কোনো কসরত করতে হয় না কোনো কালেই। মানুষের হৃদয় মানুষকে অতি সত্বর চিনতে বাধ্য করে। সন্নিকটের মৌন আহ্বান জানায়।

বাবা আদমের যুগে যে নারী প্রথম এসেছিল মায়া, মমতা, স্নেহের বেসাতি নিয়ে, এ সেই নারী। ঘর্মাক্ত জীবনের শীতল পাখা। স্বেদ অপনোদন হয় আকাঙ্ক্ষাবিহীন এদেরই স্নেহের সিঞ্চনে।

এরামা ডাক্তার, নিষ্ঠুরতার সাথে কমনীয়তার প্রলেপ তার ধর্ম। তার ডাক্তারি চিকিৎসার গণ্ডীতে আমিও যেন চিকিৎসিত হচ্ছি। মনে হচ্ছিল দৌড়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে আসি, এরামা, মানুষের জীবনকে তুমি কোন দৃষ্টিতে দেখতে শিখেছ! সেখানে কি সমাধান রয়েছে, না অতৃপ্তির আস্বাদনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে হৃদয়ধর্ম।

বলতে পারিনি। ইম্ফল যাবার পথে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম এরামার ঐকান্তিক স্নেহশীলতায়।

অনেক ভেবেচিন্তে আজকে লিখতে বসেছি যাদের কথা, তারা যে আমাদের সব চেয়ে আপন জন। ওদের বাদ দিয়ে তো আমরা নই। বাদ দেবার চেষ্টা করেছি বলেই তো শান্তির গেহে অশান্তির তুষানল জ্বলতে আরম্ভ করেছে।

ভেসে বেড়ান মানুষ আমি, ছন্নছাড়া আমার জীবন, বিপদ আমার সাথী। সেই আমি অথচ ওদের কথা ভুলতে পারিনি, তাই বোধ হয় গড়তে পারিনি সুস্থ সবল জীবনের গৃহধর্ম। গৃহ আমাকে পর

করে রেখেছে, বোধ হয় গোপনে চেয়েছি, পাইনি। পাবার মতো ঐকান্তিক চাওয়া বোধ হয় ছিল না।

পাতুর মাকে কিছুদিন আগে দেখে এসেছি। আমাকে দেখে খুশির আনন্দে কেঁদে ফেলল।

কাঁদছ কেন মামীমা?

আমি পাগল মানুষ, আমার কান্নাহাসি সবই সমান।

পাতুর মা চোখের জল মুছে হাসিতে মুখ ভরিয়ে আমায় কোলে টেনে নিল।

এই সেদিনের ছেলে তুই, এত বড় হয়ে গেছিস! বিয়ে করেছিস? ছেলে মেয়ে? তবে যে ওরা বলে। বলুক, পাতুও কত বড় হত, তাই না-রে! তার ছেলেটা, সেও বড় হত।

পাতুর মা উদাসভাবে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। অন্তহীন ঐ আকাশ বুঝি তার শেষ আশ্রয়।

তার দুর্ভাগ্যকে সান্ত্বনা দেবার মতো কোনো ভাষা খুঁজে পাইনি।

তবুও সেই মা, সেই নারী, যারা ঘর চায়, স্বামী চায় আর চায় শান্তি।

এরামাকে বুঝতে পারিনি তখনো। তবুও তার মাঝে খুঁজে পেলাম সেই মা, সেই নারী। ঘর পাবার আকাঙ্ক্ষাও কি তার মধ্যে গোপনে উঁকি দিচ্ছে?

এরামা ফিরে এল খাবারের থালা হাতে করে। থালাখানা সামনে রেখে বলল, খাও।

তুমি?

আমারও আছে, তুমি খাও।

তোমার খাবার নিয়ে এস, নয়ত ভাগাভাগি করে খেয়ে নাও।

তুমি অতিথি। তোমার সেবা আমার ধর্ম।

তোমার অতিথি নই, তোমার সঙ্গী, অতিথি তোমার বাবা-মায়ের।

তা বটে; কিন্তু তুমি সারা গাঁয়ের অতিথি। এর মধ্যেই তোমার

সেবার জন্য তিন জোড়া মুরগী এসেছে। জান, সেগুলো দিয়ে গেছে গাঁয়ের অসভ্য মানুষরা। এরপর আসবে চাল, সবজি, দুধ, দই, আরও কত কি।

আশ্চর্য!

আশ্চর্য নয়, এই হল নাগাদের অতিথিসেবার নমুনা। মাথা কেটে নেওয়া তাদের ধর্ম নয়, শৌর্যের পরিচয়।

পুরান একটা খোঁচা দিয়ে এরামা খুশী হল। আমি শুধু হাসলাম।

দিনটা ঘুরে-ফিরে হৈ হৈ করে কেটে গেল।

বিকেলে গিয়ে বসলাম মারাংএর চত্বরে। সঙ্গিনী কিন্তু সঙ্গ ছাড়েনি। দোভাষীর কাজটাই তাকে বেশী করতে হয়েছে, তবুও ক্লান্তি বোধ করেনি, বিরক্তি জানায়নি।

জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগল?

মন্দ কি।

আজ আমাদের বাড়িতে নাচ হবে; দেখছ, তোমায় পেয়ে এরা কত খুশী হয়েছে। এত যত্ন কাউকে এরা করেছে বলে মনে পড়ে না। কেন করছে, জান?

তোমার বন্ধু বলে।

মোটেই নয়। এর আগে যারা এসেছে তারা এসেছে শোষণ করতে, তারা তো উদাসী নয় তোমার মতো; ওরা জানাতে এসেছে, তোমার মতো জানতে ওরা আসেনি; ওরা এসেছে রুপোর বেসাতি করতে, সুযোগ পেলে রূপের উপর হামলা করতে। বুঝলে! ওরা পুঁতির মালার বদলে নিয়ে গেছে গাঁয়ের সম্পদ। আবার অন্য যারা এসেছে, তারা এসেছে শাসনের দণ্ড নিয়ে, শাসিতকে শাস্তি দিতে। তুমি তো তাদের কেউ নও, তাই এত যত্ন। সাপ যদি বিষহীন হয় তাকেও গলায় জড়িয়ে রাখা যায়, মানুষ যদি শয়তান না হয়, তাকে আদর করা যাবে না কেন?

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতেই ফিরে এলাম তার বাড়িতে। বাড়ির আঙিনা মশালের আলোতে ঝলমল করছে, নানা রঙের বেশভূষা পরে মেয়ে-পুরুষেরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার

আগমন-প্রতীক্ষায় তারা উদগ্রীব হয়েছিল। পৌঁছামাত্র কালকের মতো বাজনা শুরু হল।

চাটাই পাতা ছিল। স্থান করে দিল ওরাই। শুরু হল নাচ।

এমন শালীনতাপূর্ণ নাচ দেখার সৌভাগ্য খুব কমই হয়েছে। আমাদের দেশে মনিপুরী নাচের ছড়াছড়ি, সে-নাচ অতি রুচিকর না হলেও ক্ষতি নেই, অথচ এমন সুন্দর শৌর্যপূর্ণ নাচকে সবাই উপেক্ষা করে চলেছে।

এ যেন নটরাজ, প্রলয়ের মাতনে নাচের তুফান বইয়ে দিচ্ছে।

এ যেন পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার প্রেমের চেয়েও দেশের স্বাধীনতা বড়।

এ যেন বৃহন্নলা, প্রয়োজন মতো অস্ত্র ধারণ করছে।

এ যেন অশোক, সাম্যের বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছে দেশদেশান্তরে।

নাচ যে এত প্রাণময় হয়ে দর্শকের প্রাণকে বিমুগ্ধ করতে পারে, তা বোধ হয় সেই দিনই সব চেয়ে বেশী উপলব্ধি করলাম।

বুঝলাম, এরামা যে সমাজে বড় হয়েছে সেখানে সোজা সরল জীবনকেই সবাই ভালবাসে, সেখানে গোপনীয়তা নেই, স্তাবকতা নেই, রয়েছে উন্মুক্ত শৌর্যের দীপ্তি।

অনেক রাতে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম। নাগাপাহাড়ের দ্বিতীয় রজনী রূপকথার স্বপ্নের মাঝ দিয়েই কেটে গেল। মাঝে মাঝে হায়েনার চীৎকারে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছিল, তবু প্রশান্তির অভাব ঘটেনি।

সকালে উঠে ফিরবার ব্যবস্থা করে ফেললাম।

এরামা বলল, যাওয়া নিশ্চিত!

তোমার কথার জবাব সব সময় খুঁজে পাই না এরামা। তুমি যে কি বলতে চাও, বুঝতে পারি না। ক'দিনের বা পরিচয়, এর মধ্যে এত আপন করে কেনই বা তুমি ভেবেছ। এত বেশী না ভাবলে কি চলত না?

তোমাকে তো ডাক্তার বিবুতের কথা বলেছি। ডাক্তার বিবুত মনে করত, ডাক্তারিশাস্ত্র পাস-করা মেয়ে ডাক্তাররাই সব চেয়ে বড়

ভোগ্যবস্তু এবং সহজপ্রাপ্য। একদিন কান ধরে তার ভুল ভাঙিয়ে দিয়েছিলাম। সেদিন সে স্বীকার করেছিল, মেয়েরা চিরকাল মেয়ে, নাগা মেয়েও বা, অসমীয়া মেয়েও তাই, তাদের খোট্টাই মেয়েও তাই। মেয়েরা জান্তব জীবনকে ঘৃণা করে, যারা নেমে আসে জান্তব জীবনে তারা আসে পুরুষ নামক জন্তুদের বিশ্বাসঘাতকতায়। সেই মেয়ে আমি, আমি যে কি বলতে চাই তা তুমি বোঝ না?

বুঝি না, অন্তত বুঝতে চেষ্টা করি না। মেয়েদের সম্মান করে এসেছি চিরকাল, তাদের কাছ থেকে স্নেহ পাবার কাঙাল সেজে রয়েছি আজও।

এরামা কথা না বাড়িয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

দুপুরে রওনা হবার সময় বলল, তোমার সাথে আমিও ইম্ফল যাব।

হঠাৎ! পরিচয়?

পরিচয়! অন্তত তোমার পরিচয় আমার পরিচয় নয়। আমি যাব সরকারী ডাক্তার হিসাবে। আমার পরিচয় কালো আঁচড় দেবে না কোথাও। সে ভাবনা আমার।

তর্কাতর্কি অনর্থক।

সঙ্গিনীর পিতামাতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার দুজনে পথ ধরলাম।

সেবারের মতো এবারও সামনে দুজন সাথী মালগুলো পিঠে বেঁধে চলল। আমরা তাদের পিছু পিছু চড়াই-উতরাই ভেঙে চলেছি।

এরামাকে শিলং থেকে সাথী করে এতদূর এসেছি, শেষের পথটুকু তাকে ছেড়ে চলতে পারছি কৈ!

এই ছন্নছাড়া জীবনটাকে আপন করে কতজনই না ভাবতে চেষ্টা করেছে, যারা চেষ্টা করেছে, তাদেরই একজন এই নাগা মহিলা এরামা। পরিচয়ের স্বল্পতা আপন করে নেবার পথে বাধা জন্মায়নি। কেমন যেন প্রীতির আবেশে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি।

সদরবাজার

ইম্ফল

১১ই মার্চ ১৯৫৪

দুই

যে বিধাতা নিপুণ তুলিকায় নিখুঁতভাবে আমার ভাগ্যলিপি অঙ্কিত করেছেন তাঁকে যদি কাছে পেতাম, তাহলে অন্তত একবার জিজ্ঞাসা করতাম, সব সৃষ্টির পশ্চাতে যদি সত্যিই তোমার কোনো উদ্দেশ্য থেকে থাকে, তাহলে আমায় সৃষ্টি করবার অন্তরালেও নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। সে-উদ্দেশ্যটা কি! মানুষকে অমানুষের কল্পিত রেখার মধ্যে টেনে এনে যাদুকরের মতো ধাঁধাঁ সৃষ্টি করাই কি সে-উদ্দেশ্য, না অন্য কিছু! বিধাতা হয়ত শির কণ্ডূয়ন করে বিকারহীনভাবে বলবেন, ভাল-মন্দের সংমিশ্রণেই তাঁর সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির কে কোথায় সুখে থাকল আর কে থাকল না, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর তাঁর নেই। সত্যিই তো! সত্য যুগে যখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল কম, তখন পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চের মতো মাথাপিছু একটি করে ফাইল রাখা সম্ভব ছিল, এখন যেভাবে লোকবৃদ্ধি হয়েছে তাতে অত হিসাব রাখা দুষ্কর। স্বর্গ-রাজ্যে তো নর-রাজ্যের মতো জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি যে, দরকার মতো লোক নিয়োগ করে সৃষ্টির মাহাত্ম্য রক্ষা করা হবে। মহাকরণে লাল-ফিতার তলায় আমার তোমার মতো অতি নগণ্য ব্যক্তির সুখদুঃখের কাহিনী ধামা চাপা পড়ে রয়েছে, অনাদিকাল ধরে তা রইবে। নিদ্রাভঙ্গ যেদিন হবে, সেদিন আর আমার তোমার প্রয়োজন রইবে না, ধমরাজের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শামলাধারী উকিলবাবুদের সওয়াল হয়ত শুনতে হবে। এই বিচিত্র এবং অমোঘ পরিণতির দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে ভাবছি, পাঁজির একটা পাতা উলটে দিন গণনা করেই আমার তোমার লাভ। যাক, অমুক সালের অমুক তারিখ তো পেরিয়ে গেল। সে-তারিখটা হয়ত কোনো রেখাপাত করেনি জীবনে, তবুও তো দিন কেটে গেছে। এই তো সান্ত্বনা।

তবুও একদিন রোজ কিয়ামত আসবে, সেদিন বিচার হবে। সেদিন এই অবমানিত লাঞ্ছিত মনুষ্যত্ব শোধ নিতে ভুল করবে কি !

আমি নিজে গৃহহীন, তাই হীন-গৃহের গরিমাভরা মানুষকে গৃহ-হীন হতে দেখে আঁতকে উঠেছি।

আমার মতো গৃহহীনকে গৃহের আপ্যায়ন যারা জানায়, তারা না জেনেই করুণা প্রদর্শন করে। তারা যদি জানত, তাহলে এ আপ্যায়নের অপব্যাখ্যা না করে কেউ ক্ষান্ত হত না। তবুও সান্ত্বনা, আজও মানুষ ভালবাসতে একেবারে ভুলে যায়নি। যেদিন সামগ্রিকভাবে মানুষ পরস্পরকে ভালবাসতে ভুলে যাবে, সেদিনকার কথা চিন্তা করলেও আঁতকে উঠতে হয়। স্রষ্টা যেন সেদিন মানুষকে সমষ্টিগতভাবে মার্জনা করে, নইলে সৃষ্টির সব উদ্দেশ্যের তলায় দেখা যাবে বিরাট একটি শূন্য, গোলাকার পদার্থ যা গোলমাল সৃষ্টি করে, নিবারণ করে না।

এরামার সাথে সারা পথ ধরে একথাই বলছিলাম। সেও আমার কথায় সায় দিয়ে আসছিল। হঠাৎ চড়াইয়ের বাঁকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি মনে কর সমতাহীন সমাজই এই অত্যাচারের মূল ?

বললাম, সমতার ঠিক ব্যাখ্যা আর প্রয়োগ-বিধি নিয়ে বেশ কিছু মতান্তর রয়েছে, সে-সমস্যার সমাধান আজও বৈজ্ঞানিকভাবে হয়নি। মনে হয়, আসল কারণ ব্যক্তি-স্বার্থ। ব্যক্তি-স্বার্থ লোভ সৃষ্টি করে, লোভ নায্য দাবিদারদের বঞ্চিত করে ব্যক্তিবিশেষের উপর করুণা সিঞ্চন করে, বুঝলে!

অর্থাৎ তুমি বলতে চাও এই থেকে সৃষ্টি হয়েছে সারা দুনিয়ার অনাসৃষ্টি।

তা বিনা আর কোনো ব্যাখ্যা আমি জানি না। সন্তানের চেয়েও সম্পদের মূল্য বেশী, সম্পদ সন্তানকে দূরে ঠেলে দিয়ে মানুষকে পশুর পর্যায়ে নিয়ে যায়। কালোঘোড়ার অভিনয় করতে হয়। তবুও সম্পদ সৃষ্টি হোক আর না হোক, লালসার শেষ হয় না।

এরামা মুখ ঘুরিয়ে চড়াইয়ের সিঁড়িতে পা দিল।

পেছন পেছন চলতে চলতে বললাম, তুমি ভালবাস নিজেকে নয় কি? তাহলে নিজের প্রয়োজনের বেশী কিছু করা তোমার ধর্ম নয়। তবুও বেশী কিছু সৃষ্টি করতে চাও। কেন না, তোমাদের ভাষায় বলতে হবে যে তোমরা পরিবারধর্মী; স্নেহমমতা দিয়ে পরিবার গঠিত, তাকে ভবিষ্যতের কল্পিত দুঃখ থেকে বাঁচাতে চাও। তাই সম্পদবৃদ্ধি তোমার ধর্ম। এই কি শেষ কথা? অন্যকে সেই দুঃখের মধ্যে ঠেলে দিয়ে নিজেকে তুমি বাঁচাতে চাও, অনাবশ্যক বৃদ্ধিকে সম্ভাষণ জানাও। এর পরিসমাপ্তি অথবা পরিণামও ভেবে দেখ না। তাই দুনিয়া-জোড়া হাহাকারের তলা দিয়ে মানুষ গুমরে উঠছে। যার কান আছে সে শুনতে পাচ্ছে, থমকে দাঁড়াচ্ছে, জিজ্ঞাসা দিয়ে নিজেকে ব্যস্ত করে তুলছে।

মাও থেকে নিয়মিত বাসে দুজন পাশাপাশি অনেকক্ষণ নীরবেই বসেছিলাম। আমার কথাগুলো নিয়েই এরামা মনকে তোলপাড় করছিল বলে মনে হচ্ছিল।

এরামার পীতকপোলে মাঝে মাঝে রঙিন চিন্তাগুলো আঁচড় কেটে উঠেছিল, নইলে হঠাৎ কেন সে জিজ্ঞাসা করল, এর আগে কখনো এদেশে এসেছ কি? আসনি? বেশ করেছ। হঠাৎ গিয়ে হদিস পাবে না। এটা রাজা-বাদশার দেশ ছিল, এখানকার কাজ-কারবার সবই রাজকীয়। আগেই বলে রাখছি, অরাজকীয় মন্তব্য ভেবে-চিন্তে করবে, কেমন?

কোনটা রাজকীয় আর কোনটা অরাজকীয় তা আমার জানা নেই।

তা বটে। শিখে নাও। যা মানুষের তা রাজার নয়. যা রাজার তা মানুষের নয়। সার্বজনীন মানুষের কথাই অরাজকীয়, বুঝলে তো?

বাধা দিয়ে বললাম, নরম যুক্তি দিয়ে সত্যকে অস্বীকার করা সম্ভব। সত্যকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। যা ছিল তার অনুশোচনা বৃথা। ঠাকুরদাদা ঘি খেয়েছেন, নাতিতে হাত শুঁকবে—এ তো কাজের কথা নয়, অযৌক্তিক ব্যবস্থা।

এরামাও হেসে বললে, অভিজাত হাত শোঁকে চিরকাল, নইলে তার স্বাতন্ত্র্য বাধা পায়।

আমি হাসলাম। যৌক্তিক হোক আর অযৌক্তিক হোক, এরামা যেন সব কিছুতে বেশী উৎসাহী হয়ে পড়েছে।

ইম্ফল এসে অবধি সে আমায় সঙ্গ ছাড়া করতে চায়নি। রাতের বেলায় বাংলোর চৌকিদার-পরিবেশিত আহার্য গলাধঃকরণ করে বিদায় চাইলাম। সে হেসে বলল, কালকের প্রোগ্রাম মনে আছে তো? তুমি তোমার বন্ধু রাজকুমারকে সাথে করে আনবে তো?

সকালে রাজকুমারের সন্ধানে বেরুতে হবে। নির্দিষ্ট দিনে আসতে পারিনি, সে হয়ত অপেক্ষা করে ফিরে গেছে, মনে করেছে আমি আর আসব না। আমি আনমনা হয়ে সেই কথা ভাবছিলাম।

আমাকে অন্যমনস্ক দেখে এরামা কি যেন ভেবে বলল, না পেলে দুজনেই বের হব, কেমন?

তাতে বেড়ান হবে, আমার অবশ্যকরণীয় কোনো কাজই হবে না। যাক, কালকের কথা কালকে চিন্তা করব। কেমন? তাহলে চলি।

ইংরেজী কায়দায় শুভরাত্রি জানিয়ে এরামা বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। আমি বাংলোর আঙিনা পেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম সে তখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঠিক এমনি ধারা কমলাকে দেখেছি। সতৃষ্ণনয়নে আমার চলে যাওয়া পথের দিকে সেও এমনি ধারা চেয়ে থাকে। এরামা স্মৃতির দুয়ারে ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তার কথা হয়ত কিছুকাল বাদে নিঃশেষে ভুলে যাব।

পরদিন সকালের কাহিনী চমকপ্রদ না হলেও রাজকুমারকে খুঁজে বের করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। অনুযোগ, বিরক্তি, অনেক কিছু প্রকাশ করে শেষ অবধি অনুরোধ জানাল তার আতিথ্য গ্রহণ করতে।

রাজকুমারের অতিথি হবার সৌভাগ্য থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হয়েছিলাম, কিন্তু রাজকুমার আমাকে ত্যাগ করেনি, অনাদর করেনি, এমন কি প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে সহায়তা করেছে।

সেদিন ঘুরতে ঘুরতে তিনজনেই বর্মা-মনিপুর রাস্তার গম্ভীরগড়ে এসেছি।

গড়ের পুকুরের বাঁধান সিঁড়িতে বসেই রাজকুমার কেমন উদাস হয়ে গেল। সামনে নিথর নিস্তব্ধ জলাশয়, তারই মতো নিথর নিস্তব্ধ রাজকুমারের অবয়ব। ক্লান্তি আর ক্রোধ দুঃখের সাথে মিশে কেমন যেন একটা উদাসীনতা তার মুখে ছায়াপাত করেছে।

এরামা জিজ্ঞেস করল, কি ভাবছ রাজকুমার ?

রাজকুমার উত্তর দিল না, তার গাল বেয়ে টসটস করে চোখের জল ঝরছে।

এরামা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল, আমিও এরামার মুখের ভঙ্গীতে আমার জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান করছিলাম। অবশেষে দুজনেই বোকার মতো বসে রইলাম।

এই প্রাণান্তকারী নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে প্রথম কথা বলল রাজকুমার, কিছু মনে কর না তোমরা। এখানে, এই গড়ে এলে কেমন যেন উদাস হয়ে পড়ি, মনে হয় আমি যেন আমাতে আর নেই।

নাড়ীর টান রয়েছে, নয় কি ?

তা বলতে পার। এই গম্ভীরসিংহের কেল্লায় জমার হিসাবে রয়েছে মনিপুরের উত্থানের কাহিনী, খরচের হিসাবে রয়েছে তার পতন, এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে আমাদের পিতৃপুরুষদের কাহিনী, কাহিনী নয়, ইতিহাস। এখানে এলেই চোখের সামনে চলচ্চিত্রের ছবির মতো সেগুলো ছুটতে থাকে দুরন্ত বেগে, আমি নাগাল না পেয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদি।

জান বোধ হয়, মনিপুরের মাটিতে, মনিপুরের জলে বাতাসে, ফলে ফুলে, মনিপুরের আকাশে শূন্যে জড়িয়ে রয়েছে হাজার হাজার রূপকথা। রূপকথার দেশ মনিপুর, এ হল স্বপ্নের রাজ্য। রূপকথা আর স্বপ্নের চেয়েও বাস্তব মনিপুর। আরও বেশী উন্মাদনাকারী মনিপুরের প্রতিদিনকার সত্যকার ঘটনা।

মনিপুরের রাজা। বলে-বীর্যে-শৌর্যে অদ্বিতীয়। সম্পদে বিভবে অতুলনীয়।

রাজা শিকারে বেরিয়েছেন। রাজার ঘোড়া রেসের ঘোড়ার মতো ছুটছে। পেছনে ছুটছে রাজ্যের সেরা শিকারীর দল। রাজধানীর

সীমানা পেরিয়ে রাজা মিলিয়ে গেলেন পাহাড়ী বনে। সঙ্গী-সাথীরা পড়ে রইল পেছনে অনেক দূরে। বুনো শুয়োর আর হরিণ খুঁজতে খুঁজতে রাজা গহন বনে এসে হাজির; গাছের পাতায় রোদ আটকে গেছে, দিনের বেলায় নিচ্ছিদ্র বনের আঁধারে দিগ্‌ভ্রম ঘটল রাজার। পিপাসায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, ঘোড়ার মুখ দিয়ে সাদা ফেনা বেরিয়ে আঠা হয়ে গায়ের সাথে লেপটে গেছে। রাজা আর রাজার বাহন ঘামে ভিজে গেছে। রাজা খুঁজছেন বন থেকে বেরুবার পথ।

সূর্য তখন পড়ন্ত। বনের সীমান্তে পৌঁছাতেই বেলা গড়িয়ে পড়ল। তখন রয়ে গেছে শুধু আকাশের বিদায়ী লালিমা, বিদায়বেলার শেষ চুম্বনে যেন রাঙা হয়ে উঠেছে নীল আকাশের অধরোষ্ঠ। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বনের শেষ অবধি ধানের ক্ষেত। ছোট একটা গাঁয়ের বুকে এসে ধানের ক্ষেত শেষ হয়েছে। রাজাও ঘোড়াকে কদমে ছোটালেন গাঁয়ের নিশানা ধরে। একটু জল, একটু আশ্রয়!

গাঁওবুড়োর আঙিনায় যখন পৌঁছালেন, তখন সন্ধ্যার শাঁখ বেজে উঠল। গাঁওবুড়োর ষোড়শী মেয়ে তুলসীতলায় সাঁঝের দীপ জ্বালিয়ে সবে উঠে দাঁড়িয়েছে, সামনে এসে দাঁড়ালেন রাজা। শিকারীর বেশ, কোমরে বাঁকা তলোয়ার, পিঠে বাঁধা বন্দুক।

তার মুখের উপর দৃষ্টি রেখে রাজা বললেন, পিপাসা।

কাঁসার গেলাসে ঝরনার শীতল জল, রেকাবিতে মিছরির টুকরো এনে দাঁড়াল গাঁওবুড়োর মেয়ে চন্দ্রমণি।

গোধুলির সেই শুভদৃষ্টি, সেই পিপাসার জল, মুখমিষ্টি করান মিছরি, সেই পিপাসা মেটাবার আবেদন, নতুন জীবনের সন্ধান দিল উভয়কে।

চন্দ্রমণি এলেন রাজরানী হয়ে। রাজার ষষ্ঠ মহিষী, আমার ঠাকুমা।

নহবত বাজল, মাঙ্গলিক গাইল পুরনারীর দল, তোপ দাগা হল কেল্লায় কেল্লায়, ঘরে ঘরে পতাকা উড়ল, রাজার সোহাগী চন্দ্রমণি এসে উঠলেন এই প্রাসাদে, এই গম্ভীরসিংহের কেল্লায়।

সারাদিনের রাজকার্য শেষ করে বিকেলবেলায় রাজা ঘোড়া ছুটিয়ে আসতেন এই প্রাসাদে। চন্দ্রমণি বসে থাকতেন প্রাসাদের অলিন্দে,

কখনো বা গবাক্ষের পাশে। ঘোড়ার পায়ের আঘাতে উড়ন্ত ধুলো দেখলেই প্রসাধনে বসতেন।

এই সেই দিঘির সিঁড়ি। এখানে তাঁরা এসে বসতেন পড়ন্ত বেলায়। রানীর কোলে মাথা দিয়ে রাজা ক্লান্তি দূর করতেন; কখনো বা রানী ছুড়ে মারতেন খোলামকুচি, পুকুরের জলে তরঙ্গ উঠত, সেই তরঙ্গ ধীরে ধীরে আছড়ে পড়ত দিঘির কিনারায়, রানী হেসে উঠতেন, গড়িয়ে পড়ত রানীর মাথা রাজার বুকে।

এই যে বাগান দেখছ, ওখানে ছিল লতার কুঞ্জ। লুকোচুরি খেলতেন রাজা-রানী, লতায় জড়িয়ে পড়তেন পলাতকা রানী, অনু-সন্ধিৎসু রাজা ঝাপটে ধরতেন তাঁর আঁখিপল্লব। হেসে গড়িয়ে পড়তেন দুজনাই। সন্ধ্যার আঁধার নেমে এলে দুজনে এসে বসতেন গোবিন্দের মন্দিরে।

সুখ সয় না, রয় না।

রাজ্যজোড়া অসন্তোষ। ইংরেজ বন্ধু সেজে এসে চোখ রাঙাবে, এ সহ্য হচ্ছিল না প্রজাদের। রাজারও সহ্য হচ্ছিল না। কিন্তু বৃটিশের অমিত শক্তির সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা কোথায়! তবুও রাজাকে প্রতিজ্ঞা করতে হল, মনিপুরের বুক থেকে বৃটিশের চোখ রাঙানীর নিপাত ঘটাতে হবে। আয়োজন চলল। রাজার সামর্থ্যই বা কতটুকু, সম্বল শুধু নিরস্ত্র প্রজাদের শুভেচ্ছা আর স্বাধীনতা রক্ষার অদম্য স্পৃহা। সবার আগে বন্ধুভাবে অনুরোধ জানান হল। ইংরেজকে বলা হল, স্বাধীন মনিপুর তোমাদের বন্ধু, সেই বন্ধুত্ব নিয়েই তোমরা খুশী থাকবে, তার বেশী অপচেষ্টা কিছু কর না। বৃটিশ-শক্তি যুক্তি মানে না, দুর্বলকে নিপীড়ন করা তাদের সাম্রাজ্যবাদী গর্ব। মনিপুরের এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্ভাষণের বিনিময়ে তারা সম্ভাষণ জানাল বন্দুকের মুখে। তোপের মুখে উড়িয়ে দিল মনিপুরের বাজার।

প্রজারা ক্ষেপে উঠল। যুদ্ধ শুরু হল। ফলাফল তো ইতিহাসেই পড়েছ। পরাজিত রাজা নির্বাসিত হলেন, টিকেন্দ্রজিতের ফাঁসি হল প্রকাশ্যে পোলো-মাঠে। অভিনব বিচার। দুনিয়ার কোনো নিরপেক্ষ

শক্তি একবার নিষেধও করল না। অতি সন্তর্পণে আনুগত্যহীনতার অভিযোগে মনিপুর গ্রাস করল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী। যারা স্বাধীনতার পূজারী, তাদের দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড।

আজও যখন পোলো-মাঠ দিয়ে রাতের অন্ধকারে বাড়ি ফিরি, তখন মনে হয়, কে যেন অট্টহাস্যে রাতের নিস্তব্ধতাকে চকিত করে তোলে। বাতাসের শন-শনানির সাথে টিকেন্দ্রজিতের প্রেতাত্মা যেন হা-হা করে হাহাকার ধ্বনি শুনিয়ে যায়, রোমাঞ্চিত হয় দেহ, ব্যাকুল হয়ে ওঠে মন।

রাজকুমার কি যেন ভাবতে লাগল।

এরামা জিজ্ঞাসা করল, তারপর?

স্বপ্নোত্থিতের মতো রাজকুমার বলল, তারপর। তারপর রাজাকে বন্দী করা হল এই গড়ে। তাঁর সাথে রইলেন রানী চন্দ্রমণি। যাঁর দয়া পেতে হাজার হাজার মানুষ উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত, তাঁকে দয়ার উপর নির্ভর করে বাস করতে হল এই প্রাসাদে, সত্য বলতে গেলে বন্দীশালায়। একদিন মহারাজা গম্ভীরসিংহ যে কেল্লা তৈরি করেছিলেন বর্মার পথে বিদেশী শত্রুকে বাধা দিতে, সেই কেল্লায় বন্দী রইলেন মনিপুরের শেষ স্বাধীন নরপতি। স্বাধীনতা রক্ষার যে প্রচেষ্টা করে গেছেন গম্ভীরসিংহ, তাকে ব্যঙ্গ করেই অতৃপ্ত আত্মার এই পরিতৃপ্তি। স্বাধীনতার পতাকা আজও পরাধীনতার ব্যথায় ডুকরে কেঁদে ওঠে এই কেল্লার চত্বরে চত্বরে।

তারপর একদিন সবার অজ্ঞাতে তাঁকে বিদায় নিতে হল তাঁর জন্মভূমি থেকে।

আশাহত রাজা অপমান-জর্জরিত জীবন থেকে মুক্তি পেলেন, রয়ে গেলেন চন্দ্রমণি আর তাঁর পুত্র, আমার পিতা।

বাবা বড় হলেন। চুড়াচাঁদের দয়ায় বাস করবার মতো স্থান পেলেন শহরে, গৃহ নির্মাণ করবার মতো অর্থ পেলেন, কিছু চাষের জমিও পেলেন। রাজপুত্র চাষী হলেন।

ঠাকুমাকে নিয়ে যেতে বাবা এলেন এই কেল্লায়। ঠাকুমা শহরে যেতে রাজী হলেন না। সারা জীবনের স্মৃতি রয়েছে এই কেল্লার আনাচে-কানাচে। এখানে তিনি বধূবেশে এসে রানী হয়েছিলেন, এখানেই তাঁর জীবনের বসন্তরাঙা দিন কেটেছে, এখানেই তাঁর বন্দিত্ব, এখানেই তাঁর স্বামীর স্মৃতি। এসব সুখস্মৃতি ছেড়ে তিনি যেতে চাইলেন না। রাজরানী সন্ন্যাসিনী হয়ে বাস করতে লাগলেন এই কেল্লায়, গোবিন্দের চরণে সারা জীবনের দুঃখকে ঢেলে দিয়ে।

সকালবেলায় স্নান করে ঠাকুমা এসে বসতেন গোবিন্দের দুয়ারে। জপের মালা হাতে, জপমন্ত্রে ঠোঁট নড়ে, চোখ দিয়ে নামে অশ্রুর বন্যা। অদৃশ্য ভগবানকে তাঁর সারা জীবনের কাহিনী বোধ হয় শুনিয়ে চলতেন, দেবতাও বোধ হয় অলক্ষ্যে হাসতেন। জীবনের উপর মায়া মমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে, কমতে থাকে দৃষ্টিশক্তি। অভিযোগ ছিল না, অনুযোগ ছিল না, কেমন যেন শান্ত সমাহিত ভাব।

বাবার সাথে প্রায়ই আসতাম ঠাকুমাকে দেখতে। আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, স্নেহের প্রলেপ দিতেন কপালে।

আমায় ডাকতেন বীর বলে। বলতেন, বীর হোস্ বেটা। তোর ঠাকুরদা ছিলেন স্বাধীন দেশের রাজা, তাঁর যেন গরিমা ম্লান না হয়।

তখন অত বুঝতাম না। আট দশ বছর বয়সে অত বুঝবার মতো মন তৈরী হয়নি। ঠাকুমার কাঁদা দেখে মনে হত কি যেন হয়ে গেছে। কি হয়েছে তা বুঝতাম না, তবুও সেই সাথে আমারও যে সংযোগ রয়েছে তা বুঝতাম।

বাদলা আকাশ মেঘে ঢাকা, অশ্রান্ত বর্ষণে নদীনালা ফেঁপে উঠেছে। মায়ের কোলে মাথা রেখে সন্ধ্যাবেলায় রূপকথা শুনছি, এমন সময় দৌড়াতে দৌড়াতে বাগানের মালী এসে সংবাদ দিল ষষ্ঠ মহারানীর কাল হয়েছে।

সেই দুর্যোগের রাতে বাবা ছুটলেন প্রতিবাসীদের ডাকতে। অনিচ্ছার রেখা ফুটে উঠেছিল তাদের মুখে, তবুও উপরোধ অগ্রাহ্য করতে পারল না। শেষ সময়ে বাবার সাথে ঠাকুমার দেখাও হল না। ইম্ফল নদীর কিনারায় মণিপুরের স্বাধীন রাজার ষষ্ঠ মহারানীর শেষ-

কৃত্য শেষ হল। যার আগমনে নহবত বেজেছে, শত শত পুরাঙ্গনা মাঙ্গলিক গেয়েছে, তোপ দাগা হয়েছে, উৎসবের হল্লোড়ে রাজ্য ভেসে গেছে, সেই মহারানীর বিদায়বেলায় চোখের জল ফেলবার কেউ ছিল না। অকৃপণ প্রকৃতি শুধু অঝোরে কেঁদেছিল। এমন অকৃতজ্ঞ এই মানুষের গোষ্ঠী, যারা আপন জনকে আপন করে ভাবতে শেখে না।

কথা শেষ করেই রাজকুমার উঠে দাঁড়াল। আবেগের আতিশয্যে সে কাঁপছিল।

কোথায় চললে? উদ্বেগের সাথে এরামা জিজ্ঞাসা করল।

চল, গল্প করতে করতে গম্ভীরসিংহের গোবিন্দজিকে দেখে আসি। গোবিন্দজি আজও অতীতের সাক্ষ্য বহন করছে, মণিপুরের উত্থান-পতনের সে-ই একমাত্র নির্বাক দর্শক। সে অতীতকে উপেক্ষা করে নির্লিপ্তভাবে বাক্যহীন দর্শকের মতো আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে দেখে আসি।

চলতে চলতে রাজকুমার আবেগের সাথে বলে উঠল, বেশ হয়েছে, ভাল হয়েছে। রাজ্যহীন রাজার গরিমা এইভাবে পরিসমাপ্ত হওয়াই আমাদের কাম্য। মিটে গেছে আভিজাত্যের বালাই। তবুও ঠাকুমার শেষের ক'টা দিন হয়ে উঠেছিল অত্যধিক যন্ত্রণাদায়ক। এক একদিন যখন ভাবতে বসি, তখন প্রাণটা হু হু করে কেঁদে উঠে। দয়ার দান যা পেতেন তার একটি কণাও তিনি নিতেন না, বিলিয়ে দিতেন হতভাগা মানুষের মাঝে। একদিন বাবা মানা করেছিলেন। তিনি রেগেই বাঁচেন না। বললেন, আজ আমি ভিখারী, যেদিন দিন ছিল, সেদিন ওরাই আমায় রাজরানীর আসনে বসিয়েছিল। অর্থ দিয়ে রাজত্ব করেননি তোর বাবা, সে ভালবেসে ভালবাসা পেয়েছিল ওদের কাছ থেকে, তবেই সে রাজা হয়েছিল, বুঝলি। ওদের সুখদুঃখকে আপন করে ভাবতে না শিখলে, রাজা কোনো দিন রাজা হতে পারে না। ওরাই তো সম্পদ। সম্পদের দিনে ওরা কখনো নিরাশ করেনি, নিরাশ হয়নি। আজ বিপদের দিনে ওদের নিরাশ করতে পারব না, বুঝলি।

মানুষকে এত বেশী ভালবাসতেন তিনি অথচ মৃত্যুর পর চোখের জল ফেলবার কেউ রইল না। আশ্চর্য!

গোবিন্দের মন্দিরশীর্ষে পড়ন্ত বেলায় রক্তিম আলো ছড়িয়ে পড়েছে। রুদ্ধদ্বার মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ভাস্কর্য দেখে ফিরে আসতে হল। গোবিন্দকে চাক্ষুষ দেখবার সৌভাগ্য হয়নি, শুধু দুয়ারে দাঁড়িয়ে শব্দহীন বাক্যে তার সাক্ষ্য রেখে গেলাম। দুঃখের মৌনতা দিয়ে গড়া ঐ পাথরের মূর্তি রুদ্ধদ্বারের ওপারে দাঁড়িয়ে আমাদের শ্রদ্ধা গ্রহণ করল কি না, কে জানে!

এবার কোথায় যাব?

রাজকুমার মুখ ঘুরিয়ে বলল, কাঞ্চিপুর। ঐ নীচের গ্রামটা।

এরামা বলল, আর গিয়ে কাজ নেই, চল শহরে ফিরি।

কালকে ইম্ফল এসেছি। সন্ধ্যার পর থেকে বিশ্রাম পাইনি। ক্লান্তিতে পা দুটো ভেঙে পড়ছিল। মানসিক অবসন্নতা এসে গেছে ঠিকই! এরামার কথার সাথে সায় দিয়ে বললাম, কাল আসব কাঞ্চিপুর।

রাজকুমারও বিশেষ ব্যগ্র নয়। সর্বসম্মতিক্রমেই আমরা ফিরলাম।

ফিরতি পথে এরামা আর রাজকুমার গল্পে মেতে গেল। আমি কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে চলছিলাম, ওদের কথা আমার কানেই যাচ্ছিল না। ওদের কথায় মন দেবার অবসরই ছিল না।

কাল সারা দিন মোটরে কাটিয়ে যখন ইম্ফলে পৌঁছলাম, তখন মনে করিনি এরামাকে নিয়ে বিশেষ ভাবতে হবে। সে তার পদ-মর্যাদার দোহাই দিয়ে ইনস্‌পেকশন বাংলোয় স্থান করে নিয়েছিল, আমার স্থান হল হোটেলে। এরামার ইচ্ছা ছিল আমিও বাংলোয় থাকি। শুধু একটু প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলাম, আমার সরকারী ছাপ নেই।

এরামা বুদ্ধিমতী, অল্পেই আমার অনিচ্ছা বুঝল। তবুও বাংলোয় যাবার আগে আমার হোটেল ঠিক করে দিয়ে আমার সাথে করে

নিয়ে বাংলোয় গেল। উদ্দেশ্য, আমার হোটেল দেখে রাখা আর বাংলো দেখিয়ে রাখা। উভয় উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল বলা যায়।

এরামা কিছুই বলতে চায় না। তবুও তার মনের কথা, আমি যেন হারিয়ে না যাই, অথবা সে আমায় হারিয়ে না ফেলে।

মনে করেছিলাম তার ঐটুকু প্রশান্তিতে কোনো ব্যাঘাত ঘটাব না। আচমকা আমার সাথে ইম্ফল আসার কারণ এখন স্বচ্ছ হয়ে গেছে। তবুও তাকে কষ্ট দেবার কোনো ইচ্ছাই আমার ছিল না। তার প্রশান্তির খোরাক জোটাতে যে আমার শান্তি নষ্ট হবে, তা কিন্তু কখনো ভাবিনি।

সকালবেলায় কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

দরজা খুলতেই সামনে দেখি এরামা। একটা রাতে তার চোখ মুখ বসে গেছে। সারা রাতের অনিদ্রার ছাপ রয়েছে তার সারা অঙ্গে। গত রাতে সে হাসিমুখে আমায় বিদায় জানিয়েছে। আজ সকালে সেই হাসি শুকিয়ে রোদনের পর্যায়ে এসে গেছে।

এ সময়, এ ভাবে? অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

আমাকে দরজা থেকে সরিয়ে দিয়ে গাউনের উপর নাগা ওড়নাটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে বিছানায় চেপে বসল।

আমি আর বাংলোয় থাকব না। অধীর আবেগে গ্রামোফোনের রেকর্ডের মতো তার কথাগুলো বেরিয়ে এল আপনা থেকেই। মনে হল কথাগুলো সারা রাস্তায় সে যেন রিহার্সেল দিতে দিতে আসছিল।

বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

সারা রাত ঘুমুতে পারিনি। আলো নেভাবার সাথে সাথে কে যেন ঘরময় দৌড়ে বেড়াতে লাগল। চুপ করে শুয়ে মজা অনুভব করছিলাম, উঠে এসে আলো জ্বালাতেই দেখি কেউ নেই। আবার আলো নেভালাম। নেভাবার সাথে সাথে আবার দৌড়াদৌড়ি। আমার গায়ের কম্বলের উপর দিয়েও দৌড়ে গেল দু-তিনবার। আলো জ্বেলে রেখে জেগে বসে রইতে হল। সারা রাত ঘুমোতে পারিনি।

চৌকিদারকে ডাকলে না কেন?

অত মনে হয়নি। ডাকলেও ভাল হত না। তার ঘর ওখান থেকে অনেক দূরে।

বেশ, তাহলে আমি একটা ওষুধ দেব, ব্যবহার কর, তাহলে কেউ আর দৌড়াদৌড়ি করবে না, অন্তত তোমার কম্বলের উপর আসবে না।

তোমার সব কিছুতেই ঠাট্টা।

ঠাট্টা। তা বটে। ঠাট্টা করবার মতো বয়স বৈকি। তোমার গায়ের উপর দিয়ে দৌড়ে বেড়াবার মতোই তোমার বয়স হয়েছে, তাই ঠাট্টা মনে করছ।

বালিশের তলা থেকে ভাঁজকরা মশারিটা বের করে তার হাতে দিয়ে বললাম, এটা টাঙিয়ে শোবে, শোবার আগে ঘরের সব ক'টা নর্দমার মুখ বন্ধ করে নিও। আর যদি বাঁশী বাজাবার কেউ থাকে, তাকে বারান্দায় বসিয়ে রেখ। তোমার অদৃশ্য শত্রু তাতেই দেশ-ছাড়া হবে।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ মূষিকবাহিনী তোমায় আক্রমণ করেছিল, তাদের আসা-যাওয়ার পথ বন্ধ করবে, উপরন্তু মশারিটা টাঙাবে। এই ওষুধেই মূষিককুল অনেকটা শায়েস্তা হয়ে যাবে। বুঝলে ?

চা খেয়ে এরামা রওনা হবার সময় বলল, আজ কখন আসছ ?

বারোটা নাগাদ আশা করছি।

এরামা রওনা হতেই রাজকুমারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম।

গম্ভীরসিংহের গড় থেকে ফিরে সাঁঝের আবছা আঁধারে চিফ্-কমিশনারের বাংলোর সামনে এসে আমি ও এরামা হোটেলের পথ ধরলাম, রাজকুমারও ফিরে গেল তার আস্তানায়।

•

রাজকুমার চলে যেতেই জিজ্ঞাসা করলাম, রাজকুমার কি বলছিল ?

তুমি শোননি ?

না, সারা পথ ভাবতে ভাবতে এসেছি গম্ভীরসিংহ আর তার কেল্লা, আর ভেবেছি যষ্ঠরানী চন্দ্রমণিকে।

রাজকুমার ওসব কথা বাদ দিয়ে বলছিল মণিপুরের উপকথা। সে বলল বভ্রুবাহনের কথা :

বভ্রুবাহন ছিল এদেশের রাজা। অর্জুন তার পিতা। মহাভারতের সেরা বীর। জানো তা সবই।

আমি বললাম, জানি, কিন্তু বর্তমান মণিপুরের সাথে সেই কাহিনীর সত্যিই কি কোনো সংযোগ রয়েছে ?

সে বলল, মোটেই না। যুধিষ্ঠির রাজা হয়েছেন। আত্মীয়-স্বজনকে মোগলাই বাদশাহের কায়দায় কোতল করে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসেছেন। ধার্মিক লোক, তাই যেমন বলির পাঁঠার কানে মন্ত্র দেওয়া হয় দোষস্খলনের জন্ত, তেমনি সেই কোতলী যুদ্ধের নাম দিলেন ধর্মযুদ্ধ। দোষ থেকে গা বাঁচালেন।

এরামা হেসে বলল. আমার বক্তব্য নয়, রাজকুমার বলছিল।

সে আরও বলল, যে দাদা জুয়া খেলতে বসে স্ত্রীকে পণ রাখেন, সেই দাদার সখ হল রাজচক্রবর্তী হবেন। সেকালের রাজারাজড়ার কথা, মনে হলেই হুকুম দেন। যুধিষ্ঠির অর্ডার দিলেন, ভারত জুড়ে আমার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত কর, সবাইকে মানতে বাধ্য কর ; সবাই বলুক আমি রাজচক্রবর্তী। অতএব সেকালের রেওয়াজমতো ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হল। জয়তিলক, জয়পত্র মাথায় নিয়ে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ ভ্রমণ করে কেমন করে সেই ঘোড়া নাগাপাহাড় পেরিয়ে মণিপুর এল, তা শুধু ব্যাসদেবই বলতে পারেন। ঘোড়া আটক হল মণিপুরে। পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্ব শুরু হল। শীর্ণতোয়া ইম্ফল নদীর কিনারায় ঘোরতর যুদ্ধ হল। যুদ্ধে অর্জুন পরাজিত হল। ভাগ্যি ভাল, বভ্রুবাহন-জননী স্বামী-বিরহে এতদিন আত্মহত্যা করেনি, তাই রক্ষে, নইলে অর্জুনের কি দুর্গতি হত কে জানে!

রাজকুমার তাহলে বভ্রুবাহনের কাহিনী সম্পূর্ণ রূপকথাই মনে করে ?

তাই তো মনে হল। সে বলল, সোহ্‌রাব আর রুস্তমের কাহিনী যেমন সুন্দর গাঁথুনি দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়, তেমনি বভ্রুবাহনের কাহিনীকে তুলে ধরা হয় ভারতীয়দের সামনে।

আমাদের মনে পুরাতনের ছোঁয়া লেগে থাকে, তাই বীরপূজার নামে নেচে উঠতে দেরি হয় না। বিশেষ করে বিজিত শ্রেণীকে তুষ্ট করবার কৌশল হিসাবেও এসব কাহিনী ব্যবহার করা হয়। অন্ধকার যুগের ইতিহাসকে সব দেশেই বিকৃত ভাব অথবা বিশেষণ দিয়ে এইভাবে স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে আসছে উপরতলার লোকেরা।

উদ্‌গ্রীবভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, তার মতে মণিপুরের আসল ইতিহাস কি?

কেউ তা লিখে রেখে যায়নি, তবুও আচার-ব্যবহার, ভাষা, ধর্ম, এসব বিচার করলে মনে হয় কোনো সময় ভাগ্যান্বেষী কোনো কছাড়-রাজ মণিপুরে এসেছিল। সঙ্গে করে এনেছিল বাংলা হরফমালা আর বৈষ্ণব ধর্ম। রাজকুমার বলতে চায়, এই ধর্মমত মণিপুরকে বেশী করে পঙ্গু করেছে। কাছাড়-রাজ যেমন এই দুটো দান করেছিল বিজিত মণিপুরীদের, তেমনি গ্রহণ করেছিল মণিপুরের সিনোবর্মী জাতীয় ভাষা-কৃষ্টি। সৌভাগ্যবশতঃ সে-রাজা মণিপুরকে উপনিবেশ মনে করেনি, তাই সংমিশ্রণ সহজতর হয়েছিল। শুধু তাই নয়, রাজকুমার বলতে চায়, বাস্তবত মণিপুরীরা ভারতীয় কম, সিনোবর্মী বেশী। চিন্তাধারা, রূপ ও রেখা এই না কি প্রমাণ করে।

হেসে বললাম, সেও তোমাদের মতো মণিপুরীদের অভারতীয় ভাবতে শিখেছে।

অতটা স্পষ্ট করে রাজকুমার বলেনি। তবে সাধারণ মানুষের মনে এ চিন্তাধারা সংক্রামিত হয়েছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

এর কারণ কি বলতে পার?

ঠিক বলা কঠিন, তবে মনে হয়, এ চিন্তাধারার সাথে রয়েছে অর্থ-নীতির গভীর সম্বন্ধ। অর্থনীতির চাপে নীচের তলার মানুষ ক্ষেপে উঠেছে। সেই ক্ষুব্ধ জনতাকে বিপথগামী করবার মতো কায়েমী স্বার্থ-সম্পন্ন লোকের অভাব তো নেই, তারাই অজ্ঞ জনসাধারণকে পুতুল নাচ নাচায়। তারাই এই দুর্বুদ্ধি দান করেছে।

হয়ত তাই। দরিদ্র মানুষ যখন দারিদ্র্যকে জয় করতে চায়, তখন স্বার্থসম্পন্ন লোকেরা মনে করে এটা ওদের অপরাধ। অপরাধীকে ওরা

যখন সাক্ষাৎভাবে শাস্তি দিতে পারে না, তখন সংকীর্ণ চিন্তাধারার মাঝে ওদের আটক করে, নির্বুদ্ধিতা দিয়ে নিজের জালে নিজেরাই যাতে জড়িয়ে পড়ে তার পথ উন্মুক্ত রাখে।

এরামা অন্য কোনো প্রসঙ্গ খুঁজছিল। বলল, কালকে লোগতাক যেতে রাজী আছ তো? লোগতাকের কিনারায় মইরাঙ শহর ছিল সেকালে মণিপুরের প্রাণকেন্দ্র। অনেক কাহিনী জড়িয়ে আছে ঐ লোগতাকের সাথে কত কথা, কত উপকথা, সেসব শুনলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

জিজ্ঞাসা করলাম, ইম্ফলে তো বহুবার এসেছ, সব দেখা কি শেষ হয়নি আজও, বাকি রয়েছে কি?

এরামা উৎফুল্লভাবে বলল, সত্যি দেখবার মতো শহর ইম্ফল! প্রকৃতি অকৃপণভাবে একে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে রেখেছে। এ দেশের লোকের বিশ্বাস নয়টি পাহাড় দিয়ে ঘেরা এই দেশে অভাব হবে না কোনো দিন। শহরটা ঘুরে ফিরে দেখলে মনে হয়, মধ্যযুগে এরকম সুরক্ষিত শহর ভারতের আর কোথাও ছিল না। পাহাড়ী দু চারটে যা পথ তাও সে-যুগে শত্রুর পক্ষে সুগম ছিল না। তাই মণিপুর স্বাধীনতা রক্ষা করে এসেছে বহুকাল। বর্মীদের আক্রমণে একবার মাত্র বিধ্বস্ত হয়েছিল এই রাজ্য। নইলে ধনধান্যে পরিপূর্ণ এই দেশে কোনো গোলযোগ কোনো দিন হয়নি। রুখতে পারেনি শুধু ইংরেজকে। পাহাড়ের ফুটোফাটা দিয়ে বানের জলের মতো সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এসেছিল, কায়েম করেছিল তাদের শোষণ-যন্ত্র। যার ফলে সোনার দেশ মণিপুরেও হাহাকার দেখা দিয়েছিল। ঘরের মেয়েদের সেদিন বেরিয়ে আসতে হয়েছিল আহার্যের সন্ধানে। বুভুক্ষু স্বামী-সন্তানের মুখে ভাত দিতে না পেরে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে এরামা কি যেন ভাবল, ভাবতে ভাবতে অস্থিরভাবে বলল, মজুতদারদের চীৎকারের তলায় অনাহারী লোকের ক্রন্দন ঢেকে গেল। বোধ হয় এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটত, যদি না তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করত এক মহান ত্যাগী।

হোটেলের কাছে এসে গেছি। এরামা গদগদভাবে বলে চলেছিল, বাধা দিয়ে বললাম, আবার কাল শুনব, বুঝলে।

বাধা পেয়ে ক্ষুণ্নভাবে সে বলল, আজ বুঝি অবসর হবে না! এমন অনুযোগের সুরে কথাগুলো বলল, যাতে মনে হল কোথায় যেন তার দুঃখ ঢেকে রাখতে চাইছে, অথচ উপচে পড়তে চাইছে তার মনের আবেগ। আমার ও তার ব্যবধান সম্বন্ধে সে যেন সজাগ হয়ে উঠল।

বললাম, অবসর! দুরন্ত অবসর রয়েছে সারা জীবনে। তুমি আমি সেই অবসরের হিসাব করতে পারব না। তবুও যখন ফুরিয়ে যাবে সব, তখন শুনব এসব কাহিনী। সব বলা শেষ হয়ে গেলে, কি থাকবে অবসর যাপনের।

এরামাকে বাধা দিয়ে থামিয়ে সেদিন রাখলেও, হোটেলে বসেই পরের দিন সে বাকি কাহিনী না শুনিয়ে রেহাই দেয়নি। আমার অবসর দূরবর্তী হলেও তার অবসর ধৈর্যানুগ, স্থির ও স্থবির।

পরের দিনই তার অসমাপ্ত ইতিকথা বিনা ভূমিকায় আরম্ভ করেছিল।

নুপীলাল! নাম শোননি বুঝি! এরামা আরম্ভ করল।

নুপীলালের কথা ক'জনই বা জানে। নেহাৎ মণিপুরের গায়ে গা দিয়ে ওরা বাস করে, তাই নুপীলালের সাথে ওদের পরিচয় ঘটেছে। নুপীলাল কারুর নাম নয়। মণিপুরী ভাষায় মেয়েদের বলে 'নুপী' আর বিদ্রোহকে বলে 'লাল'।

মণিপুর স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ। হাটে-বাজারে মেয়েরা ক্রেতা, মেয়েরা বিক্রেতা। চটুল চাহনি, রঙিন মুখ বাইরের খদ্দেরকে কোথায় নিয়ে যায় তা বলা কঠিন। বুকের উপর শাড়ি জড়ান, সে শাড়িও নিজেদের তৈরী, অপূর্ব কারুকার্যে ভরা সূচিশিল্প-বহুল মণিপুরের বস্ত্রশিল্প। মণিপুরী মেয়েদের বিয়ে দেবার আগে পাত্রপক্ষ জেনে নেয় মেয়ে তাঁতের কাজ জানে কি না। কাপড় বোনা বিয়ের বাজারে

পাত্রীর যোগ্যতার মাপকাঠি। সেই মান্ধাতার আমলের তাঁত আজও ঘরে ঘরে চলছে। সেই মান্ধাতার যুগে যেমন ছুঁচিভা তাঁত বুনত, আজও তেমনি বুনছে। মণিপুরের গ্রামে খটাখট শব্দ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

মণিপুরী নারীদের বেশী চিন্তা করতে হয় স্বামী-সন্তানের ভরণ-পোষণের। স্বামী চাষী, না হয় যোদ্ধা; গৃহ স্ত্রীর, সেখানে সে সম্রাজ্ঞী।

এই মণিপুরীর দল এক সময় স্বামী-পুত্রের ক্ষুধার্ত মুখে অন্ন দিতে না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তারা দল বেঁধে ছুটল মজুতদারদের গুদামে। বলল, চাল দাও।

চাইলেও তো পাওয়া যায় না। মজুতদাররা চাল দেবে কেন? যুদ্ধের বাজারে পাঁচ টাকার চাল পঞ্চাশ টাকায় বিকোচ্ছে। তারা চাল চালান দিতে পারলে রাতারাতি বড়লোক হবে। মানুষ খেলো আর না খেলো তাতে কি এসে যায়। মানুষের সাথে তাদের সম্বন্ধ কতটুকু, তাদের সম্বন্ধ রৌপ্য-চক্রের সাথে। রূপার রূপে মানুষের অনাহার ঢাকা পড়ে গেছে। বাংলার বাতাস তখন অনাহারী মানুষের বুকভাঙা ক্রন্দনে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, তারা সেই বিষকে ছড়িয়ে দিতে চাইল মণিপুরে।

মেয়েরাও কম নয়। তাদের রক্ত জল-করা মেহনতীর দান খাদ্যশস্য নিয়ে ফাটকা খেলতে তারা দেবে না। তারাও উঠে-পড়ে লাগল চাল আদায় করতে। হাতা-খুন্তি-ঝাঁটা নিয়ে ঘেরাও করল চালের গুদাম। রাস্তায় শুয়ে রইল, যাতে চালের গাড়ি বের হতে না পারে। দেশের লোক অনাহারে রইবে আর চালের দানা বাইরে চালান যাবে, তা হবে না।

এদিকে জাপান আর আজাদী ফৌজ দ্বারে আঘাত হানছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ মজুতদারদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে মানুষকে অনাহারী রেখে খাদ্যশস্য পাচারে ব্যস্ত। তখনকার কথা মনে মনে কল্পনা করলে ভয়ে আঁতকে উঠতে হয়। মেয়েদের এই বাধা ইংরেজ সহ্য করবে কেন, অতএব রক্তপাত অনিবার্য হয়ে উঠল।

সেই দিন ঐ জনতার নেতৃত্ব করতে এসে দাঁড়াল ঐরাবত সিংহ। রাজবাড়ির জামাতা, রাজার মন্ত্রী ঐরাবত, দেশের ডাকে একদিন দাসত্বের প্রতীক উষ্ণীষ পুড়িয়ে দিয়ে দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি চেয়েছিল যে ঐরাবত, সে এসে দাঁড়াল নারী-জনতার পুরোভাগে। ঐরাবতের মতো বীর্যে সে রুখে দাঁড়াল দুর্নীতির বিরুদ্ধে।

রাজা ফৌজ পাঠাল। হুকুম হল, 'রুখ দেও'। রাজার ফৌজ সার দিয়ে গুদাম ঘেরাও করে দাঁড়াল। মজুতদারদের স্বার্থরক্ষার প্রহরী তারা। সামান্য উত্তেজনায় সর্বনাশ হবার উপক্রম, একটা খুনোখুনি হয় আর কি। এমন সময় ঘোড়ায় চড়ে মণিপুরের আসল-রাজা ইংরেজের এজেন্ট সরজমিনে তদন্তে এল। ইংরেজের কূটনীতি বুঝতে পেরেছিল বিভেদ সৃষ্টি করে মণিপুরীদের হাত করা সম্ভব নয়, বিশেষ করে জাপানী যখন দরজায় হামলা দিচ্ছে তখন মণিপুরীদের শান্ত রাখাই যুক্তিযুক্ত। এজেন্টের চেষ্টায় রক্তপাত এড়িয়ে মণিপুরী মায়েরা স্বামী-সন্তানদের আহার্য পেল, আসন্ন সর্বনাশের হাত থেকে মণিপুরের মা-বোনেরা দেশের লোকদের বাঁচাল। রাজার ফৌজ ফিরে যেতে বাধ্য হল। নুপীদের জয় জয়াকার।

সমসাময়িক ঘটনা বাংলার মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ। কাতারে কাতারে মানুষ অনাহারে মরল। ঈশ্বরের দান মনে করে দুর্ভাগ্যকে অভিশাপ দিয়ে মৃত্যুকে জীবনের পরম সম্পদ বলে মেনে নিল। একজন পুরুষও আঙুল উঁচু করে প্রতিবাদ জানাল না। মণিপুরী মায়েরা যা পারল, বাংলার কোটি কোটি পুরুষ তা পারেনি। এ ইতিহাস যেদিন লেখা হবে, বাংলার মানুষ সেদিন মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে কি!

ইংরেজ বিচক্ষণ, তারা বুঝতে পারল, ঐরাবতের মণিপুর স্থিতি ভবিষ্যতের বিপদসূচক। আজকে যে 'লাল' দানা বাঁধতে পারেনি, সেই 'লাল' দানা বাঁধবে উপযুক্ত নেতৃত্বে, ইংরেজের স্বার্থ বিপন্ন হবে। ত্বরিত গতিতে ঐরাবতকে আটক করে তাকে হরিণবাড়ির কয়েদখানায় হাওয়া বদল করতে পাঠিয়ে দিল। স্বাধীনভাবে ঐরাবত চলাফেরা করলে ইংরেজের সমূহ বিপদ, ভবিষ্যতে ঐরাবত বেনোজলের মতো নিজের বেরোবার খাল কেটে বেরিয়ে যেতে পারে, এই ভয়ে তাকে

আটক করে বাংলায় নিরাপদ স্থানে পাঠান হল। অন্যায়ের আর অবিচারের প্রতিকার প্রার্থনা যারা করে তারা অন্যায় আর অবিচারের চক্রতলে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হয়।

টিকেন্দ্রজিৎকে আজও যেমন মণিপুরের আবালবৃদ্ধবনিতা স্মরণ করে তেমনি নিভৃত নিরালায় অনেক মা ঐরাবতের জন্যও গোপনে অশ্রুপাত করে। মানুষকে আপন করে ভালবাসবার এত বেশী ক্ষমতা এই দুজনের ছিল যার তুলনা পাওয়া দুষ্কর। একজন ছিল সামন্ত মতের পরিপোষক, ক্ষমতাচ্যুতির ভয়ে আত্মহারা; অপর জন হল সাধারণের সেবক, ক্ষমতাকে মানুষের হাতে তুলে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই আজও তারা ভালবাসা পেয়ে আসছে মণিপুরের আবালবৃদ্ধ-বনিতার কাছে। একজন পাচ্ছে বীরপূজার প্রাপ্য হিসাবে, অপর জন পাচ্ছে মহান ত্যাগের পুরস্কাররূপে।

মণিপুর ঐরাবতকে হারিয়েছে তার রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য। অনেক মধ্যপন্থীকে বলতে শুনেছি, ঐরাবত ভুল না করলে আজ মণিপুরকে কোণঠাসা হয়ে থাকতে হত না। আজকে মণিপুরের শাসনতন্ত্রে অ-মণিপুরীর প্রাধান্য স্থাপিত হত না। ঐরাবতের সে ভুলটা যে কি তাও তারা ব্যাখ্যা করতে পারেনি।

আজ ঐরাবত রূপকথার রাজপুত্র। তাকে কেন্দ্র করে কত কথা, কত কাহিনী, কত উপকথা গড়ে উঠেছে তার ইয়ত্তা নাই। বাঙালী চরিত্রের একটা দিক মণিপুরীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা যায়, সে হচ্ছে ভাবপ্রবণতা। ভাবপ্রবণ মণিপুরীরা চারণগান আর কবিতা রচনা করতে খুবই পটু। তারা যেমন থইবী-খাম্বার কাহিনী সৃষ্টি করেছিল, তেমনি তারা ঐরাবতকে নিয়ে নানারূপ কাহিনী এর মধ্যেই রচনা আরম্ভ করেছে। অতি সংগোপনে এই রূপকাহিনী এখন শুনিয়ে বেড়ায় মণিপুরের চারণ-কবির দল।

লোগতাক হ্রদ মণিপুরের দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। নয়নাভিরামকর এই মনোরম হ্রদের তীরে মইরাঙ। এক সময় মইরাঙ

ছিল মণিপুরের রাজধানী। সে রাজধানীর চিহ্ন মইরাঙএর কোথাও নাই। রয়েছে দারিদ্র্য-নিষ্পিষ্ট কৃষকের পর্ণকুটির আর অতি সামান্য-সংখ্যক অর্থবানের বেখাপ্পা হর্ম্য। সংখ্যায় নগণ্য হলেই বা কি হবে, আভিজাত্য তার মোটেই নগণ্য নয়। উপকথার রাজধানী মইরাঙ। মণিপুরের ইতিহাসের প্রধান উপাদান মইরাঙ। সত্যি হোক মিথ্যা হোক, মইরাঙএর ইতিহাস না জানে এমন লোক মণিপুরে নেই বললেই চলে।

লোগতাকের স্বচ্ছ জলে যদি মইরাঙএর ছায়া এসে পড়ত, তাহলে আয়নায় দেখা রূপসীর মতো সে মোহ সৃষ্টি করত। বাস্তবত তার সৌন্দর্য রুগ্ন, তাই সাদা চোখে এই রুগ্ন মইরাঙকে ভাল লাগেনি। ছায়ার রূপ বাস্তব কায়ার অসম্পূর্ণতা আচ্ছাদিত করবার সামর্থ্যহীন বলেই মনে হয়েছিল।

খোলা ময়দানে বুড়ো বটগাছতলায় এসে বসলাম।

এরামা তার ব্যাগ খুলে খাবার সাজিয়ে দিল সবাইকে।

রাজকুমার মোটামুটি বিবরণ দিয়ে মণিপুরের বিরাট ঐতিহ্য বিবৃত করতে ব্যস্ত। আমরা আহার্য আর প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে ব্যস্ত।

সৌন্দর্যের অনিন্দ্য প্রতিনিধি এই লোগতাকের তীর। শ্যামদূর্বাদল, শ্যামলিমাভরা বৃক্ষবনরাজি, শ্যামায়িত দিগন্ত, অপূর্ব আনন্দের স্মারক। সূর্যের সোনালী আলোর ঢেউএ চিকমিক করে উঠছে হ্রদের জল। কিনারা থেকে অনেকটা দূরে জলের রেখা। সাদা হাঁসের দল লোগতাকের বুকে নির্ভয়ে সাঁতরে বেড়াচ্ছে নীল আকাশে এক এক টুকরো সাদা মেঘের মতো। হ্রদের কিনারায় গ্রাম। গ্রামের বাদামী রঙের খড়ের ঝুপরিগুলো হ্রদের এ পারের প্রান্তরেখা। অপর প্রান্ত দৃষ্টির বাইরে।

এরামা বলল, এই তোমাদের লোগতাক ?

পছন্দ হল না বুঝি ?

বিরাট এই জলাশয়, এর এপার ওপার দেখা যায় না, কাঁচের মতো স্বচ্ছ জল, রূপোর ঢেউ, আরও কত কি, ভাল লাগবে না কেন ?

সত্যিই লোগতাককে ভাল লাগে।

যে কাহিনী শোনাতে রাজকুমার উসখুস করছিল, সেই কাহিনীর সূত্র যোজনা করল এরামা। রাজকুমার আপন মনে বলতে লাগল, লোগতাকের কিনারায় ছিল বকুলগাছ।

সেই বকুলগাছের তলায় এসে বসত চাষার ছেলে খাম্বা। হ্রদের কিনারায় গরু মোষ ছেড়ে দিয়ে বকুলতলায় বাঁশী বাজায় খাম্বা। দুপুরের পর রোদ যখন ঝিমিয়ে আসে, খাম্বা তখন গরুদের জল খাওয়াতে হ্রদে নামে। নিজেও নেয়ে ধুয়ে পরিষ্কার হয়। সব চেয়ে বড় মোষটার পিঠে উঠে বসে। হ্রদের জল এলোপাতাড়ি করে ঝাঁপাই পিটিয়ে খাম্বা যখন কূলে দাঁড়ায়, পড়ন্ত সূর্য তখন তার কপালে স্নেহের স্পর্শ দিয়ে বিদায় নেয়। খাম্বাও মোষের পিঠে চড়ে বাঁশী বাজাতে বাজাতে ঘরে ফেরে।

রাজার মেয়ে থইবীদেবী। রোজ বিকেলে সখীদের নিয়ে নাইতে আসে হ্রদের কিনারায়। রাজকুমারীর যখন নুপুরের ঝঙ্কার ওঠে, খাম্বার বাঁশীর তখন লহর উঠে। রাজকুমারী বাঁশীর শব্দ শুনতে পায়, কে বাজায় তা কখনো দেখেনি, দেখবার দরকারও হয়নি। তরুণীর রূপে আকাশ বাতাস চমকে ওঠে, হ্রদের জলে বাঁশীর আওয়াজের সাথে সাথে সৌন্দর্যের লহর ওঠে। রাজকুমারী বাঁধান ঘাটে কোমরজলে দাঁড়ায়, সখিরা জল ছিটিয়ে দিতে থাকে তার অঙ্গে। রূপোলী মুক্তার মতো জলের ঝরনা রাজকুমারীর রূপোর রঙে গা মিলিয়ে সোহাগে আঁকড়ে ধরে। সখীরা শাড়ির পর্দা তুলে ধরে, রাজকুমারী ভেজা কাপড় বদলে নিয়ে শিবিকায় উঠে বসে। সান্ত্রীরা হৈ হৈ করে পাহারা দিয়ে চলে।

এই হল নিত্যকার ঘটনা।

আজ রাজকুমারীর জন্মদিন, চন্দনের সুগন্ধিতে বাতাস ভরপুর।

রাজকুমারীর পায়ে আলতা, কপালে চন্দন, রাজকুমারী চলল নাইতে। সখীরা যুঁই দোপাটির মালায় তাকে সাজিয়ে দিয়েছে বনদেবীর মতো। রাজকুমারীর শিবিকা হ্রদের কিনারায় আসল, চপল চরণে নেমে এল রাজার কুমারী, সাথে এল সখীর দল। সূর্য তখন নিভু নিভু, পড়ন্ত সূর্যের রেখা মিলিয়ে যেতে না যেতে শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠল আকাশের শেষ কিনারায়, আকাশে স্নিগ্ধ আলোর ছাপ পড়ল তার সাথে সাথে।

রাজকুমারী স্নান সেরে উঠে আসতেই সখীরা বলল, রাজকন্যা আজ তোমার জন্মদিন, আজকে আমরা ঝুলন খেলব। রাজকুমারী রাজী হল। রাজকুমারীর সম্মতি পেয়ে ছুটে চলল সখীরা। বকুল ডালে ঝুলন ঝোলাবে তারা। কিন্তু রশি না হলে ঝুলন ঝোলা হবে কি করে। শিবিকায় ঝুলন তৈরির মতো রশি নেই। সখীরা গালে হাত দিয়ে বসল।

তখন হ্রদের ওপারে বাঁশী বাজছে। রাজকুমারী বলল, দেখ তো বাঁশী বাজায় কে? ওর কাছেও তো রশি থাকতে পারে।

সখীরা আবার ছুটল। পড়ি-মরি করে ছুটতে ছুটতে সখীরা এসে দাঁড়াল খাম্বার সামনে।

দড়ি আছে গো? ঝুলন টাঙাব।

খাম্বা তখন মোষের পিঠে বসে বাঁশীতে ফু দিয়েছে। তাদের কথা শুনে বাঁশী থেকে মুখ তুলে হাসল, বলল, আছে। বাঁধন সইতে পারবে কি!

সখীরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। সাহস সঞ্চয় করে একজন বলল, রাজকুমারী বসে রয়েছে হ্রদের কিনারায়, দড়ির দরকার তারই। তার কাছে চল, সে তোমার কথার জবাব দেবে।

খাম্বা কেমন ঘাবড়ে গেল। দূর থেকে রাজপ্রাসাদ দেখেছে। ফটকে বড় তলোয়ারধারী সান্ত্রী দেখেছে, দেখে নাই তাদের মালিক আর মালিকানীদের। তার কৌতূহলও কম নয়। মনে করল, এই তো রাজবাড়ির মালিকদের দেখবার সুবিধা, এ সুযোগ ছাড়ব কেন!

সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, বেশ চল, তোমাদের রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করে আসি। বাঁধন সে সইতে পারবে কি না।

খাম্বা বুক উঁচিয়ে থইবীর সামনে দাঁড়াল। বাঁ হাতে তার বাঁশী, ডান হাতে গরুর দড়ি।

রাজকুমারী অপলকে খাম্বার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, একটা ঝুলন বেঁধে দাও।

ঝুলন? ঝুলবে কে? আমাকে যদি ঝুলতে দাও তবেই দেব, নইলে নয়। বুঝলে!

রাজকুমারী লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। সখীরা খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। সন্ধ্যার জ্যোৎস্নায় হাসির দমক লেগে লোগতাকের জল শনশনিয়ে উঠল। ঝটপট করে কবুতর দম্পতি ইঙ্গিত জানাল।

রাজকুমারী থইবীদেবী উঠে বসল ঝুলনে, খাম্বাও বসল তার পাশে বাঁশী হাতে নিয়ে। সখীরা দোল দেয়, বাঁশীর মূর্ছনায় ভরে ওঠে দশদিক। দোল খেয়ে রাজকুমারী ভয়ে জাপটে ধরে খাম্বার ডান হাত, বাঁশী পড়ে যায় খাম্বার হাত থেকে।

ভয় পেয়েছ রাজকুমারী? কানের কাছে মুখ তুলে খাম্বা জিজ্ঞাসা করল।

রাজকুমারী ঘেমে উঠেছে, তবুও বলল, তুমি আছ, ভয় কি?

আমি থাকলে বুঝি ভয় থাকে না? খাম্বা হাসল।

রাজকুমারী কি বলতে কি বলেছে। বলেই লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল, রাজকুমারী জবাব খুঁজে পেল না, কেমন মোহের আবেশে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

থইবী-খাম্বার মিলনরাত্রি অমর হয়ে রইল, ধন্য হল লোগতাক।

রাজকুমারী সখীদের বলল, কাউকে বলিসনি যেন!

তাদের বলতে হয়নি, বাতাসের মুখে কথা ভেসে বেড়ায়। ধীরে ধীরে রাজার কানেও কথা উঠল। থইবীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, এ কি সত্যি?

রাজকুমারী পায়ের আঙুলে মাটি খুঁটতে খুঁটতে বলল, হাঁ।

ভাল করনি। রাজার মেয়ের স্বামী হবে বীর-শ্রেষ্ঠ। রাজার মেয়ের সাথে চাষা রাখালের বিয়ে হতে পারে না। তার যদি শক্তি থাকে, সাহস থাকে, সে শক্তির পরীক্ষা দিক। সে যদি জয়লাভ করতে পারে তাহলেই তার সাথে তোমার বিয়ে হবে, বুঝলে।

রাজকুমারী মাথা নীচু করে ফিরে গেল।

বড়ই ভাবনা।

চাষার ছেলের রূপ রয়েছে, স্বাস্থ্য রয়েছে, কিন্তু শক্তির পরীক্ষা দেবার মতো সামর্থ্য রয়েছে কি?

সখীরা কেউ অলক্ষ্যে হাসল, কেউ সাহস দিল।

রাজকুমারী ভেবে কুল পায় না। প্রাসাদের নিভৃত গবাক্ষে বসে ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে থাকে।

খাম্বার কাছেও খবর পৌঁছাল।

রাজকুমারী ঘিয়ের সলতের পোড়া অংশ দিয়ে কদলীপত্রে অভিজ্ঞান লিখে পাঠাল।

খাম্বার বেপরোয়া মনের কথা বহন করে আনল তালপত্র। পত্রের বুকে ভেজা মাটির লিপি।

পরস্পর পরস্পরকে জানল।

খাম্বা পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হল।

কুচ ময়দানে লোকে লোকারণ্য। সেপাইরা ভীড় সরিয়ে একটা বুনো মোষকে টানতে টানতে নিয়ে এল ময়দানের মাঝখানটায়। আজ খাম্বাকে লড়াই করতে হবে এই বুনো মোষের সাথে, লড়াই করবার অস্ত্র কিছুই থাকবে না, খালি হাতে মোষকে পরাজিত করতে হবে।

রাজকুমারী দোতলার অলিন্দে বসে খাম্বার বিজয় কামনা করছে, সখীরা সকালবেলায় মানত পুজো দিয়ে এসে রাজকুমারীকে ময়ূরের পাখা দিয়ে বাতাস করছে, প্রবোধ দিচ্ছে। তবুও সবাইয়ের বুক দুরু দুরু করছে।

খাম্বা এসে দাঁড়াল রঙ্গভূমিতে।

বুনো মোষকে খেপিয়ে ছেড়ে দিল সেপাইরা। খাম্বা স্থির অচঞ্চল। মোষ ছুটে আসছে। খাম্বা যেন পাথরের মূর্তি। মেয়েরা ভয়ে ডুকরে উঠল। পুরুষেরা গোবিন্দের নাম জপ করতে লাগল। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় মুখ ফিরিয়ে নিল অনেকেই।

মোষ ছুটে এসে খাম্বার সামনে থমকে দাঁড়াল।

খাম্বা তার শিঙ দুটো ধরে ধোপার কাপড় কাচার মতো তুলে দিল এক আছাড়। অত বড় দুর্দান্ত মোষ মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে গেল এক নিমেষে।

জনতা চীৎকার করে উঠল, জয় খাম্বার জয়।

মানুষের অসাধ্য কাজ সাধন করল খাম্বা।

শপথমতো রাজকুমারীর সাথে খাম্বার বিয়ে হল। উৎসব আয়োজন মোটেই হল না, রাজার মেয়ের বিয়ে হল রাখালের সাথে, তার আবার উৎসব! রাজকুমারীকে যারা ভালবাসত তারা দুঃখ পেল, যারা দুশমন তারা মনে মনে খুশী হল।

খাম্বা-থইবী রাজপ্রাসাদ ছেড়ে গিয়ে উঠল খাম্বার পর্ণকুটিরে। এখানে শেষ যদি হত খাম্বা-থইবীর কাহিনী, তাহলে সে কাহিনী মাধুর্য হারিয়ে সাদা-মাটা কাহিনীতে পরিণত হত। অদৃষ্ট অলক্ষ্যে বসে তাদের পরিণতি লক্ষ্য করছিল। তাই কাহিনী আরও এগিয়ে চলল, রোমাঞ্চ-বিয়োগ-বিধুর হয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটল।

সকালবেলায় খাম্বা মাঠে বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে সেই সন্ধ্যায়। থইবীর একা একা ভাল লাগে না। সে বাগান করে, সবজি লাগায়, গান গায়! এমনি করে দিন কাটে।

রাজবাড়ির অনেক শত্রু। রাজকুমারীর এই বিয়েতে কেউ খুশী হয়েছে, কেউ হয়নি। যারা খুশী হয়নি তারা চুপি চুপি খাম্বাকে খবর দিত, থইবীর বিরুদ্ধে কুকথা বলত। তারা বলত, তুমি তো বাপু বাড়িতে থাক না, থইবী কি করে তাও জান না। রাজার মেয়ের স্বভাবচরিত্র কি কখনো ভাল হয়।

একদিন দুদিন শুনতে শুনতে খাম্বার বিশ্বাস হল। তবুও থইবীকে

কোনো কথা বলতে পারল না। মনে মনে ঠিক করল, থইবীকে পরীক্ষা করতে হবে।

তাড়াতাড়ি সেদিন বাড়ি ফিরে বলল, আজ পিসীর বাড়ি যাব, আসতে দু-একদিন দেরি হবে।

থইবী কেঁদে ফেলল, বলল, দুদিন কোথাও তুমি থাকতে পাবে না, তাড়াতাড়ি আসবে, আজকেই আসবে।

কোথাও গেলে দেরি হয়। তার উপর অনেকদিন পিসীর সাথে দেখা হয়নি, সে কি তাড়াতাড়ি ছাড়বে।

নানা রকম স্তোক দিয়ে থইবীর চোখের জল উপেক্ষা করে খাম্বা বেরিয়ে গেল।

থইবীর চোখে ঘুম নেই। তেলের প্রদীপ জ্বেলে বসে রয়েছে। হঠাৎ মড়মড় করে দরমার বেড়া নড়ে উঠল। থইবী দরমার বেড়ার মাঝ দিয়ে একখানা তলোয়ারের মাথা দেখতে পেল।

মণিপুরের অসতী নারীদের উপপতি তাদের প্রার্থিতাদের সাথে দেখা করতে এলে তলোয়ারের মাথা ঘরে প্রবেশ করিয়ে প্রণয়িনীর মনোভাব জানতে চায়। প্রণয়িনী হলে তলোয়ারের মাথা দেখলেই দরজা খুলে দেয়। নোংরা মানুষের এই ছিল প্রথা। রাজকুমারী তলোয়ারের মাথা দেখে চমকে উঠল। বুঝল কেউ শয়তানি করতে এসেছে। হাতের পাশেই ছিল বর্শা। তলোয়ার লক্ষ্য করে বর্শা ছুড়ে মারল রাজকুমারী।

তারপর! মানুষের আর্ত চীৎকার!

চেনা চেনা গলা। তাই তো, ও তো খাম্বার কণ্ঠস্বর। তাকেই তো ডাকছে খাম্বা। থইবী দরজা খুলে প্রদীপ হাতে ছুটে বেরিয়ে এল। রক্তের শয্যায় তখন খাম্বা শেষ নিদ্রার অপেক্ষায় রয়েছে।

যা সর্বনাশ হবার তা হয়েই গেছে। থইবীর বর্শা খাম্বার বুক ভেদ করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

খাম্বা আকুল কণ্ঠে বলল, রাজার মেয়ে! আমার ভুলেই তোমার সর্বনাশ!

থইবী লুটিয়ে পড়ল খাম্বার বুকে।

সকালবেলায় রাজবাড়িতে খবর গেল। ছুটে এল রাজা-রানী। ততক্ষণ খাম্বার দেহ সাজান হয়ে গেছে, চিতাও সাজান হয়ে গেছে। সুগন্ধি কাঠে থইবী সহমরণের জন্য তৈরী হয়েছে।

রাজা থইবীকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরল।

অনুনয়-বিনয়, অনুরোধ-উপরোধ সব উপেক্ষা করে থইবী উঠে বসল খাম্বার চিতায়। ভুলের মাশুল সমানে দুজনে দিল, অক্ষয় অমর হয়ে রইল তাদের প্রেম।

আজও মণিপুরী নারীর আদর্শ হয়ে রয়েছে থইবী, পুরুষদের বীরত্বের সাথে জড়িয়ে রয়েছে খাম্বার কাহিনী।

রাজকুমারী মিলিয়ে গেল, স্বামীর সাথে স্বামীসোহাগীর বিয়োগান্ত পরিণতি ঘটল।

এই সেই লোগতাক। এরই জল রাজকুমারীর অনিন্দ্য চরণাঘাতে একদিন ছলছলিয়ে উঠত, এরই তীরভূমি খাম্বার বাঁশীর সুরে মুখরিত হত, এরই সোপান ধ্বনিত হত রাজকন্যার নূপুর বাদনে। এই সেই লোগতাক।

গল্প শেষ হতেই এরামা বলল, রাজকুমার, এদেশের সব কাহিনীই রাজা-বাদশা নিয়ে। মানুষের মন সম্পদের পশ্চাৎগামী। দরিদ্রও স্বর্ণ-সৌধের স্বপ্ন দেখে, তাই রাজকুমারীর এই বিয়ের মাঝেও রয়ে গেছে সেই মনের পরিচয়। ধনবাদী সুপ্ত মন মানবপ্রেমের কাহিনীর চেয়ে রাখাল ছেলের রাজার মেয়ের সাথে বিয়ে হবার উদ্ভট কল্পনাকে বেশী ভালবাসে। এরকম ঘটনা সবার ঘরেই ঘটতে পারে, অসাম্য নিয়ে এই কাহিনীতে তাই এত উত্তেজনা বোধ করে এদেশের মানুষ।

বাধা দিয়ে বললাম, এসব কূটযুক্তি দিয়ে ভালবাসা আর আত্মত্যাগ বিচার করলে মানুষের স্নেহশীল মনকে অবমাননা করা হয়। অসাম্য মানুষের মনুষ্যবৃত্তিকে হত্যা করে না, হয়ত মনুষ্যবৃত্তিকে অস্বীকার করবার পথ তাতে খোলা থাকে। তাই প্রেম ও ত্যাগকে ছোট করে দেখলে অন্যায় হবে।

এরামা ক্ষুণ্ণ হল। রাজকুমার কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। আমি বললাম, চল, তার চেয়ে আমরাও লোগতাকের জলে নেয়ে ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে আসি। বাস ছাড়বে সেই তো বেলা চারটে। ততক্ষণ আমরা স্নান-খাওয়া শেষ করে নিতে পারব।

লোগতাকের হিমকণা-সদৃশ জলে অবগাহন-স্নান করে আবার সেই বুড়ো বটতলায় বসলাম। রাজকুমার সর্বাগ্রে রোদ পোহাতে বসেছে। এরামার স্নান তখনো শেষ হয়নি। আমিও রোদে পিঠ দিয়ে বসলাম।

রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি গরীবের দুঃখে ভেপসে ওঠ, আবার রাজা-বাদশাদের কাহিনী বলতে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠ, তোমার কোনটা সত্যকার মানসিক ধর্ম।

রাজকুমার হেসে বলল, দুটোই। তোমার আছে, তাই তুমি গরীবকে দান কর। যার নাই, সে দান করতে পারে না, অনুভূতি তার থাকে। আবার, দান করাটাও বৈষম্যের লক্ষণ। দানের ধর্ম দেওয়া নয়, দেবার গৌরব বোধ করা। যা তোমার সঞ্চয়, সে তোমার কষ্টার্জিত, যে কষ্ট করে সে নিজের স্বার্থেই করে, সে স্বার্থ দেবার না নেবার সেটা দাতাই ভাল বলতে পারে। গরীবকে দুঃখের মাঝে যারা ঠেলে দেয়, তারাই যখন দুঃখ লাঘবের উদ্দেশ্যে দান করে, সে দানে কোনো মহৎ বৃত্তি থাকে না, থাকে শুধু নিজের গৌরব জাহির করবার অবচেতন মনের ইচ্ছা আর ক্রূর অহমিকা জ্ঞান। রাজা-বাদশা ওরাই তো আমাদের দেশের ঐতিহ্য। আজ আমরা ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাস লিখতে বসে রাজা-বাদশাহের অতি সামান্য ঘটনাকে বড় করে দেখাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু সাধারণ মানুষ কবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল সে কথা আছে কি কোথাও। নেই বলেই আমাদের ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি সবের উপরই রাজা-বাদশার ছাপ দেওয়া রয়েছে। সে ছাপ মুছে ফেলতে পারিনি, হয়ত আগামী একশ বছরে তা সম্ভব হবে না। রাজা-

বাদশার ট্রেডমার্ক ছাড়া ভারতীয় জীবন আর সভ্যতাকে কল্পনা করা যায় না।

রাজকুমারেব কথা মনোযোগ সহকারে শুনছিলাম। এমন সময় এরামা স্নান করে ফিরে আসছিল। যেমনটা তাকে দেখেছিলাম সেমা নাগাদের গাঁয়ে তেমনি তাকে দেখতে পেলাম লোগতাকের তীরে। আলুলায়িত কেশদাম পিঠের উপর লুটিয়ে পড়েছে, তেমনি নাগা চাদর দিয়ে গাউন ঢেকে সে হাসতে হাসতে উঠে এসে দাঁড়াল।

তাহলে এবার ফিরে চল।

আমি তো প্রস্তুত, তোমরা কিছু খাবে না? না খেয়েই রওনা হতে চাও না কি? খাবার আছে আমার সাথে।

সেই মা ও গৃহিণীর মূর্তি।

বললাম, বেশ, তোমার ভাণ্ডার উজাড় করে দাও।

লোগতাক থেকে ইম্ফলে ফিরে এসে সোজা শুয়ে পড়লাম।

সারা পথ বাসের ঝাঁকুনিতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম। ভাবছিলাম, কখন হবে যাত্রা শেষ। যখন যাত্রা শেষ হল তখন দেহের অবস্থাও শেষ হবার মতো। তাই শয্যা আশ্রয় ভিন্ন উপায় ছিল না।

এরামা ফিরে গেছে। তার ইচ্ছে ছিল আমার হোটেলে বসে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করবে। নেহাত ক্লান্ত দেখেই এরামা ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

শুয়ে শুয়ে সারা দিনের সব ঘটনাগুলো ভাবছিলাম। কড়ানাড়ার শব্দে উঠতে হল। সামনে দাঁড়িয়ে হোটেলের মালিক।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি দরকার শর্মাজি।

হোটেলের খাতাখানা এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনার পরিচয় লিখে দিন।

লিখে দিলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, আর কিছু?

কিছু টাকা।

অগ্রিম ?

আমতা আমতা করে শর্মাজি বলল, সে টাকা নয় বাবুজি, আমার বিশেষ দরকার তাই, কাল পরশু ফেরত দেব।

কিন্তু আমার কাছে বেশী টাকা নেই, কালকে যদি টাকা না আসে তাহলে নিজের খরচই চলবে না। বুঝলেন।

শর্মাজি মনক্ষুণ্ণ হয়ে বেরিয়ে গেল। তার চলে যাবার পথের দিকে চেয়ে থেকে কেন-বা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। ডাকলাম, শর্মাজি।

শর্মাজি ফিরে এসে দাঁড়াল।

টাকার কি খুবই দরকার ? কত কম টাকা দিলে কাজ চলে ?

বেশী নয় বাবুজি, তিরিশটা টাকা।

সাঁইত্রিশ টাকা আমার সম্বল, তা থেকে অনিচ্ছার সাথে তিরিশটা টাকা দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলাম, এত কি দরকার ? আপনার ছ জনের হোটেল, সে হোটেলের বাজার করতে কত টাকাই বা দরকার।

শর্মাজি কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। ঢোক গিলে বলল, একটা ঘরোয়া বিষয়ে আটকে পড়েছি।

পারিবারিক বিষয়ে আমার কোনো আগ্রহই নেই, তাই তার হাতে টাকা ক'টা দিয়ে ভাল হয়ে শুয়ে পড়লাম। শর্মাজিও টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

হোটেল বললে যা বুঝায় শর্মাজির হোটেল তা নয়। চারখানা ঘরে ছ জনের শোবার স্থান। পাচক ও মালিক শর্মাজি স্বয়ং। একজন কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড রয়েছে তার সাথে। তাকে নিয়েই কাজকর্ম চালিয়ে নেয়। স্থানীয় খরিদ্দার একজনও নেই। দূরদূরান্ত থেকে আসে ক্যানভাসার আর ভ্রমণকারী। তাদের জন্যই হোটেল চলে, বিশেষ করে শীতকালটা ভালভাবেই চলে।

* * *

রাতের খাবার নিয়ে এসে শর্মাজি দাঁড়াল। টেবিলের উপর থালাখানা রেখে অতি বিনয়ের সাথে আমার বিছানার কোণায় টাকা ক'টা রেখে দিয়ে বলল, টাকা লাগল না বাবুজি।

শর্মাজির কণ্ঠস্বর অতি করুণ, কাঁদ-কাঁদভাবে কথা ক'টা বলেই সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

জিজ্ঞাসা করলাম, টাকার ডবল পরমায়ু, না আপনার ডবল পরমায়ু?

আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সে কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল।

অমনভাবে দাঁড়িয়েঁ রইলেন কেন শর্মাজি! বসুন।

না বাবু, বসব না।

মানুষের ভাবাবেগ রুদ্ধ হৃদয়ের দুয়ার খুলে দেয়, ভাবাবেগের আতিশয্যে শর্মাজির মনের কথা সেই খোলা দরজার মাঝ দিয়ে পিপীলিকার সারির মতো আপনা থেকেই লাইন বেঁধে বেরিয়ে এল।

শর্মাজি মণিপুরী ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ সমাজপতি গোষ্ঠীর একজন। শর্মাজি যখন বলল, তার স্ত্রীর অপর একজনের সাথে আজ রাতেই বিয়ে হবে, তখন বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। শর্মাজির কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না। স্পষ্ট করে কিছু বলতেও সে রাজী নয়, অথচ বলবার ইচ্ছেও কম নয়। অবশেষে আকারে-ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল, তার সাথে বিচ্ছেদ ঘটেছে অনেক কাল আগে।

বিবাহ-বিচ্ছেদ শমাজির ইচ্ছায় হয়নি, বিচ্ছেদ তার স্ত্রীই ঘটিয়েছে।

আজ বিচ্ছেদের চরম পরিণতি।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ চলে?

চলে বাবুজি। মেয়েরা যদি ঘর করতে না চায়, ভাত না খায়, তাকে আটকে রাখবার মতো আইন এদেশে নেই। এদেশের মেয়েরা স্বাধীন, স্বাধীন না হয়ে যায় কোথায়। এক সময় দেশের পুরুষরা শুধু ব্যস্ত থাকত লড়াই, মারামারি, কাটাকাটি নিয়ে। সে সময় মেয়েরা ঘর সামলাত। তারা চাষ করত, চাষের জন্য বেচাকেনা করত,

পরিধেয় প্রস্তুত করত, অর্থ সংগ্রহ করত, স্বামীকে ঘরের চিন্তা করতে না দিয়ে দেশের চিন্তা করবার অবসর দিত। সেই থেকে আর্থিক বিষয়ে মেয়েদের স্বাধীনতা জন্মাল, তারা সমানে পুরুষের সাথে তাল রেখে সমাজে চলতে লাগল। আসল স্বাধীনতা বাঁধা রয়েছে টাকায়, টাকা উপার্জন করতে তারা জানে, তাই মণিপুরী মেয়েরা স্বাধীনতাকে পুরোপুরি ভোগ করতেও জানে।

তাই বলে স্বামীকে ছেড়ে যেতে হবে ?

সেটা তো মনের মিলের উপর নির্ভর করে। মনের মিল না হলেই বিচ্ছেদ সম্ভব।

হিন্দু আইনে, অন্তত ব্রাহ্মণদের এমন ব্যবস্থা তো নেই, তবে ভবিষ্যতে হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

আমাদের দেশে আছে বাবুজি। আইন নয়, রীতি। চলে আসছে বহুকাল থেকে। মেনে নিয়েছে অনেকেই। যারা যোদ্ধা জাত তাদের দেশে বিধবা-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ যদি না থাকে তাহলে সমাজে ব্যভিচার চলবে যে বাবুজি, সন্তান পিতৃ-পরিচয়হীন হবে। মণিপুরের লোক চিরকাল লড়াই করে এসেছে, তাই এ দুটো বিধি দেশাচার-রূপেই গ্রহণ করা হয়েছে।

সমাজ-রক্ষার এই সহজ নীতি বুঝতে কষ্ট হল না। কিন্তু শর্মাজিকে বুঝতে কষ্ট অনুভব করছিলাম। একটু ঠাট্টার সুরে বললাম, তা না হয় স্বীকার করলাম, কিন্তু শর্মাজি আপনি তো কোনো কালেই লড়াইয়ে যাননি, বর্তমানে লড়াই মণিপুরে তো আর হচ্ছে না, অথচ আপনার এ পরাভোগ কেন ?

আমারই দোষ বাবুজি, বউ থাকত দেশে মায়ের কাছে। ন মাস ছ মাসে ঘরে যেতাম, উপায় যা করতাম তার এক পয়সাও কাউকে দিতাম না, রেসের মাঠে সব পয়সা দিয়ে আসতাম চিরকালই। তারই ফল ভুগছি। বলেই কেমন আতঙ্কিতভাবে শর্মাজি নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সমাধা করছিলাম। শর্মাজিও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার পর আবার বলল,

কথা ছিল আজকে যদি তাদের চারশ টাকা খেসারত দিতে পারি, তাহলে বিয়ে বন্ধ থাকবে, আর বিবাহ-বিচ্ছেদ নাকচ করা হবে। চারশ টাকা সংগ্রহ করতে পারলাম না বাবুজি। দশ পনর বিশ করতে করতে দুশ পর্যন্ত জুটল, আর জুটল না। যে লোকটি টাকা দিতে চেয়েছিল সে এল না। শুনলাম সেই না কি এ বিয়ের বর।

শর্মাজি থেমে গেল। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে ভাবছিলাম শর্মাজি সত্যি কথা বলছে কি না! বিচ্ছেদ হয়ত অসঙ্গত নয়, কিন্তু যে টাকা দিতে চেয়ে টাকা দিল না, অথচ স্বয়ং বর সেজে পিঁড়িতে বসল সে কেমন ব্যক্তি।

শর্মাজির কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড এসে শর্মাজিকে ডেকে নিয়ে গেল। আমিও কেমন একটা গুমোট আবহাওয়া থেকে নিষ্কৃতি পেলাম।

সকালে এরামা অসতেই শর্মাজির কথা বললাম।

এরামা খুশীতে ভেঙে পড়ল।

এতে খুশী হবার কি আছে ?

এই তো যোগ্য কাজ। তোমাদের অত্যাচার সইতে সইতে আমাদের পিঠে ঘা হবে, মনে ক্ষত হবে, তার প্রতিদান তোমরা নেবে না ?

বাধা দিয়ে বললাম, প্রতিদান দেবার সামর্থ্য তোমাদের থাকলেও পথ দেখিয়েছে পুরুষ। সভ্য মানুষ স্বীকার করে নারী-পুরুষে সমান অধিকার, সেই স্বীকৃতিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য পুরুষরাই নানাদেশে বিধান দিয়ে এসেছে বিবাহ-বিচ্ছেদের।

দেয়নি, আদায় করতে হয়েছে।

ঠিক তা নয়, যুক্তি দিয়ে এর সমাধান সম্ভব নয়। পুরুষ-প্রাধান্য এবং নারী-প্রাধান্যের দর কষাকষির কোনো মূল্য নেই। সে যাই বল, একই কথা।

আমরা অসভ্য, জংলী, কিন্তু আমাদের সমাজে নারীর স্থান অতি উচ্চে। আমাদের নয়, মঙ্গোলীয় রাজ্যে যাদের জন্ম তারা নারীকে শ্রদ্ধা করবার শিক্ষা জন্ম থেকেই পেয়ে থাকে। শুনেছি, একমাত্র

চীন দেশে নারীকে পণ্য বলে মনে করত। আজ সে চিন্তাধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটছে। তোমরা যারা অতি-সভ্য, অতি-মানবের দল, তারাই নিজেদের মা-বোনকে শ্রদ্ধা করতে শেখনি। তোমাদের শ্রদ্ধা কাগজ-কলমে, কাজে-কর্মে নয়। এই কাগুজে শ্রদ্ধার চেয়ে অশ্রদ্ধা বেশী প্রীতিপ্রদ।

সে যা হোক, শর্মাজির স্বপক্ষেও তো বলবার রয়েছে।

থাক, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই, তোমার টাকা আসবার কথা, চল পোস্টঅফিসে একটু খোঁজ নিয়ে আসি।

হোটেলের পেছনে কাঠের সেতু, সেই সেতু পেরিয়ে মাঠের পথ ধরে ডাকঘরে এলাম। ক'দিনেই রাস্তাটা বেশী পরিচিত হয়ে গেছে। বাঁ পাশে চিফ কমিশনারের বাংলো, ডানে বিরাট সহশিক্ষার বিদ্যালয়, এগুলো পেরিয়ে এলেই ডাকঘর।

টাকা এসেছে সংবাদ পেলাম। কিন্তু টাকা দেবার কেরানীবাবু তখনো আসেননি। অগত্যা দুজনে এসে রাস্তার ধারে একটি দেবদারু গাছের তলায় দাঁড়ালাম।

সামনে পুরাতন রাজবাটির অবশিষ্টাংশ মাটির দেওয়ালের আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাটির দেওয়াল বেষ্টন করে কালো চওড়া পিচের রাস্তা, সকালের হাড়কাঁপান শীতে দেবদারু তলায় রোদ পোহাবার ভিড়। যেন কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে, বোধ হয় স্থান মাহাত্ম্যে। দেবদারু তলায় চায়ের দোকান, উনুনের মিঠে উষ্ণতা, গরম চায়ের ছিটে ফোঁটা এবং অকৃপণ প্রকৃতির দান সকালের রোদ, সব ক'টি একই স্থানে পাওয়া যায় বলেই বোধ হয় দেবদারু তলায় ভিড়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খবর সংগ্রহ করলাম যে কেরানীবাবু এসেছেন। এলেই তো সমস্যা সমাধান হয় না। কেরানীবাবু বললেন, টাকা দিতে পারব না। তোমার সেনাক্তিপত্র নেই।

আমি আন্তর্জাতিক পাসপোর্টখানা তার সামনে রেখে বললাম, এর চেয়ে বড় সেনাক্তি কিছু আছে কি ?

অনেক ক্ষণ পাতা উলটে উলটে দেখে বলল, ডাকঘর তার নিজস্ব সেনাক্তি ভিন্ন অন্য সেনাক্তি স্বীকার করে না।

কেরানীবাবুর দম্ভ অসহ্য মনে হল। কিন্তু বলবার মতো সুযোগও কিছু নেই। আশ্চর্য হয়ে বললাম, পাসপোর্ট, তাও ইণ্টারন্যাশনাল, সেটা যদি সেনাক্তি না হয় তাহলে আর কি সেনাক্তি হতে পারে!

জানি না, ঐ পোস্টমাস্টারের কাছে যান।

ভাগ্যক্রমে পোস্টমাস্টার শ্রীহট্টের লোক, তিনি কেরানীবাবুকে অনেক বুঝিয়ে টাকা দেওয়ালেন।

এতক্ষণ এরামা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। বোধ হয় আমার দুর্দশা দেখবার লোভ সে সামলাতে পারেনি, তাই আমাকে কোনো রকম সহায়তাই করেনি। টাকা পাবার পর বলল, তাহলে টাকা পেলে!

আমার টাকা আমি পাব না কেন?

কেন তা তো উপলব্ধি করলে। এটা রাজা-বাদশার দেশ, তা তো আগেই বলে রেখেছি। এখানে সবই বিচিত্র।

তুমি চুপ করে দাঁড়িয়েছিলে কেন?

এরামা কোনো উত্তর দিল না।

উত্তর পেয়েছিলাম যেদিন সত্যি সত্যি এরামাকে ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল। পথের বন্ধু পথেই পরিচিতির শেষ। অন্তর্বর্তী-কালীন অবসরটুকু শুধু স্বপ্নের মতো মধুময় হয়ে থাক, এই ছিল কামনা। সেই কারণেই এরামাকে জোর দিয়ে কোনো কথা বলিনি। আমি না বললেও এরামা বলেছিল, যাচ্ছ যাও।

হাসলাম।

হাসলে কেন?

সবাই যাত্রী, সেই যাত্রাপথে যাও না বললেও যেতে হয়, সেইটে জেনেও তুমি বলছ, আচ্ছা যাও।

যাও বলার অর্থ যাওয়া নয়, যাও বলার অর্থ যেতে না-দেবার পথ-রোধ করার অক্ষমতা।

এও পুরান সত্য।

সেই সত্যকে উপেক্ষা করবার কত না ছলচাতুরী মানুষ করে থাকে।

তাই নিয়েই তো পৃথিবী।

তবুও কেউ যাত্রারোধ করতে পারে না, আমিও পারিনি। পারবার চেষ্টা না করেছি এমন নয়। মনে আছে ইম্ফল ডাকঘরের কথা? আমি সর্বান্তঃকরণে চেয়েছিলাম তুমি টাকা না পাও। না পেলে আরও ক'দিন থেকে যেতে, নয় কি?

থাকতাম, কিন্তু লাভ কি হত!

আমাদের পূর্বপুরুষদের একটা উপকথা আছে। সেইটে শুনে যাও, তাহলে বুঝবে লাভ কি হত।

নাগাদের এক রাজা ছিল। রাজার এক শত ছেলে। ছেলেরা বড় বীর, রাজাও ধনেজনে জনপদে খুব নামজাদা।

আমরা উপদেবতাকে বিশেষ ভয় করি। উপদেবতাকে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি মৃত্যুর পর আত্মা অতৃপ্ত হয়ে আমাদের আশে-পাশেই থেকে যায়।

রাজার মা ছিলেন খুব বড় সিদ্ধকরী, খুব বড় বৈদ্য। উপদেবতার সাথে সে কথা বলত, ধরতে গেলে ঘরকন্না করত। সেই বুড়ী মারা গেল।

মারা যাবার ক'দিন পরে রাজা স্বপ্ন দেখল তার মা তাকে মা হতে বলছে। রাজা তো ভয়ে ঘেমে উঠল। সে পুরুষ মানুষ, মা হবে কি করে!

মাকে অনেক বুঝিয়ে বলল। মা শুনতেই চায় না। শেষে বুড়ী রেগে বলল, কাল সকালেই তুই মেয়েমানুষ হবি।

সকালে রাজা ঘুম ভেঙে দেখে সে মেয়েমানুষ হয়ে গেছে।

লজ্জায় ঘেন্নায় রাজা দেশ ছেড়ে চলে গেল।

পাশের দেশের রাজা শিকারে বেরিয়েছে। সুন্দরী তরুণী দেখে সে তাকে নিয়ে গেল তার প্রাসাদে। সেখানে তাকে আটকে রাখল। দিনক্ষণ দেখে তাকে বিয়ে করল।

মেয়ে-রাজার এক শত ছেলে হল।

রাজা এখন রানী হয়েছে। ওদিকে তার নিজের রাজ্যে কোনো রাজা নেই, তার ছেলেরা রাজ্য শাসন করছে। এদিকে নতুন দেশের রাজা মারা গেল। রাজা বিধবা হল। দু দেশেই তখন রাজা নেই।

এবার দু দেশের রাজপুত্ররা লড়াই আরম্ভ করল। যুদ্ধ প্রচণ্ড হচ্ছিল। একবার এরা জেতে একবার ওরা জেতে। খবর গিয়ে পৌঁছায় রাজার কানে। তারই দুইশত সন্তান হানাহানি করবে, তা সে সহ্য করতে পারছিল না। মনের দুঃখে রাজা শয্যাশায়িনী হল।

এমন সময় স্বপ্নে আবার তার মা দেখা দিল।

প্রেতাত্মা হাসতে হাসতে বলল, আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

রাজা জিজ্ঞাসা করল, কি উদ্দেশ্য ?

তুই কার মঙ্গল চাস ? রাজার ছেলের না রানীর ছেলের ?

রানীর ছেলের।

তাহলে জন্মজন্মান্তরে মা হয়ে জন্মাস। মা না হলে সন্তানদের উপর কতটা দরদ তা বোঝা যায় না, বলেই প্রেতাত্মা মিলিয়ে গেল।

রাজা তথাস্তু বলে গভীর নিদ্রায় ডুবে গেল।

সকালবেলায় রাজার ঘুম ভাঙতেই দেখল আবার সে আগের মতোই পুরুষ হয়ে গেছে।

ঢাল তলোয়ার নিয়ে ছুটল ছেলেদের বিরোধ মেটাতে।

বিরোধ মিটল, মীমাংসায় লাভবান হল রানীর ছেলেরা।

এরামা গল্প শেষ করে হাসল।

তুমি যে কি বলতে চাও তা বুঝলাম না।

ঐ রাজা কিছুদিন রানী হয়েছিল, তাই মেয়েদের যে কি মনের অবস্থা তা সে বুঝেছিল, তেমনি তুমি যদি মেয়ে হতে তাহলে আমার মনের কথা বুঝতে, বুঝতে পারতে আমার কি লাভ হত।

নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম তার মুখের দিকে।

এরামা ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

নাগা মহিলা এরামা, তাকে বুঝতে পারিনি একথা সত্যি নয়। বুঝেও অবুঝের মতো ছিলাম। সীমানা-আঁকা জীবনে এরামাকে মনে রাখারও আমার কোনো অধিকার নেই, বুঝতে যাওয়া বাতুলতামাত্র। বুঝবার মাসুল দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

* * *

পরের দিন রাজকুমারের সাথে নিজের কাজগুলো শেষ করে দুপুরে বেরিয়ে পড়লাম কাঞ্চিপুরের পথে। বাংলো থেকে এরামাকে ডেকে নিলাম।

ইম্ফল নদীর উপর ঝোলান সাঁকো পার হয়ে নদীর কিনার বেয়ে বেয়ে এগিয়ে চলেছি। শহরের শেষ সীমানায় বাঁশের ঝোপ, তারই পাশে শ্মশান।

সেই শ্মশানের ধারে দাঁড়িয়ে রাজকুমার বলল, ঐ যে ঘেরা জায়গা দেখছ, ঐটে রাজাপরিবারের দাহস্থান।

মুখ ঘুরিয়ে একবার দেখে নিয়ে আবার এগোতে লাগলাম। আমার ইচ্ছে হয়েছিল একবার জিজ্ঞাসা করি, মৃত্যুর পরও শ্রেণী-বিভাগ তাহলে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করিনি, কেননা রাজা-বাদশাদের ঘরোয়া ব্যাপার, মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এ যুগের বুকের উপর চাপিয়ে দিয়ে ওরা নিশ্চিন্তে দিনাতিপাত করছে; করুক, আমার তাতে কি এসে যায়।

সামনে চাঁদোয়া খাটিয়ে একজনকে দাহ করা হচ্ছিল। চিতার ধূমের সাথে সাথে খোল-করতালের ধ্বনি আর হরি-সংকীর্তন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম, চিতার ওপর চাঁদোয়া কেন?

রাজকুমার হাসল, বলল, এই দেশের এইটেই রীতি।

স্নেহপ্রীতির পাত্রকে মানুষ কত যত্ন করে তারই চিহ্ন।

এরামা বলল, মানুষ শেষের দিনেও পার্থিব জগতের আদর না কুড়িয়ে যেতে চায় না।

সারা জীবন ঘাত-সংঘাতে ক্ষত-বিক্ষত মানুষ শেষের দিনে একটু নিশ্চিন্তে শেষ স্নেহের দান না নিয়ে যাবে কেন! চিতার আগুনে যার দেহ জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে তাকেও রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে মানুষ চাঁদোয়া খাটায়। আপন জনকে আপন করে এমনিভাবেই মানুষ চিরকাল ভেবে এসেছে। আপন জনকে ছাড়তে তার কত না কষ্ট, কত না হৃদয়ের ব্যথা।

এরামা কোনো জবাব দিল না, জবাব দিল রাজকুমার। সে বলল, এই তো দুদিনের সংসার, এই সংসারের শেষ মধুটুকু লেহন না করে মানুষ যেতে চায় না।

ক্রমে শহরের সীমানা দূরে সরে গেল, আমরা নদীর কিনারা ছেড়ে মাঠের পথ ধরলাম। শান্ত পরিবেশ, স্বল্পতোয়া নদী-তীরে বাঁশের বন, সামনে খোলা মাঠ, কাটা ধানগাছের মূলের গোছা পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করে আকাশের দিকে শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফাল্গুনী বাতাস মাঝে মাঝে বাঁশবনের মাথায় আঘাত দিয়ে শনশনানি সৃষ্টি করছে। নিস্তব্ধ প্রান্তর, মাঠ জনসমাগমহীন, শুধু ভেসে আসছে খোলের শব্দ, হরি-সংকীর্তনের আওয়াজ। নীরবে তিন'জনে মাঠের আল ধরে এগিয়ে চলছি।

সামনে কাঞ্চিপুর, ডানপাশে গম্ভীরসিংহের দুর্গ। কাঞ্চিপুরের সামনে কঙ্করময় বিরাট প্রান্তর, দূরে পাহাড়ের মাথায় শ্যাম বনানী। পিচের রাস্তা ইম্ফল থেকে বর্মার দিকে এগিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে দু-একখানা বাস পেরিয়ে যাচ্ছে, দু-একজন সাইকেল আরোহীও দেখা যাচ্ছে, পদব্রজী পথিক-সংখ্যা বিরল। ধু-ধু করছে এবড়োখেবড়ো মাঠ। কাঞ্চিপুর দাঁড়িয়ে রয়েছে তারই মাঝে। আমবাগানের শীতল ছায়ায় ছোট একটি পুকুরের চারপাশে গড়ে উঠছে শিক্ষা-নিকেতন।

কাঞ্চিপুরে এসে পেলাম ক'খানা মাত্র টিনের ঘর। অধিবাসীমাত্র দু ঘর। সামনে পুকুর, পুকুরের ধারে আমের বাগান, সেই বাগানে আমগাছের ছায়ায় বিছানা পেতে অধিবাসীরা নিশ্চিন্তে দিবা-নিদ্রামগ্ন। ডেকে তুলতে হল। তারা অখুশী হয়ে সামনের পুকুরের বাঁধান ঘাটে এসে আমাদের সাথে বসল।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তর একটারও সঠিক পেয়েছি বলে মনে হয় না।

মোটামুটি বুঝলাম, কোনো সহৃদয় ভদ্রলোক শান্তিনিকেতনের আদর্শে এই আশ্রম গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। পয়সা ও সহযোগিতার অভাবে তাঁর আশা মোটেই পূরণ হয়নি। অসমাপ্ত রয়ে গেছে প্রতিষ্ঠাতার ইচ্ছা, বঞ্চিত হয়েছে কৃষ্টির উত্তরাধিকারীর দল।

পাশাপাশি ক'খানা টিনের ঘর। অল্প কয়েকটি তাঁত বসান হয়েছে। একটা বিদ্যালয় ভবনও তৈরী হয়েছে, কিন্তু কাজ আরম্ভ হতে অনেক দেরি।

রাস্তার সামনে কাঠের ফলকে কাঞ্চিপুর লেখা না থাকলে কেউ এই বিশাল প্রান্তরের মাঝখানটায় চারখানা টিনের ঘরকে কাঞ্চিপুর বলে মনেই করতে পারত না। দাক্ষিণাত্যের স্বপ্নভরা কাঞ্চিপুরের নামকে ব্যঙ্গ করতে এই অপপ্রয়াস কি না, তা কে বলতে পারে!

কাঞ্চিপুর ছেড়ে পিচের রাস্তা ধরলাম।

দুপুরের রোদে শরীর যেন পুড়ে যাচ্ছিল। মাঠের ধারে মণিপুরী রমণীরা আখের ক্ষেতে আখ কাটছিল। তাদের কাছ থেকে ক'খানা আখ কিনে চিবোতে চিবোতে এগিয়ে চলেছি। ধীরে ধীরে শহর এলাকার কাছে এসে গেলাম।

সামনেই হাটতলা। হাট বসেছে। ক'জন নাগা পুরুষ আর নারী কলসী নিয়ে হাটের শেষ কোণায় বসেছিল।

এরামাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কি করছে?

তাড়ি বিক্রি করছে। মণিপুরের নাগারা সভ্য হয়েছে, তাদের বৃত্তি রয়েছে, তাদের ঘর আছে, সংসার আছে, নেই শুধু সভ্যতা বজায় রাখবার সামর্থ্য। তাই তাদের বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছে সমাজের সব চেয়ে নিম্নস্তরের, তাদের ঘর তাদের সংসার রক্ষা করবার তাগিদে বৃত্তি খুঁজবার অবসর পায়নি।

রাজকুমার এরামাকে বাধা দিতে গিয়ে তার ধমক খেয়ে থেমে গেল, সে বলল, তুমি থাম রাজকুমার। পিতৃপুরুষদের ঐতিহ্যের সাথে সমাজব্যবস্থা রক্ষার কিছু তোমরা করতে পারনি। কিন্তু এরাই তোমাদের আদিপুরুষ, এরাই তোমাদের সভ্য হবার পথে এগিয়ে দিয়েছে অর্থ আর সামর্থ্য দিয়ে। মানুষকে যারা বাঁচবার মতো বৃত্তি দিতে নারাজ তারাই বেশী নীতিবাক্য শোনায়।

আসবসেবন সমাজের ব্যাধি। ব্যাধি দূর করবার পন্থা রাষ্ট্রনায়ক-দের অজ্ঞাত নয়, কিন্তু সে ব্যাধি দূর করবার মতো সদিচ্ছা কারুরই

নেই। আসবসেবী যত অর্থ রাজকোষে সংগ্রহ করে দেয়, তা দিয়ে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের সারা বছরের তংখা আর ভাতা সঙ্কুলান হয়েও বেঁচে যায়। বিলাসের ব্যয় বিলাসীরা বহন করবে বইকি। বিলাসী দরিদ্র হতে পারে, দরিদ্রের বিলাস-ব্যসন অপরাধ, সেই অপরাধের দণ্ড তারা দিয়ে থাকে। নইলে সমতাহীন সমাজের বনিয়াদ ধসে পড়ত অনেক আগেই।

রাজকুমার আমার মতোই এই ব্যাধি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। সেজন্য এরামার কটূক্তি হজম করে চলতে থাকে।

পাহাড়কে দু ভাগ করে কালো রাস্তাটা তীরের মতো ছুটে গেছে, তারই পাশে হাট বসেছে। এসে বসলাম হাটের শেষ প্রান্তের মণিপুরী হোটেলে।

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কণ্ঠাগত প্রাণ, কিছু আহার্য গ্রহণ অবিলম্বে প্রয়োজন।

আহার্য এল খিচুড়ি আর ক্ষীর।

হলুদ নুন আর লঙ্কা দিয়ে চাল সেদ্ধ করে যে অপূর্ব পদার্থ বা মণ্ড তৈরী হয়েছে তারই নাম খিচুড়ি। ক্ষীর নামক পদার্থ দুগ্ধ নামক জলীয় বস্তুর রঙ গায়ে মেখে মোটা মোটা অর্ধসিদ্ধ তণ্ডুল বক্ষে ধারণ করে সম্মুখে উপস্থিত। প্রয়োজনমতো চিনি বা লবণ তাতে সংযোগ রুচিকর। উদর যদি.অনুদার না হয় তাহলে ও সহজপাচ্য নয়।

রাজকুমার আর কিছু দেবার অনুরোধ জানাল। অনুরোধের বিনিময়ে পেলাম মাছ ও তরকারি দিয়ে প্রস্তুত অপূর্ব ব্যঞ্জন।

রাজকুমার পরিতৃপ্তির সাথে খেয়ে চলেছে। আমি আর এরামা কোনো রকমে গলাধঃকরণ করছিলাম।

আহার্য যাই হোক না কেন, মূল্য তার কম নয়। নগদ দুই টাকা ছয় আনা মূল্য দিয়ে বৈষ্ণবোচিত আহার সমাধা হল।

আবার পথ চলা শুরু হল।

পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরী হয়েছে। পাহাড়ের মাথায় এক সময় ফৌজী ঘাঁটি ছিল। শত্রুকে রুখবার শেষ দুর্ভেদ্য সংগঠন। এখান থেকেই শহর ইম্ফলের আরম্ভ। শহরে পা দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

অনেক কিছু দেখা বাকি রেখে মণিপুর ছাড়তে হল।

যাবার আগের দিন চূড়াচাঁদ কলেজের মাঠে বসেছিলাম। এরামাকে কেমন ক্লান্ত আর ম্লান মনে হচ্ছিল।

এরামা জিজ্ঞাসা করল, এবার কোথায় যাবে?

সোজা শিলচর, সেখান থেকে দেশে।

শিলং যাবে না আর?

শিলং! যৌবনের দুঃখব্যাপ্ত দিনগুলো ঐ পাহাড়ের কন্দরেই কেটে গেছে। তাই শিলংকে ভালবাসতে পারিনি। এখনো মাঝে মাঝে সেখানে যাই কিন্তু অতীতের বেদনাদায়ক দিনগুলো যখন মনে পড়ে তখন শিলং ছেড়ে আসতে আকুলি ব্যাকুলি সৃষ্টি হয়, বুঝলে। তাই শিলংএ সহজ মন নিয়ে যেতে পারি না বলেই এখন আর যাবার ইচ্ছে নেই।

এরামা ক্ষুণ্ণ হলেও আমার পক্ষে ফিরতি পথে শিলং যাওয়া অসম্ভব।

বললাম, শিলং তোমার তীর্থক্ষেত্র, সেখানে তোমার পথ চেয়ে রইবার লোক রয়েছে, তোমার কর্মের ভাগীদার রয়েছে, আর আমার রয়েছে হতাশার স্মৃতি। মাঝে মাঝে মনে হত ঐ সুন্দর পাহাড়ে বিদেশাগত অধিবাসীদের হৃদয়ে সুন্দর হবার শিক্ষা কেউ কেন দেয়নি। প্রকৃতির প্রভাব কেমন স্তিমিত মনে হত। অমন সুন্দর শহর ও তার পরিবেশকে কেন-বা ভালবাসতে পারিনি। সেজন্য শিলং-অনুরাগীদের কাছে মার্জনা চাইছি।

কিছুক্ষণ নীরবে আকাশের দিকে চেয়ে থেকে বললাম, জান এরামা, অচল জীবনকে সচল করতে ঐ পাহাড়ে দিনের পর দিন বছরের পরে কাটাতে হয়েছে। কিন্তু আনন্দ পাইনি। কেন জানি না, প্রথম যৌবনের রঙিন চোখেও তাকে সুন্দর দেখতে পাইনি। অমন জলপ্রপাত, অমন পথঘাট, অমন সরল গাছের ঝোপ, অমন পাখীর মধুর কণ্ঠ, রোদ আর মেঘের খেলা,—সবই যেন ব্যর্থতার কালো ছায়ায় ঢাকা।

এরামা শ্রোতা আমি বক্তা। আমার বক্তব্যের স্রোত আবার বইতে থাকে, বললাম, একদিনকার কথা বেশ মনে আছে।

রাতের অন্ধকারে সারাদিনের কাজ শেষ করে সবে বাড়ি ফিরেছি। এমন সময় এল, কা-ক্লি। কা-ক্লি আমার গৃহের দাসী ছিল। দাসী বললে ভুল হবে, সে পাচিকা, সে ধোপানী, সে দাসী, সে সেবিকা, সে ধাত্রী।

তার অক্লান্ত সহযোগিতা আমায় মুগ্ধ করেছিল।

হঠাৎ একদিন এক বিদেশীর সাথে তার বিয়ে হল। বিয়ের সংবাদ দিয়ে কাজ থেকে ছুটি নিল।

লাবানের উচ্চ শীর্ষে তার ঘর, স্বামীকে সাথে করে নিয়ে তুলল তার কুটিরে।

হাসপাতালের সামনে বসে ফল বিক্রি করত সারা দিন, তা থেকে যা আয় হত তা দিয়েই তাদের দুজনের সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটত।

স্বামীকে বড়ই ভালবাসত কা-ক্লি। স্বামীকে কোনো কাজই করতে হয়নি কোনো দিন-ই। কাজ না করতে দেবার ফল ফলতে দেরি হল না। অকর্মণ্য পুরুষ গ্রামের অকর্মণ্য মেয়েদের সাথে ভাব করতে বিলম্ব করল না। ঘটনার রূপান্তর ঘটলেও গোপন রইল অনেক কাল।

সকালবেলায় স্বামীর খাবার প্রস্তুত রেখে কা-ক্লি শহরে আসত। সওদা কিনত, কেনাবেচা করত। পাহাড়ের মাথায় যখন ফিরে আসত তখন অনেক রাত। এসেই খাবার তৈরি করতে বসত। উদ্বৃত্ত ফল কেটে কেটে স্বামীর হাতে তুলে দিত, সারা দিনের কাজকর্মের হিসাব করত। সে বুঝতেও পারত না তার স্বামীর মনের কথা। এমনিভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল।

একদিন রাতে ফিরে এসে দেখে স্বামী ঘরে নেই। লণ্ঠন হাতে করে ঘরে ঘরে খোঁজ করতে করতে হয়রান হয়ে গেল।

এদিকে তার দূর প্রতিবাসী কা-মিসার ঘর থেকেও লোক বেরিয়েছে কা-মিসাকে খুঁজতে। কা-ক্লি বুঝতে পারল তার ঘরে আগুন লেগেছে, পুড়ে শেষ হয়ে গেছে।

স্বামী-দেবতা তার বেইমান নয়, যাবার সময় নগদ কড়ি সব তো নিয়েই গেছে, তার সঙ্গে নিয়ে গেছে তার কানের এক জোড়া নতুন তৈরী দুল।

কা-ক্লি পরের দিন ছুটে এসেছে শহরে। স্বামীর পুরান আস্তানায় খোঁজ করেছে, বন্ধুবান্ধবদের কাছে খোঁজ করেছে, কোথাও খবর পায়নি. অবশেষে আমার কাছে এসেছে দুঃখ জানাতে আর প্রতিকারের পথ খুঁজতে।

শুনেই মনটা আমার ছ্যাঁৎ করে উঠল। এতদিন স্বামী বিপথগামী স্ত্রীকে খুঁজে বেড়িয়েছে, তাও দেখেছি। দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আজ স্ত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছে বিপথগামী স্বামীকে।

কা-ক্লি কেঁদে ফেলল, বলল। তার কোনো কষ্টই তো কখনো হতে দেইনি বাবুজি, তবুও এত বড় বেইমানি সে করল।

আমি নির্বাক শ্রোতা। সান্ত্বনা দেওয়া তো দূরের কথা, জবাব দেবার শক্তিও আমার ছিল না।

ক্রোধের উত্তেজনায় কা-ক্লি বলল, যদি তাকে পেতাম, বলেই গাউনের তলা থেকে আট-দশ ইঞ্চি মাপের ছুরি বের করে আবার বলল, তার কলিজা কেটে দেখতাম সত্যি সত্যি তার মানুষের কলিজা আছে কি না!

কা-ক্লির মুখচোখে কেমন একটা ঘৃণা ফুটে উঠল। আমি শঙ্কিত হলাম। 'আই ডুং' করতে তার বেশী সময় দরকার হবে না, একথা আমি জানি। খাসিয়া নারীরা স্বামীকে ভালবেসেই ঘর বাঁধে, সেই ভালবাসা বিঘ্নিত হলে তাদের পক্ষে হত্যা করাও অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে এই অশিক্ষিতা দাসী শ্রেণীর নারীর পক্ষে তা সম্ভব।

ধীরে ধীরে বললাম, বুঝে সুঝে কাজ না করলে কষ্ট পেতে হয় কা-ক্লি, তা বলে তার প্রতিবিধান 'ডুং' নয়। ছুরি মারলে—

জোরের সাথে কা-ক্লি বলল, ছুরি মারলে ওরা বুঝবে এমন বেইমানি এদেশে চলবে না। এদেশের মেয়েরা বাজারের পণ্য নয়, একথা সেও বুঝবে, তার মতো আর সবাই বুঝতে পারবে।

কথা শেষ করেই কা-ক্লি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বলল, ঠিকই বাবু, ওরা ভালবাসে না, তা না বাসল, তা বলে শোধ নিলে প্রতিকারও হবে না।

কা-ক্লি মেঝেতে বসে কাঁদতে থাকে। তার ক্রোধ, ঘৃণা, অনুশোচনা ব্যথার মাঝ দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

এমন সামান্য ঘটনাই আমার সেই দিনকার কাঁচা মনে গভীর রেখাপাত করেছিল এরামা, তখন ভাবতে পারিনি মানুষ এত অমানুষ হয় কি করে! তারপর বিশ বছর ধরে পরখ করে আসছি, দেশে বিদেশে ওরকম হাজার হাজার কা-ক্লি কেঁদে মাটি ভেজাচ্ছে, প্রতিবিধান হয়নি, প্রতিকার হয়নি, হবেও না।

কথা শেষ করে দম নিলাম। এরামার ব্যথিত মুখের দিকে চেয়ে থেকে আবার বললাম, এই শেষ নয়। কার্টরোডের ধারে যে সরাইখানা রয়েছে, সেই সরাইখানায় একদিন হৈ হৈ কাণ্ড। লোকজনের দৌড়াদৌড়ি, চীৎকার, সব মিলিয়ে মাঝরাতের শান্ত পরিবেশ বিকৃত হয়ে উঠল।

খবর নিতে নেমে আসলাম। খবর আর নিতে হল না, রাস্তার ধারে ক্ষতবিক্ষত একজন গাড়োয়ালী সৈন্যের মৃতদেহ দেখে থমকে দাঁড়ালাম। রাস্তা লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছে। সদ্যমৃত ব্যক্তির আততায়ীকে ভোজালিসমেত গ্রেফতার করা হয়েছে। আততায়ীও গাড়োয়ালী সৈনিক। বন্দী গাড়োয়ালী বিকারহীনভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেল, গাড়োয়ালী হত্যাকারী তার স্ত্রীকে রেখে দেরাদুনের কোনো সামরিক কেন্দ্র থেকে দেশে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখল তার গৃহিণী গৃহছাড়া হয়েছে। ছ মাস অনুসন্ধান করে সে তাদের আবিষ্কার করেছে শিলংএর সরাইখানায়। কোথায় দেরাদুন আর কোথায় শিলং। তারপর যা হয় তাই হয়েছে। জানি না সেই আততায়ী মুক্তি পেয়েছিল কি না, আর তার এত সাধের গৃহিণীকে ঘর সাজিয়ে দিয়েছিল কি না।

কিন্তু প্রকারভেদ থাকলেও কা-ক্লি আর গাড়োয়ালী সৈনিকের বিশেষ কোনো পার্থক্য রয়েছে কি!

দুঃখের আতিশয্যে বললাম, ভাল লাগেনি এরামা। ভালবাসতে পারিনি এই জীবনকে। তুমি হয়ত বলবে, সবাই তো তা নয়। তা না হলেও একথা সব সময় মনে হয় মানুষ যেন পশুর পর্যায়ে নেমে গেছে, আরও যাচ্ছে।

তুমি বোধ হয় জান, গুর্খা সৈন্যদের মস্ত ঘাঁটি শিলং শহর। অদৃশ্য শত্রুকে ভয় দেখাতে ইংরেজ কখনো পেছ-পা নয়। সেই অদৃশ্য শত্রুর সান্ধান না পেলেও রক্তপিপাসু করে যাদের তৈরি করা হয়েছে তাদের তো রক্তের সন্ধান দিতে হবে। সেই রক্তের সন্ধানে সারা বছর নিষ্ক্রিয় থাকবার পর শারদীয়া অষ্টমী পূজা আসে। সেই পূজার আয়োজন আর উপচার কি এবং কত তা তোমায় সঠিক বলতে পারব না, কিন্তু অসহায় জীবহত্যার যা বিরাট আয়োজন হয়, তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না। আমাদের দেশে কালীপূজায় দু-একটা পাঁঠাবলি দিলেই আমরা শিউরে উঠি, আর সেই গুর্খা সৈন্যদের পূজামণ্ডপে কয়েক শত পাঁঠা, মোষ, হাঁস, পায়রা বলি দেখলে মানুষ মৃত্যু কামনা না করে পারবে না একথা নিশ্চিত করে বলতে পারি। সেই বীভৎস হত্যালীলা চলে আসছে ধর্মের নামে যুগযুগান্তর ধরে। বাক্‌হীন পশু অজ্ঞাতে গলা এগিয়ে দিচ্ছে মৃত্যুর সামনে, জল্লাদের কুঠারের সামনে। তোমাদের নাগা অসভ্যতা বোধ হয় এত বিকার-হীন বীভৎস নয়, কেননা ধর্মের অনুশাসনে তা হয় না। তা হয় অজ্ঞতাজনিত কারণে। আর এ হচ্ছে ধর্মের নামে। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ ভগবানকে আবিষ্কার করতে নানারকম যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। সেই বিভিন্ন যন্ত্রকে চালু রাখতে সভ্য-অসভ্য নানা ব্যবস্থাও করা হয়েছে। মানুষ ভগবানকে কোনো দিন পেয়েছে কি না সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়ে গেছে। এমনিভাবে ধর্মের নামে শুধু পশু-হনন নয় মনুষ্য-হনন হয়ে আসছে এই সভ্য মানুষের সমাজে। ভগবানকে পাবার প্রয়োজন কারুর হয়েছে কি না সন্দেহ, দরকারও হয় না; কিন্তু ভগবানকে ব্যঙ্গ করতে, ভগবানের নামে তার

স্বষ্ট প্রাণকে হনন করতে কেউ কখনো লজ্জিত হয় না। স্রষ্টা অলক্ষ্যে ভ্রষ্ট নরনারীর এই বর্বর ব্যবস্থা অনুমোদন করেন কি কখনো!

এই হৃদয়হীন শহুরে ব্যবস্থাপক মানুষকে সেদিন ভালবাসতে পারিনি এরামা, আজও ঐসব স্মৃতি আমায় ব্যথিত করে তোলে। তাই শিলং পাহাড়ের নাম শুনলে ভয় পাই।

রাজকুমার এসে গাড়িতে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে বলল, অনাদৃত মানুষের আসল রূপ দেখতে বেরিয়েছ, সে রূপ বড় ভয়ঙ্কর, বড় কুৎসিত, এতে আনন্দ পাবে না, এতে ব্যথিত হবে।

উত্তর দেই নাই। দেবার ইচ্ছেও ছিল না।

এরামা হাত তুলে তাকে নমস্কার জানাল, আমি এমন অভিভূতের মতো বসেছিলাম যে সাধারণ ভদ্রতাসূচক নমস্কার করতেও ভুলে গিয়েছিলাম।

দীর্ঘ পথের যাত্রী। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে রওনা হয়েছি। ভাল নয়, কেমন অসোয়াস্তি অনুভব করছিলাম। এরামার সহযাত্রী হয়ে শিলং যাব না এ বিষয়ে সে যখন নিঃসন্দেহ হল, তখন সে কেমন নিঝুম হয়ে গেল।

সারাটা পথ অতি সামান্য কথাই সে বলেছে।

ছ্যাকরা গাড়ির হাড় জির-জিরে ঘোড়ার মতো পথের চেহারা। দু পাশে গত যুদ্ধের ভাঙা সাঁজোয়াগাড়ি আর কামান সভ্য জাতির বিকট নির্মম সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করছে। কোথাও চাষের ক্ষেত, কোথাও ঘন বনানী; কোথাও লতাগুল্মহীন শুকনো পাথর, কোথাও উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কোথাও ঢালু পথ নেমে গেছে, এই সব দেখতে দেখতে চলেছি।

মাঝপথে আবগারী বিভাগের ফৌজ যাত্রীদের তল্লাশ করবার জন্য গাড়ি থামাল। আমরাও নেমে পড়লাম।

এরামাকে ডেকে নিয়ে পাহাড়ীদের চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি যে বাক্‌হীন হয়ে পড়লে এরামা।

না তো। শরীরটা ভাল নেই, ছুটিও ফুরিয়ে এসেছে, তাই ভাবছিলাম বাবা-মায়ের সাথে দেখা করে যাব কি না।

হাসলাম। বললাম, অতি পুরান যুক্তি। তোমার মতো মেয়ের পক্ষে এই যুক্তি দেওয়াও যেমন শোনাও তেমনি অকেজো। তুমি রাগ করেছ।

এরামা শুধু একবার মুখ তুলে চেয়ে চুপ করে বসে রইল।

লামডিঙ পৌঁছে দুজনেই দু পথে চলব! আমি যাব শিলচর, আর এরামা যাবে শিলং।

ক্যাটারিং রুমে বসে দুজনে পেট পুরে খেয়ে নিলাম। রাতের শেষে আমার গাড়ি, কিন্তু তাকে এই গাড়িতেই যেতে হবে। ব্যস্ততা তারই বেশী। কার্যকালে দেখা গেল সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই।

বললাম, এবার যেতে হবে।

যেতে হল। তার গাড়ি ধীরে ধীরে প্লাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার দরজায় দণ্ডায়মানা পাথরে খোদাই করা মূর্তির মতো তাকে দেখতে পেলাম। প্লাটফর্মের বিদ্যুতের আলোতে তার সিক্ত কপোলের উত্তপ্ত অশ্রু চিকমিক করে উঠছিল। ঠোঁট দুটো রুদ্ধ আবেগে যেন কেঁপে উঠছিল।

এরামাকে বিদায় দিতে হল।

বুঝতে পারলাম না, কে কাকে বিদায় দিল। স্টেশনের কাঠের বেঞ্চে বসে বিগত দু সপ্তাহের পরিচিতির মাঝ দিয়ে সে যে ছাপ রেখে গেল তাই ভাবছিলাম।

নাগাদের মেয়ে এরামা। সুন্দরী তরুণী, শিক্ষিতা, সরকারী কর্মচারী, তাও নিম্নপদস্থ নয়। তার সান্নিধ্য লাভের আশায় বহুজনকে

বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়। সেই এরামা, তাকে উপেক্ষা করে চলে আসতে হল। নিষ্ঠুরতা না নির্বুদ্ধিতা তা ভেবে পাইনি আজও।

তল্পিবাহক এসে সজাগ করে না দিলে বোধ হয় সে রাতের ট্রেনে আর শিলচর যাওয়া সম্ভব হত না।

গাড়ি লামডিঙএর সীমানা ছাড়তেই ভোরের বাতাস-আলোতে দশদিক ভরে উঠল। বিনিদ্র রজনীর পর প্রভাতের মিঠে বাতাসে তন্দ্রায় চোখ তখন ভেঙে পড়ছিল।

শিলচর
মার্চ ১৯৫৪

তিন

গর্গদেব গল্প বলছিল।

তার আসল নাম গর্গ নয়, দেবতাও সে কোনো কালে ছিল না, এখনো নয়। নাম দিয়ে আর কি হবে, মোটামুটি সৌরভ ছড়িয়ে পড়লেই যথেষ্ট।

সরকারী দোতলা বাংলোয় গর্গদেব বাস করে। বনবিভাগের কয়েকটি রেন্‌জের অধিকর্তা। জীবনের বৃহত্তর অংশই বনে বনে কাটিয়েছে, বনের সাথে গভীর পরিচয়, আকণ্ঠ বন্ধুত্বে বনকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। তার পঁচিশ বৎসরের এই সখ্য তাকে নিচের তলা থেকে ধাপে ধাপে উপরতলায় পৌঁছে দিয়েছে। বাল্যে লেখাপড়া শেখবার মতো যথেষ্ট অবসর তার ছিল না, কিন্তু ডানপিটেগিরি করবার ফুরসত খুঁজে নিতে সে মোটেই ত্রুটি করেনি, যার ফলে পঁচিশ বছর ধরে ডুয়ার্সের বনে পশু হনন করতে করতে মোটামুটি নামজাদা শিকারী বলে তখনকার দিনে বাংলা দেশে তার যথেষ্ট খ্যাতিলাভ হয়েছিল। খ্যাতি তার মিথ্যে নয়, খ্যাতির যোগ্যতা তার ছিল।

আমি তার পরিচিতজনের গণ্ডীর বাইরে। সারা এলাকার দেড়শ জন লোকের আমি একজন। মুখ চেনাচেনি হলেও পরিচয় করবার প্রয়োজন কোনো পক্ষেরই কখনো হয়নি। হঠাৎ কখনো থানায় এলে জিজ্ঞাসা করত, কি হে ছোকরা কেমন আছ?—কখনো বা জিজ্ঞেস করত, দেশ উদ্ধারের আর কতটা বাকি?

প্রশ্নের জবাব নিশ্চয়ই দিতাম। জবাব কানে পৌঁছাত না, তৎপূর্বেই শ্রুতিযোগ্য আয়তনের বাইরে চলে যেত। মনে হত, সে যেন আমার প্রতি কিছু করুণা এবং ব্যঙ্গ প্রকাশ করবার জন্যই এই সব উদ্ভট প্রশ্ন করে।

গর্গদেবের সদর কার্যালয় আমার বাসস্থান থেকে এক ফার্লঙের মধ্যে। খোলা মাঠে লাল রঙ-করা টিনের দোতলা ছাউনিতে তার অধীনস্থ কর্মচারীদের শঙ্কিত পদক্ষেপে প্রবেশ করতে দেখেছি। কখনো

কখনো তার গুরুগম্ভীর আহ্বানে পাহাড়ী আরদালীকে ছুটে যেতে দেখেছি, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে তার বাংলোয় গিয়ে বসবার কোনো সুযোগ বা সুবিধা অনেক দিন হয়নি! তার বাংলোটাকে রূপকাহিনীর রাজপুরীর মতো মনে হত। তাকে মনে হত দিগ্বিজয়ী বীর। কালো হলেও সাহেব, সায়েবিয়ানার কোনো ত্রুটি কোথাও কখনো দেখিনি। সায়েবী জীবনটা জানবার কেমন যেন একটা ঔৎসুক্য ছিল, সে ঔৎসুক্য ব্যাখ্যা করবার মতো ক্ষমতা সেদিন ছিল না। তার বাংলোর দিকে চেয়ে চেয়ে অবসর কেটে যেত।

এই রূপকাহিনীর রাজপুরীর দ্বার একদিন খুলে গেল।

কেমন করে খুলল, সেই কথাই এবার বলব।

গর্গদেব সপত্নীক হয়েও বিপত্নীকের জীবন যাপন করত, তা বলে ন্যায়ধর্মের বিধিগুলো কিন্তু তার উপর প্রয়োগ করা যায় না। পিকউইকি ভাষায় 'She was a miss but she did not miss.' কথাটাকে লিঙ্গ-পরিবর্তন করে তার উপর বেশ প্রয়োগ করা যায়। পূতিগন্ধময় এই জীবনটাকে সে অসম্মানীয় বলে মনে করত না। মাঝে মাঝেই গভীর বনান্তরালের রেন্জ অফিসের বাংলোয় তাকে বাস করতে হত। সদরে সব সময় সে থাকত না। যখন সদরে থাকত তখন প্রতি সন্ধ্যায় গর্গদেবের বাংলোর বারান্দায় মজলিস বসত। তহসিলের ডাক্তারবাবু ছিল তার স্থায়ী সদস্য, অস্থায়ীভাবে দেখা যেত চা-বাগানের ম্যানেজারদের, থানার দারোগা আর তহসিলদারকে। অনেক রাত অবধি পেট্রোমাক্সের আলোতে বসে তাস খেলা হত আর তার সাথে গল্প গুজব চলত।

বনের অধিবাসী কম, যারা অধিবাসী তাদের অধিকাংশই সরকারী কর্মচারী, তাই তাদের চোখে গর্গদেব বিরাট বস্তু, তাদের নাগালের বাইরে দেবতুল্য মহাশক্তি। অধীনস্থ কর্মচারীদের সর্বাংশই আতঙ্কে গর্গদেবের বাংলোর ত্রিসীমানায় বিনা প্রয়োজনে পদক্ষেপ করত না।

আমি এদের সমকক্ষও নই, সহকর্মীও নই, অধিকার আমার সীমাবদ্ধ। পা ফেলবার গণ্ডি আইনের অক্টোপাসে বাঁধা। সময় আমার ঢিমে তেতালায় চলত। মুহূর্তকে মনে হত প্রহর। চার

দেওয়ালের পঁচিশ বর্গহাত জমির মেঝেয় মাতুর পেতে আদুড় গায়ে সুদূরে মন ছুটিয়ে দিতাম কল্পনার পঙ্খিরাজের সোয়ারী করে। অবসর যাপন করতে হত শুকনো কাঠের চেয়ারে বসে, গল্প করতাম রামলগন আর মখসুদ আলি সেপাইদের সাথে। কখনো কখনো সহকারী দারোগা পুলিন সেন এসে পাশে বসত। তার সাথেও গল্প করতাম, গল্পের গণ্ডি ছিল পুলিন সেনের পরিবার। নববিবাহিত পুলিন সেন আর বলবেই বা কি, বলবার মতো আছেই বা কি। তবুও তার গৃহিণীকে গৃহদান করবার সাহস পায়নি ডুয়ার্সের ম্যালেরিয়ার ভয়ে। আমার বয়স ও তার বয়সের বিশেষ পার্থক্য না থাকলেও চিন্তাধারায় পার্থক্য ছিল অপরিমেয়, সেজন্য তার গৃহিণীর কাহিনী একঘেয়ে মনে হত।

এরই মধ্যে সুযোগ পেলাম নিজের অধিকারের গণ্ডি বৃদ্ধি করতে। সহকারী পুলিসের অধিকর্তা হঠাৎ পরিদর্শনে এসে আমায় খেলাধুলো করবার এবং গ্রামের সীমানার মধ্যে বিকেলবেলায় বেড়াবার অধিকার দিয়ে গেল। অতি সামান্য এই সুযোগ আমার পক্ষে লোভনীয় আশীর্বাদ। এই লোভনীয় আশীর্বাদ মুকুলিত হল দারোগাবাবু বদলি হওয়াতে। বদলির আদেশপ্রাপ্ত দারোগার বিশ্বাস জন্মেছিল তার এই বদলির পেছনে আমার অভিযোগ রয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে আমার সাথে সহকারী অধিকর্তার এমন কোনো কথাই হয়নি যার ফলে দারোগা-বদলির হুকুম আসতে পারে।

সে জিজ্ঞাসা করছিল, কেমন আছ বেবি ?

তখন আমার পক্ষে থাকা আর না-থাকা দুই-ই সমান। তাই বললাম, ভালই আছি, তবে বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

বেড়াও না কেন ? তোমার বেড়াবার খেলবার সুযোগ রয়েছে তো।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, তা তো জানি না। তোমাদের হুকুম-নামা না পেলে তা সম্ভব হবে কেমন করে।

সাহেব আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করেনি। যাবার বেলায় লাল-ফিতের তলা থেকে আলো-বাতাসে বেড়াবার মতো হুকুমনামাখানা

টেনে বের করে আমার বাঁচবার মতো সুযোগ সৃষ্টি করে গেল। এরই ক'দিন পরে দারোগা-বদলির আদেশ এল। তাই স্বাভাবিকভাবেই দারোগাবাবু আমাকে দোষী স্থির করেছিল। দারোগাবাবুর এখতিয়ার আমায় পাহারা দেওয়া, তাই নিষ্কৃতি পেয়েছিলাম, ; আর কিছু ক্ষমতা যদি তার থাকত তাহলে হাতে মাথা কেটে নিতে ত্রুটি করত না!

নতুন দারোগা এল কাজীসাহেব। হুমায়ুন বাদশার মতো দাড়ি, অর্ধেকমাথা টাক, বলিষ্ঠ দেহ, ততোধিক বলিষ্ঠ তার চাউনি। বিদায়ী দারোগা আমার চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে কি সব বলে গেল জানি না, কিন্তু আমি দেখলাম, মধ্যবয়সী কাজীসাহেবের গোলকসদৃশ চোখ দুটো মাঝে মাঝেই আমাকে লক্ষ্য করে ঘূর্ণিত হচ্ছে। আমার বিগত ইতিহাস বিদায়ী দারোগার মুখে শুনে কাজীসাহেব খুশী হয়নি বোঝা গেল।

সেই সাথে বোধ হয় সহকারী অধিকর্তার প্রচ্ছন্ন স্নেহের কথাটাও বলে গিয়েছিল, নইলে কাজীসাহেবও হাতে মাথা কাটবার চেষ্টা একবার না করত এমন নয়। তার ক্ষমতা জাহির করতে প্রথম গোপন নিষেধাজ্ঞা জারি করল সেপাইদের উপর, যাতে তারা কেউ আমায় রেঁধে না দেয়।

কিন্তু কাজীর উপরও কাজী রয়েছে; সে কথা কাজীসাহেবকেও পরে স্বীকার করতে হয়েছিল। আমি নিচের কাজীর নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে উপরওয়ালা কাজীর দ্বারস্থ হলাম। উপরওয়ালার সাথে পরিচয় ঘটেছিল আকস্মিকভাবে কিন্তু লাভবান হয়েছিলাম প্রভূত, যার হিসাব করা অসম্ভব। উপরওয়ালার অকৃপণ স্নেহের অংশ কুড়িয়ে পেয়ে বাকি ক'টা মাস বেশ আনন্দেই কাটাতে পেরেছিলাম।

রামলগন রেঁধে দিত। তার রান্নার সাথেই আমার চাল ফুটিয়ে দিত। যেদিন সে কাজে বেরিয়ে যেত সেদিন আমিই তার রান্না করে রাখতাম। এই সহযোগিতার পূর্ণচিত্র আজকের দিনে দুর্লভ। রক্ষক ও ভক্ষকের এমন সখ্য সচরাচর অপ্রাপ্য। এর পেছনে মহৎ কোনো বৃত্তি ছিল না, ছিল রামলগনের অবচেতন মনের কোণে আজাদ হিন্দুস্থানের স্বপ্ন।

গোপন আদেশ জারি হওয়ামাত্র রামলগন এসে জানিয়ে গেল। বিষণ্ণতার মাঝ দিয়ে সেবার ধর্ম ও শুভেচ্ছা তার কথার মাঝ দিয়ে ফেটে পড়ছিল।

আশ্বাস দিয়ে বলল, চৌকাবর্তন কান্তর মা-ই করিবে, লাকড়ি হামি আনিয়ে দিবে। আপি লোক স্রেফ রসুই করবেন, লেকিন আজকের লিয়ে হামি রসুই করবে।

রামলগন চলে যাবার পর বসে বসে ভাবছিলাম মানুষ কতটা হৃদয়হীন হলে অকারণে অপরকে বিড়ম্বিত করতে পারে। এমন সময় আমার খুপরির সামনে এসে দাঁড়াল নওসার আলি। তার এক হাতে এক গ্লাস দুধ আর অপর হাতে প্লেটে দুটো ডিম সেদ্ধ।

নওসার কাজীসাহেবের ভৃত্য বা বাবুর্চি। কাজীসাহেবের পরিবারের সাথে সেও পরশু দিন এসেছে। তাকে চলাফেরা করতে দেখেছি, পরিচয় কিছুই নাই। তাই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি চাই?

আপনার নাস্তাপানি আনিছি।

কে পাঠিয়েছে? বিস্মিতভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম।

বি-বি-সাব্। নওসার তোতলা, কথা তাড়াতাড়ি বলতে গিয়ে মোটেই বলতে পারে না। আর না বলতে পারলেই তার মাথা গরম হয়ে যায়।

বললাম, রেখে যাও।

খা-খাইয়া ফেলান। জু-জুড়াই যাবি।

নওসারের কথায় গিন্নী-গিন্নী ভাব। আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। একদিকে কাজীসাহেবের উদ্যত দণ্ড আমার শির লক্ষ্য করে উত্তোলিত, অপর দিকে কাজীগৃহিণীর অযাচিত দান আয়ত্তের মধ্যে। নওসারের উপদেশে কৌতুক অনুভব না করে পারলাম না। দেব-দানবের এই অপূর্ব সমাহার বাস্তবত আমায় কেমন অসহায় অবস্থায় টেনে নিচ্ছিল।

নওসার ফিরে গেল। আমিও হাত-পা ছড়িয়ে বই মুখের সামনে ধরে শুয়ে পড়লাম। আজকের চিন্তা তো শেষ করেছি, কালকের কথা কাল চিন্তা করব।

দুপুরবেলায় নওসারের হাতে ভাতের থালা দিয়ে স্বয়ং বিবি-সাহেবা হাজির হলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন, খোকন সোনা!

হৃদয়ধর্মের এত বড় অভিব্যক্তিসহ আহ্বান কোনো দিন শুনেছি বলে স্মরণ হয় না। যার কাছ থেকে এই মধুময় আহ্বান পাবার আশা করে প্রত্যেক মানুষ, সেই স্নেহের আধার জননী যার নেই, তার কানে 'খোকন সোনা' ডাক যেমন স্বর্গীয় তেমনি অচিন্তনীয়।

অনিমেষ নয়নে এই মাতৃমূর্তির দিকে চেয়ে রইলাম।

তোমার খাবার এনেছি।

আমার ভাত রামিলগন রান্না করছে।

তাকে মানা করেছি, আজ থেকে সে আর তোমার রান্না করবে না।

কিন্তু,

কিন্তু কি! জাত যাবে?

অনেক দিন পর হাসলাম। বললাম, জাত! যাবে বইকি। আমার নয়, আপনার।

বিবিসাহেবাও হাসলেন। এই অচিন্তনীয় ঘটনা কেন ঘটল তা বিবিসাহেবা ব্যাখ্যা করেছিলেন পরবর্তীকালে। উনি বলেছিলেন, পরশু দিন এখানে আসবার সময় থানার বারান্দায় উনি আমাকে দেখতে পান। তারপর দুদিন ধরে আমায় লক্ষ্য করেছেন। বন্ধ্যা নারীর অতৃপ্ত মনে আমার কিশোর কোমল পুত্রমূর্তি জেগে উঠল, পুত্রস্নেহের জোয়ার বয়ে গেল হৃদয়ে, সেই স্নেহকে গোপন করতে পারেননি, আমাকে আপন করে নেবার অহেতুক ইচ্ছা দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছিল তাঁর মনে। তাই রক্তচক্ষু দারোগা-স্বামীকে কদলী প্রদর্শন করে অসহায় বন্দীকে মাতৃস্নেহের কুসুমাস্তরণে আবৃত করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

খাবার পর নওসার থালাবাটি উঠিয়ে নিয়ে গেল। বিবিসাহেবা ঠায় বসে আমার খাওয়া লক্ষ্য করছিলেন। নওসার চলে যাবার পর বললেন, এখানে থাকতে কষ্ট হয়, তাই না খোকন!

অসাড়ে অজানিতভাবে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, হাঁ মা!

উপবাসীর পক্ষে আহার্য যেমন উপাদেয়, বন্ধ্যা নারীর পক্ষে মাতৃ সম্বোধন তার চেয়ে কম উপাদেয় নয়। কেমন উত্তেজিত হয়ে তিনি বললেন, আর কষ্ট হবে না বাছা।

বিবিসাহেবা আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন।

যে স্নেহের আবেষ্টনীতে বিবিসাহেবা আমায় নিবিড়ভাবে আবেষ্টিত করলেন সে আবেষ্টনীর মূল্য দেবার ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু সেই অকৃপণ স্নেহ প্রদর্শন করতে বিবিসাহেবাকে কিছুকাল যথেষ্ট নাজেহাল হতে হয়েছিল। কিন্তু সেই মানসিক ক্লেশ স্নেহের আলপনায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

কাজীসাহেব আমাদের এই মাতা-পুত্রের সম্বন্ধটা বাড়াবাড়ি মনে করত। তার প্রধান কারণ তার চাকরি। বন্দীকে স্নেহ করবার অধিকার অন্য কারুর থাকলেও দারোগা-গৃহিণীর যে নেই সে কথা বিবিসাহেবাকে হাজার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েও কোনো ফল হয়নি। বেচারা কাজীসাহেব শেষ অবধি হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হল, অবাধ্য পত্নীকে শরা-শরীয়তের ভয় থেকে আরম্ভ করে তালাক দেবার হুমকি অবধি দিয়েও যখন কোনো লাভ হল না, তখন কাজীসাহেব চাইল আমাকে বিদায় করতে। কাজীসাহেব করিতকর্মা লোক। বিবি-সাহেবাকে আয়ত্তে না পেয়ে নির্মম জখমী পশুর ন্যায় আমার মতো অসহায় তরুণের উপর তার বীরত্ব জাহির করতে লাগল। অবশ্য কিছুকালের মধ্যেই কাজীসাহেবের দাপট কমে গেল। আমিও বেঁচে-ছিলাম, বিবিসাহেবাও বেঁচেছিলেন। বাঁচবার আগে নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেবার অশান্তি বিবিসাহেবা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন, সত্যি সত্যি তাঁর জাত যাবার উপক্রম হয়েছিল।

স্নানের পর চুল আঁচড়ে দেওয়া, পাট ভেঙে ধোয়া কাপড় পরতে দেওয়া, খাবারের থালা সাজিয়ে সামনে বসে খাওয়ান, এইরূপে মাতৃ-স্নেহের এই অকুণ্ঠ দান পেয়ে আমার বন্দিজীবন ধন্য হয়েছিল।

ধন্য হবার পূর্ব কাহিনীতে সহকারী অধিকর্তার স্থান ও দান কম

নয়। কাজীসাহেবের চিঠির আঘাতে সহকারী অধিকর্তা এল। এসেই সরাসরি আমার খুপরিতে দেখা দিল। জিজ্ঞাসা করল, বেবি, তোমার নামে অনেক রিপোর্ট পেয়েছি। তুমি কি চাও তোমাকে জেলখানায় ফেরত পাঠাই ?

আমি হাসি সংবরণ করতে পারলাম না। বললাম, সাহেব, হিন্দুদের কালীমন্দির দেখেছ ? সেখানে পাঁঠাবলি দেওয়া হয়, তাও জান বোধ হয়।

যীশুর বরপুত্র ইংরেজ সাহেব অস্থিরভাবে বলল, চুপ কর। ওসব বড্ড বেশী পুরান হয়ে গেছে। তোমার কিছু বক্তব্য আছে কি ?

তোমাদের যারা রিপোর্ট দেয় তারা নিশ্চয়ই সাহুকার, আর অভিযুক্ত সব সময়ই অপরাধী। তোমার আইন তোমাদের সুবিধা সৃষ্টি করে, আমাদের হাত থেকে তোমাদের নিরাপদ দূরত্বে রাখতে তৈরি করে। দূরত্ব সৃষ্টি করতে সাহুকারদের রিপোর্টই যথেষ্ট।

সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল। খোলাখুলি সব কথা বললাম। বলা শেষ হবার সাথে সাথে কাজীসাহেবের এত্তেলা হল।

কাজীসাহেবের সেদিনকার সেই বয়স্ক মূর্তি আজও ভুলতে পারিনি। দুর্বলকে যারা আঘাত করে সবলের হাতে তারাই ভাল-মানুষ সাজে। সাহেব যখন বলল, কাজীসাহেব, তোমার স্ত্রীকে সরকার কত টাকা বেতন দেয় ?

হুজুর, মুখ কাঁচুমাচু করে অতি বিনয়ের সাথে কাজীসাহেব শুধু বলল, হুজুর। কাজীসাহেবের অবস্থা বেড়ালের মুখে নেংটি ইঁদুরের মতো।

হুজুর নয়, আসল কথার জবাব দাও।

হুজুর বাপ-মা, আমি যা পাই সেইটেই আমার স্ত্রীরও প্রাপ্য।

তোমাদের শরা-শরীয়ত তাই নির্দেশ দেয়, নয় কি ?

হাঁ হুজুর।

কিন্তু আইন, যা এদেশে এখন চালু রয়েছে তাতে তুমি সরকারের চাকর ঠিকই, কিন্তু তোমার স্ত্রী সরকারের গোলাম নয়। তার ইচ্ছে আছে, সুখ-সুবিধে আছে। সেই ইচ্ছা, আর সুখ-সুবিধে নষ্ট করবার অধিকার তোমারও নেই, আমারও নেই।

হাঁ হুজুর। কাজীসাহেবের নাড়ীর গতি যেন বন্ধ হয়ে আসছে।

তোমার স্ত্রী বেবিকে স্নেহ করেন, নয় কি? সেটা যদি অপরাধ হয়, সে অপরাধ তোমার নয়, তোমার স্ত্রীর। সে অপরাধের শাস্তি যদি দিতে হয় সরকার দেবে, তুমি নও, আমিও নই।

কাজীসাহেব লজ্জায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

বেবিকে সরকার আটক রেখেছে সরকারের স্বার্থে, তোমার আমার স্বার্থে নয়। তার অন্য কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করতে নয়, তাকে কেবলমাত্র স্বাধীনতা ভোগ করতে না দিতে। বুঝলে? যেটা তোমার কাজ তাই করবে। অনধিকার চর্চা করতে যেও না, বুঝলে?

হাঁ হুজুর।

কাজীসাহেব যেন প্রাণ ফিরে পেল।

সাহেব কঠোরভাবে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা কাজীসাহেব তোমার সামনে ঐ যে মাঠ, ঐ মাঠে কতগুলো শিমুলগাছ আছে?

হুজুর আটত্রিশটা। সাথে সাথে কাজীসাহেব উত্তর দিল।

সুন্দর। এবার তুমি যেতে পার।

কাজীসাহেব শির কণ্ডুয়ন করে কিছু বলতে চেষ্টা করছিল। সাহেব তাকে বাধা দিয়ে বলল, পরে শুনব কাজীসাহেব, এবার তুমি যেতে পার।

কাজীসাহেব বেরিয়ে যাওয়ামাত্র সাহেব জিজ্ঞাসা করল, কেমন হিসাব পেলে?

কিসের? শিমুলগাছের?

হাঁ। সরকার কি চায় জান? সরকার চায় ক্ষিপ্রতা, সরকার সত্যকে চায় না। সত্যকে খুঁজে বের করতে সময় দরকার হয়, তাতে শাসনব্যবস্থা চলতে পারে না। এরা রিপোর্ট দেয়, সেই রিপোর্টের ওপর ভরসা করে, ভিত্তি করে দেশ শাসন হচ্ছে। এর ফল ফলতে বেশী দেরি হবে না তা নিশ্চিত জেনেও সরকারকে এইগুলো সত্য তথ্য বলে প্রচার করতে হয়। সত্য ধামাচাপা পড়ে অপমৃত্যুজনিত আর্তনাদে ডুকরে ওঠে।

আমাকে জবাব দেবার অবসর না দিয়েই সাহেব উঠে গেল। কাজীসাহেবও বোধ হয় সেই থেকে রাহুমুক্ত হল। আমার দিক থেকে অনাবশ্যক উৎপীড়নের হাত থেকে বাঁচবার রাস্তা খুলে গেল। কাজীসাহেবের পরবর্তীকালের সহৃদয়তার কথা এখনো মনে পড়ে। সময় সময় আমাকে সঙ্গী করে সে গর্গদেবের আড্ডায় বসত, মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে যেত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, বন থেকে বনান্তরে। তার পরিবর্তনের মূল যিনি তাঁকে সশ্রদ্ধভাবে আজও স্মরণ করি। মাঝে মাঝে তাঁর কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু তিনি যে কোথায় তা জানি না, হয়ত অন্তরীক্ষে বসে তিনি তাঁর স্নেহের কাঙাল এক পথে-পাওয়া সন্তানকে আজও আশীর্বাদ করে থাকেন।

সেদিন সন্ধ্যায় কাজীসাহেবের সাথে গর্গদেবের বাংলোর বারান্দায় বসে চা পান করছিলাম, এমন সময় ডাক্তারবাবুর কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড শান্তরাম দৌড়াতে দৌড়াতে এসে ধপাস করে সিঁড়িতে বসে পড়ল। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করল, কি হল রে শান্তরাম ?

বাগ-অ-অ। শান্তবাম 'অ' এমনভাবে টেনে বলল যাতে মনে হল রাস্তায় কোথাও বাঘ তাকে আক্রমণ করেছিল।

গর্গদেব উৎকর্ণ হয়ে বলল, কুটায় (কোথায়) ?

মোর ওসুই ঘরর পাছত (আমার রান্নাঘরের পেছনে)।

জিজ্ঞাসাবাদ করে যা বোঝা গেল তার অর্থ, এখনি এই সন্ধ্যে-বেলায় তার নধরকান্তিবিশিষ্ট ছাগশিশুটি রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, এমন সময় বাঘ তাকে আক্রমণ করে এবং টেনে নিয়ে যেতে থাকে। শব্দ শুনে শান্তবাম বাইরে বেরিয়ে সেই দৃশ্য দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এসেছে।

গর্গদেব দেখতে দেখতে প্রস্তুত হয়ে নিল।

আমরা সবাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। গর্গদেব রাইফেল হাতে করে বেরিয়ে গেল। অন্ধকারে আত্মগোপন করে আমিও চুপিচুপি তার পিছু নিলাম। গর্গদেব প্রথমে বুঝতে পারেনি। অনেকটা পথ আসবার পর আমার পায়ের শব্দে পেছনে চেয়ে দেখল। আমাকে দেখেই অবাক হয়ে গেল, জিজ্ঞাসা করল, তুমি কেন হে ছোকরা ?

বাঘ দেখব। অতি মৃদুস্বরে উত্তর দিলাম।

বনের বাঘ দেখা ছেলেখেলা নয় হে। ফিরে যাও।

ছেলেখেলা নয় তা জানি বলেই তো বুড়োখেলা দেখতে চলেছি।

মানে।

মানে, আপনার মতো শিকারীর সাথে নির্ভয়ে বনের বাঘ দেখবার আজ সুযোগ পাব, তা নইলে বনের বাঘ দেখবার সুযোগ হয়ত আর হবে না।

গর্গদেব ইংরেজীতে একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল, যার অর্থ দুঃসাহস; কিন্তু সঙ্গে যেতে দিতে কোনো আপত্তি করল না। দুঃসাহসকে গর্গদেব ভালবাসে।

আসামী লতার বন। তারই কিনারায় শান্তরামের ঘর। দুজনে খালি পায়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে এগিয়ে চলেছি। আসামী লতার মাথায় থাকে ঝোপ, গোড়া থাকে পরিষ্কার তকতকে। গাছের গোড়ায় বসে বসে মিনিটে দু-পাঁচ ইঞ্চি করে এগোচ্ছি, গর্গদেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে সামনে আশেপাশে। ইশারায় থামতে বলে গর্গদেব রাইফেল বাগিয়ে ধরল!

যার প্রতীক্ষায় এত সতর্কতা তার সাক্ষাৎ পাবার কোনো সম্ভাবনাই দেখতে পেলাম না, রাতও বেড়ে চলেছে, অতিশয় ধৈর্যের সাথে মশার দংশন সহ্য করে আমরাও বসে রয়েছি। বিরক্ত হয়ে সবে বলেছি 'গ', অমনি গর্গদেব বাঁ হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরল। অর্থাৎ শব্দ করা নিষেধ। ক্ষণিক সময়মাত্র, হাত পঁচিশ দূরে টর্চের বালবের মতো দুটো লাইট দেখা গেল, সাথে সাথে রাইফেল গর্জে উঠল। তারপর জঙ্গল ভেঙে পড়বার মতো লাফালাফি, গোঙানি, তাও ক্ষণেকমাত্র। তারপর সব চুপচাপ। গর্গদেব হাত ধরে বলল, হয়ে গেছে, চল।

বাঘ।

তা আর দেখতে হবে না, বলে টর্চ জ্বালল। টর্চের আলোয় শুধু দেখতে পেলাম কতকগুলো আসামী লতার মাথা নড়ছে।

বললাম, চলুন দেখে আসি।

মোটেই নয়। গম্ভীরভাবে বলেই গর্গদেব আমার হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে আসল।

রাস্তায় আসতে আসতে বলল, জখমী বাঘ বনের তাজা বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর, বুঝলে ছোক

মৃদুকণ্ঠে আমিও বললাম, বাঘ কেন, সবাই তাই। আঘাত সবাইকে ভয়ঙ্কর করে।

তাই যদি জান তাহলে বাঘকে দেখতে যেতে চাইছ কেন? ওটা যদি মরে থাকে ভাল, সকালে ওকে খুঁজে বের করা যাবে আর যদি শুধু জখম হয়ে থাকে, তাহলে ওর সামনে যাওয়া আর যমের মুখে যাওয়া একই কথা।

কথা বলতে বলতে রাস্তায় এসে গেছি। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে পুলিন সেন জমাদারকে ছুটে আসতে দেখা গেল।

গর্গদেব জিজ্ঞাসা করল, তুমি ছুটছ কেন ছোট দারোগা? বাঘ অক্কা পেয়েছে।

গর্গদেবের পাশে আমাকে দেখে পুলিন সেন যেন বেঁচে গেল, আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, ওঁর খোজে যাচ্ছিলাম।

মানে?

জানেন না তো কত বড় দায়িত্ব। ওঁর কিছু ঘটলে আর চাকরি থাকবে না। কাজীসাহেব তো পাগল হবার যোগাড়। থানার সব ক'টা রাইফেল আর সেপাই নিয়ে তিনি অপেক্ষা করছেন। আমি যদি সংবাদ না নিয়ে যাই তাহলে তিনি বের হবেন।

গর্গদেবের মৃদু হাসির শব্দ শোনা গেল।

পুলিন সেন আমাকে লক্ষ্য করে বলল, আপনি আমাদেরই সর্বনাশ করতে চান না কি?

মোটেই না। আখমাড়াই কলে পিষে না মরে বাঘের মুখে পড়লে মৃত্যুটা তাড়াতাড়ি হত, তাই পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলাম।

আপনার সবই ঠাট্টা।

হেসে বললাম, গম্ভীর হবার সুযোগ পাইনি ছোট সাব্। এত অল্প বয়সে অল্প জ্ঞান নিয়ে গম্ভীর হলে লোকে বলবে এঁচড়ে পাকা।

গাম্ভীর্য রক্ষা করে চলতে পারে haves-এর দল। ঠাট্টা করে হেসে-খেলে দিন কাটিয়ে দেয় have nots-এর দল। জানেন তো complexity দু প্রকার। প্রথমটা inferiority complex, এরা এঁদো মাতালের দল, এদের পকেটে একটি টাকা থাকলে গরম থাকে। আধ ছটাক মদ খেয়ে এরা রঙ ওড়ায়। দ্বিতীয়টা superiority complex, এরা বুঁদ মাতাল, অনেক টাকা পকেটে থাকলেও কথা বলে না। এক জালা মদ খেয়ে ব্যোম-ভোলানাথ সেজে থাকে। মদ আর মুদ্রা, দুটোই complex-এর উপাদান। যাদের নেই তারাও অনেকে haves, যেমন আপনি। নেই অথচ বুঁদ মাতালের মতো গা গরম করবার অভ্যাস ছাড়তে পারেননি, মোটামুটি গাম্ভীর্য রক্ষা করে চলতে বাধ্য হন। আর যাদের আছে যেমন গর্গদেব, উনি পাকা haves-এর সদস্য। বুঁদ মাতাল, ব্যোম-ভোলানাথ। গাম্ভীর্য আর ধমকানি পাশাপাশি চলে।

পুলিন সেন জবাব খুঁজে না পেয়ে চুপচাপ চলছিল, কিন্তু গর্গদেব আমার কথা সমর্থন করতে না পেরে হঠাৎ বলল, তুমি তো ছোকরা পাকা জহুরী।

যেমন জহরত তেমনি জহুরী, পাকা কাঁচা কিন্তু তাতে ঠিক করা যায় না।

গর্গদেব কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু তার বক্তব্য আরম্ভ করবার আগেই কাজীসাহেব সসৈন্যে লণ্ঠন হাতে দেখা দিল। আমাকে পেয়ে যেন বর্তে গেল। তবুও haves-এর দলে নাম লেখাবার জন্য কপট গাম্ভীর্যে বলল, এমনভাবে যাওয়া তোমার উচিত নয়।

হেসে বললাম, আমি ভুলি নাই আমি বন্দী।

তোমার কাজ দেখে তা মনে হয় না।

উত্তর দেবার আগেই নারীকণ্ঠ ভেসে এল, ফিরে পেয়েছ তো। আর মেজাজ দেখাতে হবে না। এস খোকন।

চেয়ে দেখলাম উঠি-পড়ি করে বিবিসাহেবা ছুটে এসেছেন।

আমার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে মাথার কাপড় টেনে দিলেন।

বিবিসাহেবার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। লণ্ঠনের মৃদু আলোতে কি বিরাট মাতৃমূর্তি নিয়ে তিনি যে দাঁড়িয়েছিলেন তা আজ বলবার মতো ভাষা নেই! হঠাৎ আমাকে দু হাত দিয়ে জাপটে ধরে বললেন, খোকন! রুদ্ধ আবেগে আর কিছুই বলতে পারলেন না। তাঁর চোখের জলে আমার কপাল ভিজে গেল।

গর্গদেব কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বারান্দায় উঠে দাঁড়াল। পুলিন পাশ কাটিয়েছে, সসৈন্যে কাজীসাহেব বোধ হয় ক্রোধ সংবরণ করতে গিয়ে কেঁদেই ফেলল।

A son indeed, a holy mother. বারান্দা থেকে গর্গদেবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

এই সেই গর্গদেব। আজ গল্প বলছে।

গর্গদেব গল্প বলবার টেকনিক জানে। ধীরে ধীরে ছোট ছোট কথায় গল্প আরম্ভ করে ছোট ছোট কথায় গল্প শেষ করে। তার কাছে বনের গল্প হরেকরকম শুনেছি। জন্তু জানোয়ার গাছপালা সবার বিষয়ে নিপুণ বিজ্ঞানীর মতো সে গল্প রচনা করতে পারে।

সায়েবরা এসেছে। বড় সায়েব কন্‌জারভেটার। বছর শেষে শীতের মরশুমে সায়েবরা শিকার করতে আসে ডুয়ার্সের জঙ্গলে। বড় সায়েব বড় শিকারী। বনবিভাগ আর তহসিলের কয়েক গণ্ডা হাতী সঙ্কোশ নদীর কিনারায় জড়ো করা হয়েছে। সারি দিয়ে সাদা তাঁবু পড়েছে। সায়েবরা ছ-সাত জন, বিবিসায়েবদের সংখ্যা একটু বেশী। রাভা, ওঁরাও, মুণ্ডাদের জড়ো করা হয়েছে 'বিট' দেবার জন্য। দু-তিন দিন পানাহারেই কেটে গেছে। দেশী শিকারীরা সবাই তখনো আসেনি, তাদের প্রতীক্ষায় সায়েবরা বসে আছে।

আমরা যখন পৌঁছলাম তখন তোড়জোড় শুরু হল। অনেক যুক্তি বুদ্ধি করে ঠিক হল 'বিট' দিয়ে বাঘ মারা হবে না, 'কিল' দিয়ে বাঘ মারতে হবে।

'বিট' দেয় মানুষে। শিকারী হাতীতে চড়ে বাঘ খুঁজে বেড়ায়, বিটাররা লাঠি বর্শা নিয়ে জঙ্গল পিটিয়ে, টিন পিটিয়ে, চীৎকার করে বাঘ খুঁজে বের করে। আর 'কিল' হল মাছ মারবার 'চার'। গাছের তলায় গরু বা মোষ বেঁধে অপেক্ষা করতে হয় গাছের মাথায়। বাঘ 'কিল' আক্রমণ করলেই শিকারী Kill করে।

কিলের যোগাড় হল, মাচান বাঁধা হল।

সব প্রস্তুতি শেষ, এমন সময় বড় সায়েবের বিবি বায়না ধরল, সেও বাঘ মারা দেখবে। বীর পতির বীরত্ব দেখবার প্রলোভন পতিব্রতার পক্ষে, পরিত্যাগ করা সত্যিই কষ্টকর।

ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হল।

জমি থেকে প্রায় দশ ফুট উপরে আমাদের মাচান বাঁধা হল। তারও চারফুট উপরে বিবিসায়েবের মাচান বাঁধা হল। নির্দিষ্ট দিনে বেলা থাকতে থাকতে আমি আর বড় সায়েব নীচের মাচানে বসলাম। উপরের মাচানে বসল বড় সায়েবের গিন্নী। যথারীতি 'কিল' বাঁধা হল। আমরা পাহারা দিতে থাকি। সব সময় 'কিল' দেখেই বাঘ আসে না। দিনের পর দিন পাহারা দিতে হয়। অনেক সময় বাঘ কিলের পাশ দিয়েও হাঁটে না।

রাত বাড়তে লাগল। মশার উৎপাত, তার উপর মাঝে মাঝে 'Darling' আওয়াজ মন্দ লাগছিল না। মশার গান আর বিবিসায়েবের সোহাগভরা কণ্ঠ নিস্তব্ধ বনে কোরাসে আনন্দ বিতরণ করছিল।

রাত দুটো হবে। চোখ জড়িয়ে এসেছে। হঠাৎ বনের শুকনো পাতায় খস খস শব্দ হল। সজাগ হয়ে উঠলাম। দুজনেই রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত হলাম।

প্রতীক্ষিত ব্যাঘ্রপুঙ্গবের দেহ তখনো দেখা যায়নি, দেখা গেল এক-জোড়া চোখ। কিন্তু কিলের কাছে না গিয়ে সে গাছের চারপাশে ঘুরতে লাগল। কিল তখন প্রাণভয়ে লাফালাফি শুরু করেছে। আমরা গুলী করবার সুযোগ খুঁজছি। এমন সময় বিভ্রাট ঘটল। বাঘ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাচানের তলার বাঁশ চেপে ধরল। মাচানটা শক্ত ছিল, নইলে বাঘ হাত দেওয়ামাত্র নীচে গড়িয়ে পড়তে হত।

বিবিসায়েব টর্চ জ্বেলে বোধ হয় বাঘের চেহারা দেখতে চেয়েছিল। বিরাটাকার বাঘের মুখে টর্চের আলো পড়তেই সায়েবের হাত থেকে বন্দুক গড়িয়ে পড়ল। সায়েব গোঁ গোঁ করে হাত-পা ছড়িয়ে দিল। নিরুপায় অবস্থা, আমি আন্দাজমতো ঘোড়া টিপে দিলাম। ঘোড়া টিপবার পর আর দেখবার অবসর পেলাম না। মনে হল, উপর থেকে এক পেয়ালা জল কে যেন মাথায় ঢেলে দিল। ভাগ্যি গুলীটা ব্যর্থ হয়নি, নইলে কি দশা ঘটত তা বলা যায় না। বাঘ জখম হয়ে লাফিয়ে পড়ল কিলের উপর। হেঁচকা টানে কিলকে মুখে করে বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

রুমাল বের করে তাড়াতাড়ি মাথা আর মুখ মুছে সায়েবকে ধাক্কা দিতে গিয়ে দেখি যে সায়েব বেহুঁশ। পূর্ব নির্দেশ অনুসারে বন্দুকের আওয়াজ শুনেই কিছু পরে সঙ্গীরা হাতী নিয়ে উপস্থিত হল। সায়েবকে হাতীর উপর তুলে দিয়ে বিবিসায়েবের খোঁজ করতেই দেখি সেও বেহুঁশ হয়ে হাত পা ছড়িয়ে মাচানে শুয়ে আছে।

এতক্ষণে মনে হল উপর থেকে এত জল এল কি করে। বিবি-সায়েবের বেহুঁশ দেহ নামাতেই বেশ অনুভব করলাম।

গর্গদেব সিগারেট ধরিয়ে দম নিলেন।

বললেন, এই শেষ নয়।

সকালবেলায় তাঁবুতে ফিরে এসেছি। সায়েবদের খানাপিনার ভালই বন্দোবস্ত হয়েছে। মেমসায়েবরা সঙকোশের হাঁটুজলে নেমে হাতমুখ ধুচ্ছে, জল ছেটাছেটি করছে। সারা রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে আমিও ভেঙে পড়েছিলাম, তবুও বনমোরগ মারবার আশায় দোনালা 'সট' গান নিয়ে বেরিয়েছিলাম। বয়স তখন কম। অর্ধনগ্ন নারীদের জলবিহার দেখবার প্রলোভন জয় করতে না পেরে চুপ করে একটা গাছতলায় বসে পড়লাম।

বসা আর হল না। বিবিসায়েবদের চীৎকারে উঠে দাঁড়াতে হল।

রাত্রের সেই জখমী বাঘ বিদ্যুৎ-বেগে সঙকোশের কিনারা ধরে ছুটে আসছিল। মেমসায়েবরা সেই বাঘের ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে ভয়ে হিমশীতল জলে বুক পর্যন্ত নেমে দাঁড়িয়ে সাহায্যের আশায় আর্তস্বরে

চীৎকার করছে। ডাঙায় বাঘ, জলে দুর্দান্ত স্রোত। উভয়সঙ্কটে বিবিসায়েবদের রক্ষা করবার মতো কেউ নেই। পকেটে হাত দিয়ে দেখি হরিণ মারবার মতো দুটোমাত্র গুলী আছে। তাড়াতাড়ি দুটো নলে দুটো গুলী ভরে নিয়ে গাছের আড়ালে দাঁড়ালাম। বাঘ কাছে আসতেই ভগবানের নাম করে পর পর দুটো ঘোড়ায় দিলাম চাপ। উদ্দেশ্য ছিল দুটো, হয় বাঘ মরবে, না হয় বাধা পেয়ে বাঘ গতি পরিবর্তন করবে। ধোঁয়া সরে গেলে দেখলাম বাঘ মাঝনদীর জলে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে। বাঘের মৃত্যুর কথা সঠিক বলতে পারি না, কিন্তু সেও আমার মতো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আহত অবস্থায় সঙকোশের ভৈরব স্রোতের মুখে পড়ে ভাসতে ভাসতে মহাকালের পথে এগিয়ে চলেছে। বাঘ মরল কি না সে পরের কথা, বিবিরা বাঁচল।

মেমসায়েবরা প্রাণ ফিরে পেল। ভেজা জামা-কাপড়ে উঠে এসেই আমায় ঘিরে ধরল। তখন আমি স্যাভেয়ার।

তিন মাসের মধ্যেই খবর পেলাম আমার প্রমোশন হয়েছে, ডেপুটি থেকে রেন্‌জার হয়েছি।

গল্প শেষ করে গর্গদেব আমার দিকে চেয়ে বললেন, বুঝলে ছোকরা, জখমী বাঘ কেমন সাংঘাতিক চিজ। সেদিন যে সাহস করে আসামী লতার ঝোপে যেতে চাইছিলে!

আপনি বনে থাকেন, বনের মানুষ, আপনি জানেন বেশী।

ডাক্তারবাবু বললেন, তা বলে উনি বনমানুষ নন।

সবাই হাসল। আমি হাসলাম না, শুধু তাকিয়ে দেখলাম।

কাজীসাহেব খোঁচা দিয়ে বলল, কি ভাবছ?

ভাবছি—ভাবছি, এই মানুষই বনে থাকলে বনমানুষ হয়। তাও ভাল, বনমানুষের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবার অধিকার রয়েছে। আমরা বনেই থাকি আর জনপদেই থাকি সর্বত্রই আমাদের পায়ে শেকল বাঁধা।

ডাক্তারবাবু বললেন, স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ নয় বলেই বনমানুষ আর মানুষের পার্থক্য রয়ে গেছে। গুহামানবের যুগে যখন স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ ছিল তখন মানুষ আর বনমানুষে পার্থক্য ছিল না।

কোনো উত্তর দেবার ইচ্ছে ছিল না। ভাবছিলাম, আজকে সেই পার্থক্য আছে কি! পার্থক্যটুকু তো মেকী। মেকী পার্থক্যটুকুকে আমরা সভ্যতার দান মনে করি, তারই বড়াই করি।

গর্গদেব অবসর নিয়েছেন অনেক কাল আগেই। তাঁর শিকার-কাহিনী অনেক শুনেছি, দু-একবার চোখেও দেখেছি।

শিলচর থেকে ফিরবার পথে যখন আলিপুরদুয়ার স্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়াল তখন অতীতের যবনিকা ভেদ করে গর্গদেব, ডাক্তারবাবু, শান্তরাম ভীড় করে মনের দুয়ারে জমা হয়ে গেল। একজনের পর একজন তার কাহিনী নিয়ে সজাগ প্রহরীর মতো যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আলিপুরদুয়ারকে চিনতেই পারছিলাম না। এই আলিপুরদুয়ার আর পুরাতন আলিপুরদুয়ারে অনেক পার্থক্য রয়েছে। মানুষ আর বনমানুষের পার্থক্য এই জমকালো স্টেশনে বসে বেশ ভাল করেই আজ বুঝতে পারছি।

কয়েক ধাপ পরেই রাজাভাতখাওয়া! কোচবিহারের রাজা ভুটানের সাথে যুদ্ধে হেরে গিয়ে পালাতে পালাতে সেখানে এসে ভাত রেঁধে খেয়েছিলেন। সেই থেকে তার নাম রাজাভাতখাওয়া। জানি না এই কিংবদন্তী কতটুকু সত্যি। তাতে কিছু এসে যায় না। রাজাভাতখাওয়া স্টেশনে এসে আমাকে একদিন ভাত খেতে হয়েছিল, সেটা আজও মনে আছে। সেই রাজাভাতখাওয়া স্টেশন আর নেই। শ্যামল বনের কোলে সাদা কপোতীর মতো দুখানা টিনের ঘরের জংশন স্টেশন যেখানে ছিল আজ সেখানে সাজসজ্জায় নবরূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাজাভাতখাওয়া—স্বাধীন দেশের বিলাসমণ্ডিত নতুন স্টেশন।, হয়ত সভ্যতার মাপকাঠিতে অনেক গৌরব তার বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু সে রূপ আর নাই। সেই আলুলায়িত কুন্তলদাম কে যেন অতি সন্তর্পণে সবার অলক্ষ্যে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। শ্যামাঙ্গী ধূসরাঙ্গী হয়েছে।

এখানে মধ্যাহ্নের অবসরে গাড়ির দরজায় মুখ বাড়িয়ে একদিন

ভেবেছিলাম, এমন সুন্দর পৃথ্বীর কোলে মানুষ বন্দিশালা গড়তে একটুও অসোয়াস্তি অনুভব করেনি। সৌন্দর্য দিয়েই বোধ হয় কদর্যতাকে তারা ঢেকে রাখতে চেয়েছিল। প্রকৃতির গৌরব তাতে হানি হয় কি না কে জানে। আজ যান্ত্রিক সভ্যতার পেষণে প্রকৃতি তার সৌন্দর্য হারিয়ে রাজাভাতখাওয়াকে যেন ব্যঙ্গ করছে।

কয়েক ধাপ পরেই জয়ন্তী।

শালের বন ভেঙে লাইন নিস্তব্ধভাবে শুয়ে আছে। সীমান্তের শেষ স্টেশনে এসে নিরানন্দ আর আনন্দের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে একদিন ভাবতে হয়েছিল এ জীবনের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে তো।

তাও পেরেছিলাম। সেদিন স্বপ্ন ছিল, সবার ঘর বেঁধে দেবার; সেদিন স্বপ্ন ছিল, সর্বস্ব দিয়ে অপরের পথচলার কণ্টক উৎপাটন করব। তাই মানিয়ে নিতে পেরেছিলাম। আজকে নিজের ঘরের নেশায় পাগল, আজ হয়ত তা পারতাম না।

সেই দিনগুলো ছিল মন্থর, গতি মনকে আচ্ছন্ন করত না। তবুও গর্গদেব, ডাক্তারবাবু, কাজীসাহেব, বিবিসাহেবাদের স্নেহস্পর্শে দিনাতিপাত করছিলাম। তাকে সার্থক করে তুলতে চেয়েছিল কর্তা। কর্তা পুরুষ নয়, নামও তার কর্তা নয়। ডাক্তারবাবু সমেত গৃহের সকল বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব যার উপর ছিল তিনিই কর্তা, ডাক্তারবাবুর গৃহিণী। রূপ-রাগ-রঙে ভরা যৌবনের দূতী, বনদেশে বনদেবী।

কর্তা স্নেহ করতেন, সেবা করতেন, মুখমিষ্টি না করিয়ে নিষ্কৃতি দিতেন না। একদিন এই বনদেশে আমি ছিলাম 'পারিয়া' যেন অন্ত্যজ। সেই বনদেশে নারীর নারীত্ব আর মাতৃত্ব একীভূত হয়ে আমাকে পাংক্তেয় করে বন্দিত্বের হীনতার অনেক উর্ধ্বে স্থাপন করেছিল কর্তা আর কাজী-পত্নী। পথ-প্রদর্শক ছিলেন বিবিসাহেবা, তাকে সম্পূর্ণতা দান করেছিল কর্তা।

মুক্তির আদেশ পেলাম। সেই মুক্তির দিনটি শুধু স্মরণীয় নয়, বরণীয়।

বিবিসাহেবা সকালে উঠে তাড়াতাড়ি রান্না করে খাইয়ে দিলেন। কপালে চুমু দিয়ে কেঁদে ফেললেন, বললেন, আর বোধ হয় দেখা

হবে না, কিন্তু ভুলে যেও না খোকন সোনা! বনবাসিনী এই মাকে মনে রেখ।

বিবিসাহেবা কথা শেষ করতে পারলেন না। উদ্গত অশ্রু রোধ করবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। আকুলভাবে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

আমার তো সন্তান নেই। আমার মনের বুভুক্ষা কেউ তো মেটাতে পারেনি, ওরে খোকন তুই যে আমার।

পুলিন সেন এসে খবর দিল গাড়ি প্রস্তুত। কোনো রকমে বিবি-সাহেবার পায়ে মাথা রেখে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এলাম।

ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, 'মা'। সন্তানের সব অমঙ্গল নিজের করে নিয়ে যে-মা সন্তানকে সুন্দর মহিমান্বিত করতে চায়, এ সেই মা। ম্যাডোনা নয়, মেরী মাতা নয়, শিল্পীর কল্পনা নয়, পল্লী বাংলার কোনো অখ্যাত পল্লীর অর্ধশিক্ষিতা সন্তানহীনার পুঞ্জীভূত বেদনা যে-নারীর অবয়বে মাতৃত্বের অপূর্ব দীপ্তি ছড়িয়ে দিয়েছে, এ সেই মা। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে এগিয়ে চললাম।

বাস ছাড়বার সময় অনেক ক্ষণ পেরিয়ে গেছে। সামান্য মালপত্র যা ছিল সেপাইরা তা আগেই বাসে পৌঁছে দিয়ে গেছে। বাসের ড্রাইভার আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়িতে উঠে বসলাম।

সামনেই বসে কর্তা।

কোথায় যাচ্ছেন কর্তা। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

তোমার সাথে জয়ন্তী অবধি যাব।

বড় মায়া, না? হেসে তার পাশেই বসলাম।

মায়া, বলে কর্তাও হাসল। এ হাসিতে বিদ্যুতের ঝলক নেই, অন্ধকার রাতের উল্কার মতো ছুটে চলে গেল হাসির রেখা।

ডাক্তারবাবু রাস্তায় দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানাল, নবীন পোস্ট-মাস্টারের চোখে জল। ইশারায় ডাকলেন, জানালা দিয়ে মুখ বের করতেই ফিসফিস করে বললেন, তোমাকে ছাড়তে আমরা চাইনি, ছাড়ছি শুধু তোমায় মুক্ত দেখতে।

কে যেন পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করল।

চেয়ে দেখি শান্তরাম।

শান্তরাম কাঁদছে।

মোক ভুলি না যান। গরীব মানষি লোক সেবাযতন করিবার ন পাং (আমাকে ভুলবেন না, গরীব মানুষ সেবাযত্ন করতে পারিনি)।

হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে শান্তরাম নেমে গেল।

গর্গদেবের আরদালী ছুটে এল ফুলের তোড়া নিয়ে। বনফুলের তোড়া হাতে তুলে দিয়ে বলল, সাহেব ভনছ—

সাহেবের ভনিতা আর শুনবার অবসর হল না। রসহীন শিখ ড্রাইভার মোটরে স্টার্ট দিয়েছে। গাড়িও মোড় ঘুরে চা-বাগানের এলাকা ধরেছে।

তিন বছরের স্মৃতিমাখা বনের কোলে এই ছোট গ্রাম, তাকে ছেড়ে চলতে হল।

বিশ বছর পর আলিপুরদুয়ার আর রাজাভাতখাওয়া পেরিয়ে যাচ্ছি। বিস্মৃতির ঝাপসা দুয়ারে কে যেন আলোকপাত করে ধীরে ধীরে পরিচিত অপরিচিত অনেককেই আমার মনের সামনে তুলে ধরল।

ছেড়ে আসাই সব নয়, ভুলে যাওয়াই চরম লক্ষ্য নয়। পৃথিবী প্রতিক্রিয়াহীন নয়।

কান্তর মা ঠিকই বলেছিল।

থালা বাসন মেজে রেখে কান্তর মা নিত্যকার মতো চলে যাচ্ছিল। ডাকলাম।

কান্তর মা আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, কেনে গো বাহে।

কেন যে ডাকলাম নিজেও জানি না। তবুও বললাম, কোথায় যাচ্ছ?

ঘরত। ছাওপাওকে ভাত দিয়া খায় (বাড়িতে। ছেলে-মেয়েদের ভাত দিতে হবে)।

আমিও তো তোমার ছাও।

কান্তর মা আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে কি যেন ভাবল। প্রৌঢ়া নারী তার সন্তানের রূপ বোধ হয় আমার মাঝে খুঁজে দেখছিল।

তোমরা রাজার বেটা বাহে, বলে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

বিশ-তিরিশ বছর আগে তার কোনো সন্তান তুদিনের জ্বরে মারা গিয়েছিল, সেই শোক তার আজ জেগে উঠল। কাঁদা শেষ করতে তার সময় দরকার হল না। বিনিয়ে বিনিয়ে হঠাৎ যেমন তার কাঁদাকাটি, তেমনি হঠাৎ তার শেষ।

যাবার বেলায় বলে গেল, মনিষ্যির মিরতু শেষ ন হয় বাহে। পরান তায় জিয়াই রাখেন (মৃত্যুই মানুষের শেষ নয়, মানুষের প্রাণ তাকে জীবন্ত রাখে)।

প্রাণের অনুভূতি মানুষকে অমরত্ব দেয়। সেই প্রাণ একক নয়, সমষ্টিগত। সমষ্টির মনে সর্বাংশে ছাপ মারবার মতো ডাইস তৈরির পরিবেশ সৃষ্টি করতে সবাই যদি পারত তাহলে জীবন ধন্য হত। কান্তর মা সেই কথাই বোধ হয় সেদিন বলে গিয়েছিল।

বনের মধ্য দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। সারা রাত্রির পরিশ্রমজনিত শ্রান্তিতে গাড়িখানা যেন আড়িমুরি ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চলেছে। কোথাও তু পাশে সবুজ চা-বাগান, মাঝ দিয়ে পিচের রাস্তা। যেন সবুজ পাছাপাড় শাড়ি পরে ধরণী লজ্জানত যুবতীর মতো অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে রয়েছে। পাহাড়ী রাস্তাগুলো ঢেউ-তোলা টিনের আচ্ছাদন সৃষ্টি করেছে সশঙ্ক যুবতীর লজ্জা নিবারণ করতে।

আমার মনের অবগুণ্ঠন খুলে বিবিসাহেবার অশ্রুসজল মুখখানি, কর্তার ধূমায়িত আঁখিপল্লব ভেসে উঠল।

কর্তা কাঁদেনি। তার সোনার বরণে কে যেন এক পোঁচ আলকাতরা মাখিয়ে দিয়েছিল, কে যেন তার দেহের সব রক্ত শুষে নিয়ে শ্বেতাভ করে দিয়েছিল।

জয়ন্তী। ছোট্ট স্টেশন। একটা ছাউনির তলায় রেলের আপিস, তার সাথেই খোলা মুসাফিরখানা। সেই মুসাফিরখানায় দাঁড়িয়ে কম্পিত হাতখানা আমার হাতের উপর রেখে বলল, খোকন তুমি

যাচ্ছ, যাও। বন্দী মুক্ত হোক, ফিরে পাক তার ঘরদুয়ার। এই তো আমরা চাই। মায়ার সংসার ছাড়তে বড়ই কষ্ট। পরকে আপন করে ভাবতেও কষ্ট, ভাবলে তার পরিণামও কষ্টকর। তুমি যে আমার মনে আপন জনের মতো, মায়ের পেটের ভাইয়ের মতো স্থান গড়ে তুলেছিলে, সে কথা তুমি ভুলে গেলেও আমি কখনো ভুলব না। কিন্তু ভাই, যদিও মহৎ তোমার বৃত্তি, তবুও মনে হয় কৃচ্ছ্রতার মাঝ দিয়ে সেই মহত্তের দোরগোড়াও পৌঁছাতে পারবে না। যদি কখনো স্বাধীনতা আসে, তা আসবে আত্মত্যাগ দিয়ে, আত্মবঞ্চনার মাঝ দিয়ে নয়। যদি বঞ্চনার মাঝ দিয়ে আসে তাহলে সে স্বাধীনতা হবে কুদর্শন। তার রূপ ভীতির সঞ্চার করবে, তুমি আমি সেদিন অবমাননায় মুখ ঢাকতে পথ খুঁজে পাব না। তাই বলছিলাম।

বলুন। আমি শ্রোতা, আপনি বক্তা। বহু বক্তার কথা শুনে আসছি জ্ঞান হওয়া অবধি, সব কিছুই কি মনে রেখাপাত করেছে! ভ্রম পথনির্বাচনে হতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য ভ্রমহীন। উদ্দেশ্যের মহত্ত্বের তলায় পথের বঙ্কিম ভঙ্গী নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, এ বিশ্বাস আমার আছে।

বিশ্বাসের সার্থকতা বিশ্বাসলব্ধ বস্তুর সাফল্যে, সে সার্থকতা মানুষ-জীবনের সাথে আপন করে ভাববার সার্থকতায়। তা ব্যক্তিগত সার্থকতা নয়। সেই সার্থক জীবনের সন্ধান করবার জন্য যদি মত এক না হয়, পথও এক হয় না। মত ভ্রমহীন না হলে পথ ভ্রমহীন হয় না, উদ্দেশ্য তখন কল্পনাবিলাসে পরিণত হয়। সে কল্পনার রাজ্যে তোমার মতো প্রজারা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কৃচ্ছ্রতার মাঝ দিয়ে বাহবা কুড়িয়ে বেড়ায়, বাস্তবত জগতের কোনো কাজই হয় না।

আপনার কথা বুঝলাম না কর্তা। দেশকে ভালবাসা, দেশকে স্বাধীন দেখবার আকাঙ্ক্ষা, এগুলো কি ভ্রম?

মোটেই নয়। ভ্রম তোমাদের কার্যপদ্ধতি। যেদিন সত্যিই স্বাধীনতা আসবে সেদিন চেয়ে দেখবে অপরিণত বুদ্ধির বোঝা বইতে যে ভুল তোমরা করে গেছ, তার মাসুল দিতে সবহারা হতে হয়েছে। সে স্বাধীনতা তোমার আমার নয়, যাদের, তারা তোমার আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তুমি আমি বুঝতেও পারব না ওরা কারা এবং

কোথা থেকে এল। অনাদরে ষষ্ঠীর মতো তুমি আমি ষষ্ঠীর বাছা হয়ে থাকব, ভোগের কেন্দ্র আমার তোমার চোখের সামনে অপরে গড়ে তুলবে।

টিফিন-কেরিয়ার থেকে খাবার বের করতে করতে আবার বলল, তোমাকে খাইয়েও সুখ নেই। কাল অনেক রাত অবধি বসে বসে রেঁধেছি আর ভেবেছি, তুমি যদি পেটুকরাম হতে তাহলে খাইয়ে সুখ পেতাম। জান তো, আমাদের দেশে মেয়েরা খেয়ে সুখ পায় না, খাইয়ে সুখ পায়। আমাদের দেশে পথে ঘাটে মা-বোন পাবে, খেতে না শিখলে তাদের খুশী করতে পারবে না।

খাবারের দিকে আমার লক্ষ্য ছিল না। আমি ভাবছিলাম কর্তার কথা। আমার উদাসীনতা দেখে কর্তা জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছ খোকন ?

আপনার কথাগুলো।

আমার কথা। এই না বললে অনেক বক্তৃতা শুনেছ, সব কিছুই কি মনে রেখাপাত করে !

সব না করলেও কিছু কিছু করে বইকি। আচ্ছা কর্তা, আপনি তো খুব স্বাধীন, যেমন ইচ্ছে হল অমনি আমার সাথে তিরিশ মাইল পথ পেরিয়ে এলেন। এতে কি আপনি খুশী।

অন্য কেউ হলে খুশী হত। আমি খুশী হইনি। তোমার সাথে আসাটা স্বাধীনতা নয়, ডাক্তারবাবুর প্রবল বিশ্বাস। এই বিশ্বাস সৃষ্টি করেছি স্নেহ ভালবাসা দিয়ে, তাকে আপন করে ভেবেছি বলে। তবু গাড়ির ভাড়াটা তার কাছেই নিতে হয়েছে। এই বিশ্বাসজনিত স্বাধীনতার তলায় রয়ে গেছে পরমুখাপেক্ষিতা, সেই পরমুখাপেক্ষিতাই স্বাধীন হবার পথে প্রথম অন্তরায়। মানুষ অপরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে নিজেকে স্বাধীনভাবে চালাবার ক্ষমতা হারিয়ে। নিজেকে চালাবার উপযুক্ত অর্থ তার নেই, থাকলেও অধিকার নেই ব্যয় করবার। অর্থই মানুষকে প্রকৃত স্বাধীনতা পেতে সাহায্য করে। সেই অর্থকে যোগ্য বন্টনের ধারায় যারা আনতে চায় বা পারে তারাই স্বাধীনতার সত্য পূজারী। বাকি যারা তারা হয় মূর্খ, নয় ভণ্ড।

কর্তা আমার দুই হাত জড়িয়ে ধরে বলল, আজ আমার আর তোমার মাঝে কেউ নেই, অন্তরীক্ষে হয়ত ভগবান বসে আছেন। আজকে শপথ কর, নিজেকে গঠন না করে এমনি ধারা কৃচ্ছ্রতার মাঝে নিজেকে ঠেলে দেবে না। অপরের যদি কিছু বাস্তব উন্নয়ন চাও, তাহলে নিজের বাস্তব দিকটা লক্ষ্য রাখতে হয়। ঝাণ্ডা কাঁধে করে মূর্খতার পরিচয় আর দিও না। শপথ কর খোকন।

সামনে হিমালয় শ্যামল বনানীর পশ্চাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে, আমার পশ্চাতে বনের রেখা। প্লাটফরমের কোণায় কাঠের বেঞ্চে বসে আমি আর কর্তা। কেউ নেই, অদৃশ্য ভগবান অন্তরালে ভ্রূকুটি করছেন বোধ হয়। আমি তাড়াতাড়ি টিপ করে একটা প্রণাম করে বললাম, তাই হবে কর্তা।

তা হয়নি, নিজেকে গঠন করতে পারিনি। ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টার উপদেশ ও অনুরোধ রক্ষা করতে পারিনি কিন্তু অনাদরে ষষ্ঠীর মূর্খ বকের মতো শোষণকারীকে সজ্ঞানে দেখছি, সহ্য করছি।

কেন হয়নি, তাও ভেবেছি। বিবিসাহেবার চোখের জল আর আমাকে স্নেহের ডোরে আটকে রাখতে পারেনি, প্রতিশ্রুতিমতো নিজেকে গড়তে পারিনি, শপথ রক্ষা হয়নি। তাদের ছেড়ে এলেও, ছাড়তে পারিনি নিজের বাস্তব চিন্তার ক্ষেত্রকে, কেনবা যেন নেশায় মাতাল হয়ে কাটিয়ে দিয়েছি প্রথম জীবনটা।

বিশ বছর, তবুও মনে হয় এই সেদিনের কথা। এখনো তাদের যেন চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি।

একদিনকার কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে।

দুখানা গরুর গাড়ি এসে ডাক্তারখানার দরজায় দাঁড়িয়েছে।

একখানায় দুটি পাহাড়ীর মৃতদেহ, অপরখানায় বিরাটাকার একটি ব্যাঘ্রনন্দনের মৃতদেহ। সঙ্গে এসেছে একজন পাহাড়ী রমণী।

ঘটনা সংক্ষিপ্তাকারে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

পাহাড়ীরা টিলার উপর খাটাল বেঁধে গরু মোষ পালন করে।

মাখন বিক্রি ওদের মূল জীবিকা। এরকম খাটাল তরাই আর হুয়ারের বনে প্রচুর রয়েছে। চা-বাগানের হাটে এরা মাখন বিক্রি করতে আসে হাটবারে, সেখান থেকে চালান যায় শহরে নগরে।

পাহাড়ী হুই ভাই। গভীর বনে পাহাড়ের টিলায় খাটাল।

বাবা আদম তো একা নয়, ইভও ছিল সাথে, তাই তো আমরা তার সন্তান।

হুই ভাইয়ের একটি মাত্র ইভ, ঐ রমণী। ঝুপরি বেঁধে দ্বিপতি নিয়ে সুখেই সংসার করছিল। কাল রাত অবধি কোনো হাঙ্গামাই হয়নি তাদের জীবনে।

মাঝরাতে খাটালের গরু দাপাদাপি করতেই তিন জনের ঘুম ভেঙে গেল।

কেরোসিন তেলের কুপি হাতে নিয়ে তিন জনে বের হল। সামনে বড় ভাই, তৎপর কনিষ্ঠ, শেষে যৌথ গৃহিণী। গৃহিণীর হাতে তেলের কুপি।

খাটালের দরজা খুলে প্রবেশ করল জ্যেষ্ঠ, ফিরে এল আর্তনাদ। কনিষ্ঠ উৎসুকভাবে এগিয়ে আসতেই এগিয়ে এল মৃত্যুদূত। তেলের কুপির কম্পিত শিখায় মৃত্যুদূতের ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে গৃহিণী কোনো রকমে বাঁশের ঝাঁপটা বন্ধ করে চোঁচা দৌড় দিল। মরণের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল তার ফিফটি পারসেন্টের অংশীদারদের।

ছুটতে ছুটতে একেবারে স্বজাতীয় বনরক্ষকদের দরজায় হাজির। অনেক ডাকাডাকিতে বনরক্ষকের নিদ্রাভঙ্গ হল কিন্তু বাঘ তাড়াবার হাতিয়ারের বড় অভাব। বন্দুক আছে, না থাকবার উপায় নাই, কেননা সরকারের সম্পত্তি। গুলী আছে মাত্র একটি। অবশ্য হরিণ চুরি করে চা-বাগানের হাটে মাংস বিক্রি করা ওদের স্বভাব। তাই গুলীর সদ্ব্যবহার প্রায়ই করে, হিসাব দেবার বেলায় সরকারকে জানায় হাতী খেদাতে খরচ হয়ে গেছে। কর্মকর্তারাও অংশীদার, তাই হিসাব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

একটি গুলীকে ভরসা করে বাঘ মারতে যাওয়া আর নিজের গলায় ফাঁসির দড়ি তুলে দেওয়া একই কথা। তবুও পাহাড়ী দাজু বন্দুক

নিয়ে বের হল। অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে উঠল গিয়ে খাটালের চালে। খড় সরিয়ে বাঘের মাথা তাক করে রামজির নামে দিল গুলী ছেড়ে। বাস্। সাথে সাথে নিজেও গড়িয়ে পড়ল চাল থেকে। ছ ফুট উঁচু চাল থেকে ঝোপ, ঝোপ থেকে বাদাড়, বাদাড় থেকে যৌথ গৃহিণী টানতে টানতে তাকে নিয়ে এল তার ঝুপরিতে।

সকালবেলায় দুজনে সাহসে ভর করে আবার বের হল। গিয়ে দেখে চারটি মৃতদেহ পাশাপাশি মড়িঘরের মড়ার মতো অসাড়ে পড়ে রয়েছে। চতুর্থ দেহ গো-বৎসের, সেটি আর আনা হয়নি।

অত বড় বাঘ আমি কখনো দেখিনি। ডোরাকাটা রয়েল শ্রেণীর বাঘ ডুয়ার্সের জঙ্গলে বিশেষ দেখা যায় না, তাই বাঘ দেখতে ভিড়ও হয়েছে। নানা জনে নানা প্রশ্নও করছে, উত্তর দেবার দুটি মালিক তখন উত্তরের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

বিংশ শতাব্দীর দ্রৌপদীকে কয়েক বার তাকিয়ে দেখেও পরিতৃপ্তি হচ্ছিল না।

এক সময় ফিরে এসে কর্তাকে ঘটনাটা বললাম। কর্তা তখন ডাক্তারবাবুর গরম মোজা তৈরি করছিল। আমার কথা শুনে হাসল।

জিজ্ঞাসা করলাম, হাসছেন যে বড় ?

তোমার কাছে আশ্চর্য মনে হচ্ছে, তাই না !

তা তো বটেই। এ সমাজে তো আমরা বাস করি না।

করি না, তবে করতাম।

করতাম !

তা নইলে দ্রৌপদীর সৃষ্টি হল কি করে, কুন্তীর সন্তান এল কোথা থেকে।

ওসব মহাভারতের কবির কল্পনা।

কল্পনা নয়, সেকালের ভদ্রসমাজের সামান্য চিত্র। মানুষের সমাজ চিরকাল তো এমন ছিল না। এমন দিন ছিল যেদিন মানুষ ঐভাবেই জীবন কাটিয়ে এসেছে। আজ নয়, হয়ত লক্ষ লক্ষ বছর আগে। আমরা সেই মানুষেরই সন্তান। রুচির ভেদ ঘটেছে, তাই আজ মনে হয় ওগুলো অসভ্য ব্যবস্থা। তা নয়, সমাজ তৈরী হয়েছিল

মানুষের প্রয়োজন মেটাতে; সেই প্রয়োজন মেটাবার মতো উপাদান আজ কিছু রয়েছে, তাই আমরা সভ্য। যাদের আজও সেই উপাদান সংগ্রহের সামর্থ্য নেই, তারা আমাদের সেই পুরাতন বাপমায়ের মতোই জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়, তাই তাদের অসভ্য মনে করে নাক সিটকাই।

কর্তার কথাগুলো মনের ভেতর কেমন আঁচড় কেটে বসল। কর্তা এত শিখল কোথা থেকে। অনেক দিন বসে বসে কর্তার অনেক কথা ভেবেছি, কোথাও কোনো কিনারা করতে পারিনি। কর্তার পাণ্ডিত্যের কাছে আমি কত ছোট তা ভেবেই পেতাম না। শ্রদ্ধার মাপকাঠিতে কর্তাকে অনেক উঁচুতে বসিয়ে রেখেছিলাম।

যেদিন চা-বাগানের কুলী-যুবতী মজু-র কাহিনী এসে বললাম, সেদিনও কর্তা হেসেছিল। বলেছিল, দারিদ্র্য আমাদের দেশে অভিশাপ, দারিদ্র্য মানুষকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে, দারিদ্র্য পেষণকে কায়েম করে, শক্তিশালী অর্থবানকে ভোগের পথ খুলে দেয়। প্রতিকার?—অসম্ভব। যুগযুগান্ত থেকে মানুষ সহ্য করে আসছে। এখন এগুলোকে প্রাপ্য মনে করে, ভগবানের দান মনে করে। ভগবান তাদের সত্তাকে শক্তিশালী অর্থবানের পায়ের তলায় লুটিয়ে দেবার নির্দেশ দেয়। এইটুকু ওদের সান্ত্বনা।

সারা রাত বসে বসে ভেবেছিলাম, কর্তা যেন মানুষের জীবনকে তুলে ধরেছে। এই বিশ্লেষণকে অস্বীকার করতে পারতাম না!

বিশ বছর! দেখতে দেখতে বিশটা বছর গড়িয়ে গেছে। তবুও সবাইকে যেন স্মরণ করতে পারছি। ছন্নছাড়া জীবনে ভুলে যাওয়াটাই বোধ হয় ছিল পরিতৃপ্তি, সেই পরিতৃপ্তি থেকেও বঞ্চিত হয়েছি।

রাজভাতখাওয়া পেরিয়ে গেল।

গাড়ি চলছে, চলছে তার নিরূপিত গতিতে, মনের ও দেহের সাথে কোনো সমতা না রেখেই সে চলেছে। চলতে চলতে তার পথ ফুরিয়ে যাবে, যাত্রীর যাত্রার বিরতি হয়ত হবে না। যাত্রীর যাত্রাও অখণ্ড নয়, খণ্ড খণ্ড বিশ্বদর্শনের এক একটি ক্ষুদ্র অধ্যায়, হয়ত অনুপ্রমাণ, তবুও সেই অধ্যায় ভালবাসা-আশা, ঘৃণা-নিরাশা, হাসি-আনন্দ,

কান্না-নিরানন্দ সব কিছু দিয়ে জগাখিচুড়ি হয়ে আছে, সে সবগুলো এক সুতোর টানায় বেঁধে রাখতে পারলে আরও কত জানবার কথা থেকে যেত। বিরাট পৃথিবীর একাংশের এই ক্ষুদ্র অধ্যায়গুলো আপনা থেকে ফলে ফুলে পল্লবিত-মঞ্জুরিত হয়ে আপনাতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। যাত্রীর যাত্রার আর হিসাব হচ্ছে না।

একদিন মেদিসাহেবকে বলেছিলাম, কিছু সুকাজ করুন!

আমার কথা মেদিসাহেব ভোলেনি। একদিন দুপুরবেলায় মেদিসাহেব এসে বলল, চল খোকন সুকাজ করে আসি।

কি কাজ না জেনে কোনো মত দিতে পারি না। তাই উৎসুকভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

কৈ, ওঠ। দেরি করছ কেন?

কি কাজ? কোথায় যাব? যাবার অধিকার আছে কি না?—এসব বলুন।

মেদিসাহেব হাসল। উত্তরবঙ্গের এমন জেলায় তার বাড়ি, যেখানে তার স্বজাতীয়-সংখ্যা বাংলার যে কোনো জেলার চেয়ে বেশী। সেই কারণেই রুচিগতভাবে বাঙালী হলেও ব্যক্তিগতভাবে বৃহৎ কোনো চিন্তাধারা তার ছিল না। সুকাজ মেদিসাহেব করতে পারে কিন্তু তার গণ্ডি স্বজাতীয়দের মধ্যে। তাই প্রশ্নগুলো এক সাথে ছুড়ে মারতে হল।

মেদিসাহেব বলল, যেতে হবে দলদলির হাটে। সেখানে কলেরা শুরু হয়েছে, কলেরার টিকা দিতে হবে।

তার জন্য ডাক্তার দরকার, বেকার বন্দীর কোনো দরকার আছে কি?

বন্দীর দরকার নেই, তবুও বেড়িয়ে আসতে পারবে তো। আমার সাথে যাবে, সাথে যাবে কাজীসাব, ডাক্তারবাবু। তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও, তসিলের হাতী আসছে।

সেকালের রাজারা হাতীর পিঠে হাওদা এঁটে রাজকীয় গৌরব জাহির করতেন। সে কালে তা সম্ভব ছিল। রাজাদের অনেক দাস-

দাসী ছিল, গায়ে পিঠে গরম তেল মাখাবার লোকের অভাব হত না। আমার তোমার মতো লোকের হাতী চড়া যে কত বড় মূর্খতা, তা বেশ বুঝলাম। সত্যিই হাতী রাজার উপযুক্ত বাহন। গরীব যদি বিনা-মূল্যেও হাতীর সোয়ারী হবার সৌভাগ্য লাভ করে, তা যেন সে গ্রহণ না করে। উঃ বাব্বাঃ, শরীরের কয়েক শত অস্থি এক সাথে কোরাসে মড়মড় করে উঠছিল।

মেদিসাহেবকে রাস্তায় বললাম, আমি হেঁটে যাব।

মেদিসাহেব অবাক হয়ে বলল, কেন ?

ঝাঁকুনি সহ্য হচ্ছে না, তার চেয়ে পেছন পেছন হেঁটে যাব।

আমার যুক্তি এবং বাস্তব অবস্থা সঙ্গীদের একজনও স্বীকার করল না। ফল হাতে হাতে পেলাম। টানা তিনটে দিন গায়ের ব্যথায় বিছানা থেকে উঠতে পারিনি।

খবর পেয়ে মেদিসাহেব দেখা করে গেছে। ঠাট্টা করে বলে গেছে, খোকন সুকাজ করতে হলে কষ্ট করতে হয়, বুঝলে।

ভাল করেই বুঝেছি মেদিসাহেব।

মেদিসাহেব হেসে ফিরে গেছে। কিন্তু খবর পেয়ে কর্তা ছুটে এসেছিল, রাত জেগে বিবিসাহেবা সেঁক তাপ করেছেন। তাদের দয়াতে আপ্লুত হয়ে গেছি।

মেদিসাহেবের মেয়ে হাসিনা। মেদিসাহেব তহসিলদার। তার মেয়ে হাসিনা বনদেশের অভিজাত, কলকাতায় মামার বাড়িতে থেকে পড়ে, স্কুলের পড়া শেষ করবার শেষ বছর। মাঝে মাঝে ছুটি পেলে বাবা-মায়ের কাছে আসে। শুনেছিলাম, সে যেমন মেধাবী, তেমনি রূপসী। এই রূপগুণবতীকে দেখবার একটা অকৃত্রিম আশা মাঝে মাঝে মনে জেগে উঠত। বিগত দুই বছরে বহুবার শুনেছি হাসিনা এসেছে। কোনো দিন তাকে চোখে দেখিনি। সে খাস ও খাঁটি মুসলমান। সালোয়ার পরে, ওড়না দিয়ে আবরু রাখে, বাবাকে ডাকে আব্বা, মাকে ডাকে আম্মাজান। শুনেছিলাম আল্লার প্রতিশব্দ 'god' লিখতে তার বড়ই আপত্তি। আল্লার প্রতিশব্দ না কি দুনিয়াতে

নেই। সব কাজের আগে বলে খোদাহাফেজ, না হয় ইনশাল্লা। কিন্তু পর্দা প্রথার সে ঘোরতর বিরোধী।

হাসিনার কথা শুনে শুনে অর্থহীন কৌতূহল জেগেছে তাকে দেখবার। যখন শুনতাম হাসিনা এসেছে তখন বিকেলের অনেকটা সময় থানার বারান্দায় বসে থাকতাম। যদি কোনো সময় এধারে বেড়াতে আসে তাহলে চোখের দেখাও তো হবে। কিন্তু থানার আবহাওয়া এমনই ভীতিজনক যে সাধারণ কুলীকামিনরাও থানার পাশ দিয়ে যেতে সাহস পেত না।

কাজীসাহেব আসবার পর স্থানীয় আবহাওয়ার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছিল। বিবিসাহেবার পর্দার বালাই ছিল না, তিনি এসেই মেদি-সাহেবের বিবিকে টেনে আনলেন তাঁর বাসায়। কর্তাও এসে জুটত। এইভাবে মোটামুটি একটা মহিলা মহল গড়ে উঠেছিল।

নিত্যকার মতো কাজীসাহেবের বাসায় খেতে গেছি। বৈঠকখানার প্রবেশ-পথে সালোয়ার পরিহিতা মহিলাকে দেখে সহজেই অনুমান করে নিলাম, এই হাসিনা। সপ্তদশী হাসিনাকে এই প্রথম দেখলাম। রূপ যাকে বলে তা তার নেই, সাজ রয়েছে, গরব রয়েছে, রয়েছে গোলাপী দেহাবরণ।

আমি থমকে দাঁড়ালাম।

সে-ই বলল, দাঁড়ালেন কেন, ভেতরে যান।

এই সামান্য পরিচয়। ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ ছিল, গ্রহণ করিনি। নইলে পরের দিন বিবিসাহেবা যখন বললেন, হাসিনা বলছিল তার ইংরেজী পড়বার অসুবিধা হচ্ছে। আমি বললাম, আমার খোকন সোনা রয়েছে, তার কাছে পড়ে নিলেই পার। পড়াবে বাবা?

অবাক হয়ে বললাম, আমার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় আপনি তো জানেন, সে বিদ্যা দিয়ে পড়ান সম্ভব নয়। তবে আপনি হুকুম করলে পড়াতে বাধ্য হব।

বিবিসাহেবা কিছু না বলে পাশের ঘর থেকে হাসিনাকে ডেকে আনলেন, বললেন, তোমরা ঠিক কর। আমি তো মুখ্যু মেয়েমানুষ, পড়াশোনার আমি কি বুঝি।

আমি মাথা নীচু করে বললাম, আমার ইচ্ছে থাকলেও ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। এতে আপনার খুব উপকার হবে না।

বিবিসাহেবা আমার কথা অস্বীকার করেননি, কিন্তু হাসিনা ক্ষুণ্ণ হল। বলল, অনিচ্ছা জানাবার অনেক রকম পথই খোলা থাকে।

বলেই সে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন বিবিসাহেবার মুখে শুনলাম, পড়বার অসুবিধা বলে হাসিনা কলকাতায় ফিরে যাবে। শুনে মনে মনে দুঃখিত হলাম। তাকে সাধ্যমতো সাহায্য নিশ্চয়ই করতে পারতাম, কিন্তু তা না করবার দরুন ছুটির মাসেও সে বাবা-মায়ের কাছে থাকতে পেল না। মনক্ষুণ্ণ হলাম, তবুও কেমন সুপ্ত জিঘাংসা আমার মনে জেগে উঠল। স্নেহের পরিবেশ থেকে আমায় বিচ্ছিন্ন করে আনতে তো কেউ দয়া বোধ করেনি! আমি যদি সহ্য করে থাকি, তাহলে সে-ই বা তা করবে না কেন!

তবুও মনে শান্তি পাচ্ছিলাম না। নিজের অজ্ঞাতে অচিন্তনীয় কর্ম করে ফেললাম। বিকেলবেলায় মেদিসাহেবের দোতালা বাংলোয় এসে উঠলাম।

মেরিনা হাসিনার বোন। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। ঢোলা পাজামা আর কামিজ গায়ে। বাংলোর মাঠে ছুটে বেড়াচ্ছিল। তাকে ডাকলাম। বললাম, হাসিনা বেগম আছেন?

আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, কেন? ডেকে দেব? ও বুবু, ও বুবু।

বিশেষ ডাকতে হল না। বোধ হয় আমায় দেখতে পেয়েছিল। সে মন্থর গতিতে আমার সামনে এসে বলল, হাসিনাকে চাই!

মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলাম না। অনেক ক্ষণ মাথা নীচু করে থেকে আমতা আমতা করে বললাম, শুনলাম আপনি চলে যাচ্ছেন।

তাই ফেয়ারওয়েল দিতে এসেছেন বুঝি!

ত্রেতাযুগ হলে প্রার্থনা করতাম মেদিনী দ্বিধা হও। এই অবমাননার প্রত্যুত্তর দেবার মতো সব ক্ষমতা আমার লোপ পেয়ে গেল। নীরবে ফিরে চললাম। হাসিনা আবার বলল, এত তাড়াতাড়ি কেন? কোনো কাজ আছে কি?

যেমন চলছিলাম, তেমনি চলতে চলতে মরণ কামনা করছিলাম। আকাশ থেকে বজ্রপাত হলেই বোধ হয় রক্ষা পেতাম। তারপর হাসিনা কি বলল শুনতে পাইনি, শুধু একটা হাসির রেশ কানে এসে ধাক্কা দিয়ে দেহ এবং মনকে পঙ্গু করে দিলে।

ছুটে এসে নিজের খুপরিতে মাদুর পেতে শুয়ে পড়লাম। বিবি-সাহেবা দূর থেকে আমায় শুয়ে থাকতে দেখে ছুটে এলেন। পাশে বসে কপালে হাত দিয়ে বললেন, তোমার শরীর বুঝি ভাল নেই খোকন।

না মা, শরীর ভালই আছে, মন ভাল নেই।

বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে বুঝি?

বাড়ি। হৃদয়হীনের চোখ দিয়েও জলের ধারা নামল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বিবিসাহেবা বললেন, এই তো আমি তোমার মা, তোমার পাশে বসে রয়েছি, আমার কোলে মাথা রেখে সব ভুলে যাও মানিক।

নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে না, কিন্তু মা যদি আপনার মতো হত, তাহলে যাদের মা আছে তারা কত ভাগ্যবান। আচ্ছা মা,—

বিবিসাহেব উৎকর্ণ হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেন মানিক?

জান মা, হাসিনা কলকাতায় ফিরে যাচ্ছে, তাই তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

বিবিসাহেবা গম্ভীর হয়ে বলল, ভুল করেছ খোকন।

এখন বুঝছি ভুলই হয়ে গেছে। সে আমায় অপমান করল।

বিবিসাহেবা গুম হয়ে বসে রইলেন। আমি সব কথাই তাঁকে বললাম। আমার কথা শেষ হতেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ওসব নিয়ে মন খারাপ করতে হয় না খোকন। তার চেয়ে উঠে এস, দেখবে কেমন সুন্দর একটা টিয়া কিনেছি। তোমার চন্দনারা ধর্মঘট করে খাওয়া বন্ধ করেছে, তাদের নিজের হাতে খাইয়ে দেবে এস।

বিবিসাহেবা বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ বাদে কাজীসাহেবের বৈঠকখানায় উপস্থিত হতেই বিবি-সাহেবার গলার শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। এ যেন সে কণ্ঠস্বর নয়। যে কণ্ঠস্বর মাতৃত্বের রসে আমায় স্নেহ জানায়, যে কণ্ঠস্বর মানুষকে

গোলাম তৈরি করে স্নেহের বাঁধনে, এ সে কণ্ঠস্বর নয়। এমন তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর কখনো শুনি নাই।

বিবিসাহেবা বলছিলেন, ভাল কর নাই হাসিনা।

বুঝলাম ক্ষুব্ধ মাতৃত্ব বিদ্রোহ করেছে। কান পেতে রইলাম বিবিসাহেবার কথা শুনতে।

বিবিসাহেবা জোর দিয়ে বললেন, মানুষের অবমাননা আল্লাহ-তালাও সহ্য করেন না। কোলের শিশুকে ছিনিয়ে এনে গহন বনে যারা আটকে রেখেছে তাদের নির্ম্মমতার চেয়েও তোমার নির্ম্মমতা বেশী। একথা বুঝবার বয়স ও জ্ঞান তোমার নিশ্চয়ই হয়েছে। অসহায়কে আঘাত দিয়ে কেউ সুখী হয় না। বুঝলে!

হাসিনা প্রতিবাদের সুরে কি বলল শোনা গেল না কিন্তু বিবি-সাহেবা ক্ষিপ্তের মতো বলে উঠলেন, মানুষকে জাত দিয়ে বিচার করা মূর্খতা, কাজ দিয়ে মানুষকে বিচার করতে হয়। খোকন আমার পেটের সন্তান নয়, এমন কি সে মুসলমানও নয় কিন্তু সে আমার সন্তানের চেয়ে কোনো অংশে ছোট নয়। তাকে অপমান করলে আমি অপমানিত বোধ করি। মানুষের সাথে যদি হৃদয়ধর্ম্মের বিনিময় না করতে পার তাহলে জানবে তোমার শিক্ষা নিষ্ফল হয়ে গেছে।

আমি সন্তর্পণে উঠে এসে থানার বারান্দায় বসলাম।

হাসিনা কলকাতায় ফিরে গেছে। তার সংবাদ জানবার আগ্রহ আর ছিল না। কেমন একটা বিতৃষ্ণা জন্মেছিল। সে যাবার পর কাজীসাহেবের ভুটিয়া ঘোড়ায় চেপে সেপাইদের সাথে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতাম। ফিরে এসে বিবিসাহেবার কাছে বকুনি খেতাম। তিনি ভয় দেখাতেন, কোনো দিন হয়ত ভালুকের হাতে মারা পড়ব। আমি হাসতাম, উত্তর দিতাম না।

জুন মাস।

অশ্রান্ত বৃষ্টি। বের হবার কোনো উপায় নেই।

থানার বারান্দায় বসেছিলাম। নটমাস্টার ক্ষেপ-জাল নিয়ে পাহাড়ী সোঁতায় মাছ ধরতে যাচ্ছিল। আমি বারান্দায় বসে বসে

বৃষ্টির রূপ ও লক্ষণগুলো মনে মনে বিশ্লেষণ করছিলাম। নটমাস্টারকে যেতে দেখে ডাকলাম। ছাতা মাথায় দিয়ে গুটি গুটি থানার বারান্দায় উঠে মেঝেতে এক পাশে জাল রেখে আমার পাশে বসল।

এই দুর্যোগে মাছ মারতে চলেছেন যে বড় ?

নটমাস্টার পাকা স্পোর্টসম্যান। সে বলল, মাছ পাওয়াটা বড় কথা নয়। পাবার চেষ্টাতেই আনন্দ, সেই আনন্দ পাবার তাগিদও কম নয়।

একটু জল ধরুক, তার পর যাবেন। যেভাবে ম্যালেরিয়া হচ্ছে তাতে বৃষ্টিতে ভেজা ভাল হবে কি !

এখন আর কি ম্যালেরিয়া দেখছেন। দশ বছর আগে জুন থেকে নভেম্বর অবধি ঘরে ঘরে দল বেঁধে বিছানা নিত। মুখে জল দেবার কেউ থাকত না। এত ওষুধ ছিল না, ডাক্তারের নামই জানত না লোকে। এই দেখুন না, মেদিসাহেবের মেয়ে, এই যে অত বড় মেয়ে, ক'দিন হল এসেই জ্বরে পড়েছে। ডুয়ার্সের জ্বর একেই বলে। আজ তিন দিন তো বেহুঁশ। কালকে চা-বাগান থেকে তিনজন ডাক্তার এসেছিল। সবাই বলেছে ব্ল্যাকওয়াটার। আগের দিনে ব্ল্যাকওয়াটার হলেই যমদূতের ডাণ্ডা দেখে ঠাণ্ডা হতে হত। আর আজকাল কত চিকিৎসার ব্যবস্থা। ওকি, অমন চমকে উঠলেন কেন ?

না, কিছু না। শরীরটা ক'দিন থেকে ভাল যাচ্ছে না।

জ্বর নয় তো। নটমাস্টার কপালে হাত দিয়ে তাপ অনুভব করল।

না জ্বর নয়। একটু শরীর খারাপ হলেই কুইনিন খাবেন। শরীর ভাল থাকলেও সপ্তাহে একটা করে বড়ি খাবেন। যাক বৃষ্টিটা ধরেছে, এবার যাই, কেমন !

নটমাস্টার জাল ঘাড়ে করে বেরিয়ে গেল। যে উৎসাহ নিয়ে তাকে ডেকেছিলাম, সে উৎসাহ আর নেই। নইলে আরও কিছুক্ষণ গল্পগুজব করা যেত। হাসিনার রোগপাণ্ডুর মুখখানা অজান্তে আমার কল্পনার চোখে ভেসে উঠল।

মনের সাথে দ্বন্দ্ব মিটিয়ে বৃষ্টি থামতেই মেদিসাহেবের বাংলোয় গিয়ে উঠলাম। মেদিসাহেব বারান্দায় বসে আফিসের কাজকর্ম করছিলেন।

বসতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বৃষ্টিকাদা ভেঙে হঠাৎ ?

শুনলাম—, কথা সম্পূর্ণ করতে কেমন লজ্জা বোধ করলাম।

কি শুনলে ?

শুনলাম আপনার মেয়ের খুব অসুখ।

অসুখ, ওরকম অসুখ ডুয়ার্সে থাকলে সব সময়ই হয়। তবে টার্নটা একটু খারাপ নিয়েছে। দেখতে এসেছ বুঝি। চল, দেখে আসবে।

তার পেছন পেছন কাঠের দোতলায় উঠে এলাম। মেদিসাহেবের চেহারায় বিশেষ পরিবর্তন দেখলাম না, শুধু তার কণ্ঠস্বর দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে হল।

শোবার ঘরের মাঝখানটায় মশারি টাঙিয়ে হাসিনাকে শোয়ান হয়েছে। মাথার কাছে টেবিলে ওষুধের কয়েক গণ্ডা শিশি। তার মুখখানা দেখা যাচ্ছিল, পা থেকে গলা অবধি লেপ দিয়ে ঢাকা।

মশারি তুলে মেদিসাহেব ডাকল, হাসিনা, এই দেখ কে এসেছে।

হাসিনা একবার চেয়ে দেখল। তারপর ঝিমিয়ে গেল। তার চোখ দুটো উদ্‌ভ্রান্তের মতো রাঙাজবা, ঠোঁট দুটো শুকিয়ে গেছে। ক'দিনের জ্বর মুখে নিরাশার ছাপ এঁকে দিয়েছে।

আমি ডাকলাম, মিস হাসিনা বেগম।

আমার কণ্ঠস্বরের মৃদুতা তার কানে পৌঁছাল কি না কে জানে, সে পাশ ফিরে শুয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলল।

মেদিসাহেবের সাথে সন্তর্পণে বেরিয়ে এলাম।

নীচে এসে মেদিসাহেব জিজ্ঞাসা করল, কেমন বুঝলে ?

আমি কিছুই বুঝি নাই, তবুও বললাম, ভাল হয়ে যাবে।

ভাল হলেই ভাল, মা-হারা মেয়ে।

মা-হারা !

হাঁ। ওর যখন বয়স সাতদিন তখন ওর মা মারা গেছে। তারপর মেরিনার মাকে বিয়ে করেছিলাম। মেরিনার মা ওকে বড় করেছে, তাই সাধারণ দৃষ্টিতে কেউ বুঝতে পারে না সত্যিই মেরিনার মা ওর মা নয়।

ভাল হলেই ভাল। বলে আসলাম ঠিকই কিন্তু হাসিনা আর ভাল

হল না। ক'দিন পরে অনেক রাতে সোরগোলে ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমন্ত চোখ, অসাড় কর্ণপট, তার মাঝে এসে বাজল সেপাইদের কথা। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। মেদিসাহেবের মেয়ের অবস্থা খারাপ।

ছুটে গেলাম বিবিসাহেবার কাছে। তাঁকে সাথে করে চললাম হাসিনাকে দেখতে।

লণ্ঠনের আলোতে শুধু দেখা গেল তার ঠোঁটের স্পন্দন, কি যেন বলতে চেয়েও বলতে পারছে না। মেদিসাহেব মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে দোয়া ভিক্ষা করছে ঈশ্বরের দরবারে। মেরিনার মায়ের চোখে অজস্র ধারে অশ্রু বয়ে যাচ্ছে। এই শোকবিহ্বল পরিবেশে এসে আমিও আত্মহারা হয়ে পড়লাম। বিবিসাহেবা রুমালে চোখ মুছলেন। কর্তা বরফের পোঁটলা মাথায় ধরে বসে ছিল, সেও কেমন উদাসভাবে চেয়ে ছিল।

বিবিসাহেবা ডাকলেন, হাসিনা মা আমার।

বিবিসাহেবার আকুল আহ্বানে কর্তার চোখেও জল নামল। কিন্তু যাকে ডাকলেন তার কাছে ঐ আহ্বান পৌঁছাল কি! অবসর নেই। ত্নুনিয়ার কাছে তার ঋণ শোধ হয়ে এসেছে। অর্ধমুদ্রিত চোখের কোণ বেয়ে টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু বালিশের উপর পড়ল। এইটুকুই বোধ হয় বাকি ছিল, শেষের অশ্রু দিয়ে ত্নুনিয়ার কোল থেকে চিরবিদায় নিল।

হাসিনা মরল। মরণ যে এত সহজ তা আজও মনে করতে পারি না। অথচ হাসিনা মরণকে সহজ করে সরলভাবে আপন করে নিল। গোলাপী দেহাবরণ নীল হয়ে গেল, কেউ রোধ করতে পারল না। মানুষের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

আজ ফেয়ারওয়েল দিলাম।

তারপর! তারপর! না আর ভাবতে পারছি না! বিশ বছর আগে হাসিনার মৃত্যু যেমন নির্বাক দর্শকের মতো দেখেছি, তেমনটা আজ দেখতে রাজী নই। মৃত্যুর বিরুদ্ধে আজ প্রতিবাদ জানাতে চাই। হাসিনার প্রেত যেন রাজাভাতখাওয়া থেকে আমার পাশে এসে বসে বলছে, ফেয়ারওয়েল, ফেয়ারওয়েল।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বিস্মৃত ঘটনাগুলো মনের আনাচে-কানাচে ভিড় করে মানসিক ক্লান্তি এনে দিয়েছিল, তাই ক্লান্তিতে আর অবসাদে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম যখন ভাঙল তখন গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে সেবক স্টেশনে।

হাসিনার মৃত্যুতে অভিনবত্ব কিছু নাই। মৃত্যু জন্মের চেয়েও সত্য। সেই সত্যকে আজ হোক কাল হোক সবাই মনে নিতে বাধ্য হয়, তবুও যৌবন-উন্মেষের প্রথম পর্যায়ে ঝরাফুলের মতো মূল্যহীন হয়ে গেল যৌবনের কাকলি।

চেয়ে দেখলাম মাটি-মায়ের কোলে এসে স্নেহের আশ্রয় গড়ে নিয়েছে তিস্তা। কল কল, ছল ছল করতে করতে ছুটে চলেছে। ওপারের কার্টরোডের বাঁধন পেরিয়ে রেলপথের বেষ্টনী পেরিয়ে নদী আনন্দে কলরব করতে করতে ছুটে চলেছে।

বৈজ্ঞানিকের মতো 'কোথা হইতে আসিতেছ?' জিজ্ঞাসা না করে নদীকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হল, 'কোথায় যাইতেছ?'

নদীর আনন্দ-উচ্ছল কলরবে যেন শুনতে পেলাম, বিরাটের মাঝে বিলীন হতে চলেছি। ক্ষুদ্র বিরাটের নিকট আত্মসমর্পণ করতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। ক্ষুদ্রের গতি নিম্নাভিমুখী, বিরাটের অবস্থান আরও নিম্নে, গৌরব তার সবার ঊর্ধ্বে। সেই গৌরবের সংখ্যাধিক্য ঘটাতে নদী ছুটে চলেছে। তেমনি মানুষও ছুটে চলেছে বিরাটের সাথে মহাশূন্যে বিলীন হতে। ক্ষুদ্রত্ব বিরাটকে আপন করতে ছুটে চলেছে। হাসিনাও সেই বিরাটের সন্ধানে গিয়েছে। কে সে বিরাট, কোথায় সে বিরাট জানা নেই, তবুও অক্লান্ত গতিতে মানুষ ছুটেছে, ছুটবে অনন্ত কাল ধরে।

মেদিসাহেব ছুটি নিয়ে চলে গেল। ছুটির শেষে বদলির হুকুম নিয়ে অন্যত্র কাজে যোগ দিয়েছিল। আর তার সাথে দেখা হয়নি।

মনে হয়েছিল এই কি বিরতি! সময়ের গতি অমোঘ প্রলেপ দেয় মনের ক্ষতে। মেদিসাহেব বদলি না হলেও পারত। ক্ষতের

যন্ত্রণা উপশম করতে নতুন দাওয়াইর সন্ধান, মনকে চোখঠাহরার মতো বঞ্চনা মাত্র।

কৈ লালটুরাম তো পালিয়ে নিস্তার পেতে চায়নি। তারও উপার্জনক্ষম সন্তানের অকালবিয়োগ তাকে ব্যথিত করেছিল। সে ব্যথার পরিমাপ কি মেদিসাহেবের ব্যথার চেয়ে কম। স্মৃতির দংশন তাকেও সইতে হয়েছে। মেদিসাহেবের অর্থ ছিল, সুযোগ ছিল, তাই দুঃখকে ভুলবার রাস্তা তার সামনে সে উন্মুক্ত পেয়েছিল। তার সমান অর্থ বা সুযোগ কোটি কোটি জনের নেই, নেই বলে তাদের মনুষ্যধর্মের কি কোথায় ব্যতিক্রম ঘটেছে।

লালটুরামের দল আমার তোমার মতো কাঁদে, আবার নিত্যকার কাজে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, কাজের মাঝে সান্ত্বনা খুঁজে বেড়ায়।

হাসিনার মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ-সমাজের নীচের তলার মানুষকে বিচার করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। ইচ্ছে হয়েছিল, মেদি-সাহেবকে ডেকে বলি, আমার দেশে তোমার চেয়ে বেশী ব্যথা যাদের বুকে তাদের দিকে একবার মুখ তুলে দেখ, তাহলেই তোমার ব্যথার উপশম হবে। নিজেরটুকু সাবধানতার সাথে বুকে আঁকড়ে ধরে নির্যাতীত মানুষকে ক্ষিপ্ত করে তুলতে চেষ্টা কর না।

হাসিনার মৃত্যুর কয়েকমাস পরেই আমি ফিরে এসেছিলাম। আমার পূর্বের তিন বছরের অভিজ্ঞতাকে সারা জীবনের পাথেয় করে ভাবতে শিখে বিশেষ লাভ হয়েছিল। হিসাবের খাতায় এই জমার অঙ্কটুকু কোনো খরচের অঙ্ক দিয়ে অবলুপ্ত হয়নি।

আজ ট্রেনে বসে ভাবতে ভাবতে নিজেকেই যেন হারিয়ে ফেললাম।

এমনি আত্মহারা হতে সব সময় পারিনি, তবুও মানুষের দুঃখ দুর্দশার সামনে তুলনামূলক বিচারকারী মন নিয়ে যখনই দাঁড়িয়েছি তখনই সব চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলেছি।

নইলে অসাম্যের চ্যালেঞ্জ মেনে নিয়ে আমার মতো কোটি কোটি মানুষ কিসের প্রেরণায় লড়াই করে চলেছে নির্মম দুনিয়ার সাথে। মানুষ নিজেকে ভালবাসে, আপনাকে উজাড় করে দেয়, সেই ভালবাসা

অপরকে ভালবাসতে শেখায় ; সেই ভালবাসা গড়ে তুলতে চায় আশ্রয়। আশ্রয় পাবার আশায় মানুষ এই চ্যালেঞ্জ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে !

অসাম্যের জমকালো শোভাযাত্রায় আঘাতে আঘাতে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে মানুষের দল, এক দল অপর দলকে স্থান ছেড়ে বিদায় নিচ্ছে, অভিজ্ঞতার অভিধান রেখে যাচ্ছে, কিন্তু শিক্ষার ব্যাপকতা নেই, তাই নতুন দল পরপর আসছে অ-প্রতিরোধ্য গতিতে। তাই ভ্রান্তি প্রমাদের পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

ভাবতে ভাবতে গাড়ি এসে দাঁড়াল শিলিগুড়ি। ভাবনার শেষ হল না। মনে হল একবার চীৎকার করে উঠি। সবাই শুনুক, তোমার আছে আমার নেই, তাতে ক্ষতি নেই। তোমার জৌলুসে আমার না থাকাকে ব্যঙ্গ কর না। সব সইব, সইব না তোমার ব্যঙ্গকে।

বলতে পারলাম না, শ্রোতাদের বুঝবার মতো মন তৈরি হয়নি।

নামতে হল। নেমে এসে কাঠের বেঞ্চে আশ্রয় নিলাম।

দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বেরিয়ে এসেও পাত্র পূর্ণ হল না।

আজ সেই ফেলে আসা দিনের স্মৃতির সামনে বাস্তবের সংঘাত সহ্য করে দাঁড়িয়ে রয়েছি। কল্পনাকে আশ্রয় করে যা সমৃদ্ধ হয়েছিল, বাস্তবের আঘাতে বুঝিবা তা চূর্ণ হয়ে যাবে! সেই ভাল। ভাল হলেই ভাল।

'ফেয়ারওয়েল' জানাবার সময় নেই।

শিলিগুড়ি
মার্চ ১৯৫৪

চার

ইরাক থেকে চন্দ্রকান্ত চিঠি লিখেছিল। এক গাদা চিঠি পড়েছিল বাক্সের তলায়। উনুন জ্বালাবার তাগাদায় বাক্সে কাগজ খুঁজতে খুঁজতে পুরাতত্ত্ববিদদের মতো চন্দ্রকান্তের চিঠিগুলো আবিষ্কার করে ফেললাম।

সবগুলোর তারিখ একচল্লিশ আর বেয়াল্লিশ সাল। তার পরও হয়ত দু চারখানা এসেছে, আমার হাতে পৌঁছায়নি। প্রাপ্তি স্বীকার হয়নি বলে আপনা থেকেই চিঠি আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই, ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবনে চন্দ্রকান্তও রাহুগ্রস্ত হয়ে গেছে, আমিও অজ্ঞাতসারে তাকে শত শত খেলাপী মালের বস্তার তলায় চাপা দিয়েছি। তার চিঠিগুলো না পেলে তার অবস্থিতি মনেই পড়ত না।

দোহারা শ্যামবর্ণ, মাথায় ফেজ, পরণে খয়েরী রঙের লুঙি, পায়ে সপেটা, বয়সও একুশ বাইশ হবে, চন্দ্রকান্ত যেন খাস কাঠমোল্লা। সেফাতুল্লার ওড়নার তলায় জগন্নাথ কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র চন্দ্রকান্ত চাপা পড়ে গেছে। সাধারণ দৃষ্টিতে কারুর বলবার উপায় নেই যে কয়েকমাস পূর্বের চন্দ্রকান্ত আর সেফাতুল্লা একই ব্যক্তি।

ক'দিন আগে পশু-ডাক্তারের আড্ডায় শুনেছিলাম, মতলব আলির প্রতিষ্ঠানে একজন নয়া মুসলিম এসেছে। যে এলাকার শতকরা নব্বই জন মুসলমান সেখানে নবমুসলমানের স্থান অতি উচ্চে। আপামর জনসাধারণ তাকে আপ্যায়িত করার জন্য তাদের সব সামর্থ্য ব্যয় করতে সর্বদা উদ্‌গ্রীব। সেই জন্যই সেফাতুল্লা মাননীয়দের একজন।

মতলব প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি, আইনসভার সদস্য তার উপর পীর বা ধর্মগুরু। মুরীদ বা শিষ্য সংখ্যা কয়েক সহস্র। এহেন ব্যক্তির আশ্রয়ে নবমুসলমানের স্থান নির্বাচনে কোন দুর্ঘটনার সন্দেহই থাকতে পারে

না। সকালে ও বিকালে সেফাতুল্লা আমার বাসস্থানের পাশ দিয়ে চলাচল করত, জানালা দিয়ে প্রায়ই তাকে দেখতে পেতাম। তার সাথে আলাপ করবার কোনো প্রয়োজন আমার হয়নি, অপ্রয়োজনে আলাপ করবার পক্ষপাতী ছিলাম না। আমিও নবাগত, তার চেয়ে কয়েক মাস আগে এসেছি। দেশসেবার প্রেরণায় এসেছিলাম বলে গর্ব বোধ করি, সত্যিই সেই আগমনের পশ্চাতে কোনো বৃহৎ আদর্শ ছিল কি না সে বিষয়ে বর্তমানে নিজের কাছেই সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।

মতলব আলির মতো ধুরন্ধর ব্যক্তি যে লোক নির্বাচনে ভুল করতে পারে একথা তার*সব চেয়ে বড় শত্রুও বলতে সাহস করত না। তবুও সে ভুল করেছিল আমাকে ডেকে এনে আর সেফাতুল্লাকে আশ্রয় দিয়ে।

ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে যেদিন প্রথম মতলব আলির আস্তানার সন্ধানে পাঁচ মাইল বালির চরায় দৌড়াদৌড়ি করে দম বন্ধ হবার যোগাড় সেদিন ভাবতে পারিনি জীবনের এই প্রথম পাঠ আমাকে বৃহতের সন্ধানে পথে বের করবে।

যেদিন কারবালার বালি চরার মতো উত্তপ্ত লতাগুল্মহীন ব্রহ্মপুত্রের বালি চরায় দাঁড়াতে হল, সেদিন ভাবি নাই নিঠুর নিয়তি নিয়মানুগ নরনারীকেও নিষিদ্ধ জীবনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কেন! মাথার উপর হৃদয়হীন সূর্যকিরণ, পদতলে উতপ্ত বালুকারাশি, সম্মুখে বহুদূরে গারো পাহাড়ের ছায়া, পেছন থেকে ছুটে আসছে দমকা ঝড়ো বাতাস; পথ শেষ হয় না, চলেছি তো চলেছি। এই বালু প্রান্তরে পথের নিশানা দেবার মতো লোকের অভাব। কোথাও নদীর শুকনো সোঁতায় ভাঙা নৌকা মেদমাংসহীন কঙ্কালের মতো হাতমুখ খিঁচিয়ে চৈত্রের উত্তাপে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। প্রত্যাহত দমকা বাতাস হা-হা ধ্বনি করছে। নীরস বালুকণার বুকে কোথাও যদি দু-এক গোছা দূর্বাঘাস পাওয়া যায় তারই আশায় জীর্ণশীর্ণ গো-পুঙ্গব খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে। তাদেরই মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আমিও চলেছি। অবশেষে যখন মতলব আলির আস্তানা আবিষ্কার করলাম তখন বেলা

গড়িয়ে এসেছে, দূর গ্রামের হাটুয়ার দল ধীরে ধীরে দল বেঁধে ফিরতে শুরু করেছে।

পরিচয়, আপ্যায়ন আর আশ্রয় কোনোটার অভাব হয়নি। বলতে গেলে কোনো অভাব কোনোদিন ছিল না। অভাব হয়েছিল সঙ্গীর। তবুও মাঝে মাঝে গিয়ে বসতাম পশু-ডাক্তারের বাসায়, সেখানে অনেক রাত অবধি গল্পগুজব করে অবসর যাপন করতাম। প্রায়ই বিকেলে গিয়ে বসতাম বালির চরায়। সন্ধ্যা গড়িয়ে যেত, হিম হয়ে উঠত বালিকণা, হায়েনার সশঙ্ক চীৎকার ধ্বনি ভেসে আসত দুরান্ত থেকে, পারের শেষ নৌকা শহর থেকে পারানীদের পৌঁছে দিয়ে বিশ্রাম নিত সোঁতার কিনারায়। সজাগ হয়ে উঠতাম স্টীমারের সার্চলাইট যখন নদীর চরায় ভেসে বেড়াত। অন্ধকারের মাঝে আলোর এই ফুলকি চমকে চমকে ধমকে দিয়ে যেত। ফিরে আসতাম নিজের ডেরায়।

সব চেয়ে ভাল লাগত খলিলকে। তাকে পাশে পেলে অনেক সময় রাতের গভীরতাকেও ভুলে যেতাম। যতক্ষণ সে না বলত, এইবার চলি, ততক্ষণ আমি ফেরবার কথা উচ্চারণও করতাম না। খলিল তার ছোট্ট ডিঙিতে উঠে ভাটির টানে ছুটে চলে যেত। তার ভাটিয়ালি গানের সুর কানে ভেসে আসত, সেই গান শুনতে শুনতে আমিও ফিরে আসতাম নিঃসঙ্গ ডেরায়।

অনেক কাজ, আবার কোনো কাজই নেই। এই দুয়ের মাঝখানটায় সঙ্গী না পেলে দিনাতিপাত করা সহজ নয়। স্থানীয় উগ্র সাম্প্রদায়িকতার সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারতাম না। খলিল ছিল এসবের উপরে তাই খলিলকে ভাল লাগত। খলিল কথা কম বলত, কথা বলবার সাথে মন্তব্য জুড়ে দিত। উপরন্তু মন্তব্যের সাথে তার দরদভরা প্রাণের পরিচয় থাকত, তাই তাকে আরও ভাল লাগত। অনেক রাতেই তার সাথে ডিঙিতে ভেসে বেড়াতাম। বড় গাঙে না গিয়ে সোজা যেতাম সোঁতা ধরে। মাইলের পর মাইল গিয়ে কোনো গাছতলায় নৌকা বেঁধে দুজনে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তাম।

এক রাতে গারোবাদার ঘাটে নৌকা বেঁধে ঘুমিয়ে গেছি। হঠাৎ

বন্দুকের শব্দে আর ক্যানাস্তারা পেটার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। ধাক্কা দিয়ে খলিলের ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, এত গোলমাল কিসের।

কান পেতে শুনে বলল, ও কিছু নয়, রাভাদের গাঁয়ে হাতী নেমেছে। খেত খামার যাতে নষ্ট না হয় তারই জন্য হাতী খেদাচ্ছে।

সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, হাতী এদিকে আসবে না তো ?

খলিল সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, শুয়ে পড়ুন।

জিনজিরা নদীর বুকে রাত কাটিয়ে সকাল বেলায় রাভাদের গ্রামে গিয়ে উঠলাম। পাশেই ছোট বন, বনাকীর্ণ পাহাড়ী টিলার নীচেই ধানের ক্ষেত। গতরাতে হাতীতে ধানের ক্ষেত ডলে-চষে শেষ করে দিয়ে গেছে। ক্ষেতের চেহারা রণভূমির মতো।

উপায়।

উপায় নেই। টিন পিটিয়ে, বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করেই হাতী তাড়াতে হয়। আজীবন যা রাভারা করেছে, আজও তাই করবে! তারা এর বেশি জানেও না, করে না।

রাভারা তিব্বত-মঙ্গোলীয় আর ভারতীয় সংমিশ্রণে সৃষ্ট জাতি বলেই মনে হল, তাদের নিজস্ব ভাষা আছে, হরফ নেই, বাঙলা তাদের বাজারিয়া ভাষা। সবাই মিলে গোষ্ঠী বেঁধে পাহাড়ের তলায় বাস করে। পুরুষদের বেশভূষা আচার ব্যবহার বাঙালীর মতোই, দু চার দশজন লেখাপড়াও যৎসামান্য শিখেছে। মেয়েদের কোমরে জড়ান হাঁটু অবধি একখানা মোটা রঙিন কাপড়ের টুকরো, বুকের উপর ছোট ওড়না বাঁধা। গলায় এক বোঝা পুঁতি-পলার মালা। উচ্চতায় ছ ফুট কেউ-ই নয়, বাদামি গায়ের রঙ বেশী, তামাটে রঙও রয়েছে।

রাভাদের গ্রাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় সভ্যতাবিলাসী নগরকেও হার মানায়! দুই সারিতে কুটির, মাঝখানটায় পরিচ্ছন্ন আঙিনা। বাহুল্য কোথাও নেই। বাঁশের মাচান দিয়ে তৈরি বাসস্থানে একখানি মাত্র লম্বা ঘর। সামনে ছোট বারান্দা, বারান্দায় বসে রাভা পুরুষ

রমণী সন্ধ্যার আসর জমায়। তার পেছনে তাদের শোবার ঘর, শেষের ঘরখানা তাদের সঞ্চিত ধানের গোলা। গোলার তলায় থাকে হাঁস-মুরগী-শুয়োর। স্বয়ং সম্পূর্ণ। তাদের জীবনে অপরের প্রয়োজন কম।

রাভারা আদিবাসী পাহাড়িয়া, কিন্তু উচ্চ পাহাড়ের মাথায় তারা বাস করে না, বাস করে পাহাড়ের পাদদেশে। অর্ধ বন্য অর্ধ কৃষিজীবী। তাই পেছনের পাহাড়ের ছায়ায় বসে সামনে চাষের জমি পাহারা দেয়।

তাদের জীবনে বৈচিত্র্য নেই, অথচ মানবতা-বোধ বড় প্রবল।

খলিল অনেকবার এধারে এসেছে। প্রথম জীবন সে কাটিয়েছে জাহাজের খালাসীগিরি করে, দেশ-বিদেশের জলহাওয়ায় তাজা পুরুষ্ঠ দেহ, নিজের ডিঙিখানা হাতের কাছে পেলেই সে অজানার সন্ধানে বের হয়। এমনি বেড়াবার পথে রাভাদের গ্রামে অনেকবারই এসেছে। মোটামুটি রাভা জীবনের সাথে পরিচয় তার যে না ছিল এমন নয়।

তার সাথে এসে উঠলাম রাভাদের গ্রামে।

অভ্যর্থনার অভাব হয়নি। যথেষ্ট আহার্য সংগ্রহ করে দিয়ে তারা গোল হয়ে বসল। তৎকালীন আতিথেয়তার নমুনায় তাদের সাথে আমাদের যে পার্থক্য রয়েছে তা মনেই হল না।

গোষ্ঠীপতি হাতী খেদানর কথা বলছিল। নিশ্চিতভাবে সে বলল, হাতী সব সময় আসে না, গ্রামে দেওতার উৎপাত হলে হাতী নেবে আসে। দেওতাই ডেকে আনে হাতীকে।

ভূতপ্রেত আরও কত কি যে ওরা বিশ্বাস করে তা বলবার নয়। একবার মিশমিদের গ্রামে গিয়েছিলাম, গ্রামের প্রবেশ-পথে সদ্য কর্তিত একটা কুকুর ঝোলান দেখে জানতে চেয়েছিলাম, কেন ওটা টাঙানো রয়েছে। দ্বি-ভাষী জানাল, আমাদের সাথে যদি কোনো অপদেবতা এসে থাকে তাকে বাধা দেবার জন্য কুকুর মেরে মাঙ্গলিক করেছে।

মনে হয়, আদিবাসীদের সরল জীবনের সাথে কুসংস্কারগুলো এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বলেই বোধ হয় সরলতা ওদের ছেড়ে যায়নি। ওরা যেদিন আমাদের মতো সভ্য হবে সেদিন সরলতা লজ্জায় মুখ লুকাবে।

রাভা, মিরি, মিশমি সবাইকে দেখেছি, অপদেবতার উপর তাদের

অগাধ বিশ্বাস আর অসম্ভব ভয়। এরা দেবতা ও মানুষকে বাদ দিয়ে মাসের পর মাস অতিবাহিত করতে পারে কিন্তু অপদেবতাকে বাদ দিয়ে একদিনও চলতে পারে না। অপদেবতা ওদের পুরোধা।

খলিলকে সাথে নিয়ে ফিরে এসে অনেকদিন রাভাদের কথা ভেবেছি, আরও হয়ত ভাবতাম, হঠাৎ দুর্গাপূজার সময় রাভাদের গোষ্ঠীপতি তাদের পূজায় যোগ দেবার জন্য নেমতন্ন পত্র পাঠানতে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম। বাংলার রুচি ও কৃষ্টি থেকে রাভারা বিচ্ছিন্ন নয় বলেই মনে হল। তাদের অনুরোধ রক্ষা করতে পারিনি, কিন্তু বুঝলাম, মতলব আলীর ইসলাম প্রচারের উদ্যমের সাথে সাথে ব্যালান্স রক্ষা করবার লোকের অভাব নেই। অ্যাকশান ও রিঅ্যাকশান বোধ হয় এমনিভাবে মিছিল করে চলে। যে মতলব আলীর দাপটে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়, সেই মতলব আলীর এলাকায় ধুতি-পরা মানুষ দেখেনি অনেকে এবং অনেক কাল। এই পূজা হল তারই প্রত্যুত্তর।

খলিলকে ভাল লাগত তার উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য। ভাটিতে এক মাইল দূরে তার খড়ের ঘরে একাই থাকত, মাঝে মাঝে ছুটে যেত কোথায় তা কেউ বলতে পারত না। আমি জানতাম, খলিল তার ডিঙি নিয়ে বেরিয়েছে জলের নেশায়, যৌবনের প্রথম প্রহর তার জলের বুকে কেটে গেছে, তাই আজ জলের ডাক শুনলে সে ঘরে থাকতে পারে না। হাতছানি দিয়ে জল তাকে ডাকত, ব্রহ্মপুত্রের গোঁঙানি তাকে বোধ হয় শ্যামের বাঁশী শোনাত, তাই সে ছুটে যেত অজানার পথে। মাঝে মাঝে খলিলকে খুঁজে পেতাম না। তখন একাই বসে থাকতাম নদীর চরায়। এই সেই নদী—যার সাথে চাঁদসওদাগরের রূপকাহিনী জড়িয়ে রয়েছে। বেহুলার ভেলা এসে ওপারের ঘাটে কোনো অজ্ঞাত দিনে আটকে ছিল, ওখানে নেতা ধোপানীর কাপড়ের মোট বইবার গাধা কোনো কালে বিকট ধ্বনি করত। নদীকে দেবতার আসনে বসিয়ে নদীর অফুরন্ত দানকে তমসা-বৃত যুগ থেকেই মানুষ সম্মান দেখিয়ে এসেছে, তাই নদীর রূপকাহিনী

আমাদের দেশেই নয়, বিদেশেও নানাভাবে শুনে এসেছি। লখাই-এর ভেলায় বেহুলা কাঁদে, চাঁদের পুরীতে সনকা কাঁদে, নদী সেই চোখের জল বুকে করে বয়ে নিয়ে গেছে; আজও নদী বয়ে নিয়ে চলেছে মানুষের সহস্র সহস্র বছরের শোক আর দুঃখের অশ্রু। নদী উদাসী, সে আজও সেদিনের মতো কলকল ছলছল করে হেসে হেসে গড়িয়ে চলেছে। তার রূপ আছে, রাগ আছে, ছন্দ আছে, অথচ বিকার নেই। অন্যের অশ্রু বহন করেও নির্বিকারভাবে আবহমান কাল ধরে বয়ে চলেছে। কোথাও কোনো ভাবান্তর নেই।

খলিলকে পাশে না পেলে মোটেই ভাল লাগত না।

কদিন থেকে খলিলের খোঁজ নেই। একা একাই বালির চরায় যেতাম আর আসতাম। মরা শিমুলগাছ তলায় ঘাসের উপর গা এলিয়ে শুয়ে থাকতাম। পারঘাটার পারানীরা দূরে বালির চরা ভেঙে আসা যাওয়া করত তাই দেখতাম। সেদিন মুটের মাথায় বোঝা চাপিয়ে আসছিল সেফাতুল্লা। অনেক দূর থেকেই সে আমায় লক্ষ্য করেছে, আগেও হয়ত শুনেছে বিকেলবেলায় বালির চরায় আমি বসে থাকি। আমাকে দেখতে পেয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, নমস্কার।

নেহাত ভদ্রতারক্ষার খাতিরে প্রত্যভিবাদন জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, শহরে গিয়েছিলেন বুঝি?

মতলবসাহেবের কিছু খরিদা মাল আনতে হল। রোজ এখানে বসে থাকেন বুঝি?

হেসে বললাম, হাঁ। সময় কাটাতে হবে তো!

ডাক্তারসাহেব সেদিন বলছিল বটে, বিশ্বাস হয়নি। কেমন করে মানুষ একা বসে থাকতে পারে ভেবেই পাইনি, আজ চাক্ষুষ দেখে বিশ্বাস হল।

প্রত্যুত্তরে বললাম, মানুষ কোনো কালেই একা থাকতে পারে না, কিন্তু এমন সময় আসে যখন মানুষ একা থাকতে চায়, সেই একা থাকবার অবসর আমার আসে বিকেলবেলায়।

মুটেকে চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে সেফাতুল্লা আমার পাশে বসল।

আপনি তো পুরান লোক, এখানকার রাস্তাঘাট চেনেন।

ঠিক পুরান নয়, আপনার চেয়ে পাঁচ ছয় মাস আগে এসেছি। পথঘাট চিনতে বেশী সময় দরকার হয় কি ?

তা বটে, চিনবার হলে এক দিনেই চেনা যায়। শুধু মানুষ বাদে।

অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

কি ভাবছেন ?

বললাম, আপনার আমার বয়সের তফাত কতটা ?

ঠিক বলতে পারি না, চার পাঁচ বছর হবে।

তাই হবে। বয়স দিয়ে অভিজ্ঞতার পরিমাপ হয় না, তাই ভাবছিলাম। মানুষ সম্বন্ধে এত সহজ সরল তথ্যের অবতারণা সব সময়ই শোনা যায়, কিন্তু বক্তা আর শ্রোতা দুজনের তারতম্যে তার অর্থের কত না পার্থক্য দাঁড়ায়। তাই ভাবছি।

তা বটে, পরিণত বয়সে মানুষ যখন এসব চিন্তা করে তখন সবাই শ্রদ্ধা জানায় তার অভিজ্ঞতাকে।

আমি বললাম, আর অপরিণত বয়সে যখন জানায় তখন মনে হয় সে নিরাশাবাদী। মানুষকে রঙিন চশমার সাহায্যে দেখে অশ্রদ্ধা করবার মতো কারণ কোথাও আছে কি ?

সেফাতুল্লা আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, তাই হবে।

তাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে আমিও চুপ করে বসে রইলাম। শুক্লপক্ষের তৃতীয়ার চাঁদ আকাশে উঠতেই বললাম, চলুন সাহেব।

সেফাতুল্লা কোনো কথা না বলে আমার সাথে রওনা দিল। এই আমাদের প্রথম পরিচয়, গুরুত্ব না থাকলেও হালকা নয়।

পরিচয়ের এই সামান্য সূত্রকে অবলম্বন করে মাঝে মাঝেই সেফাতুল্লা আমার পাশে এসে বসত। মরা শিমুলগাছের চোখ কান থাকলে আমাদের আলোচনাগুলো মনে করে রাখতে পারত। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, প্রায় সব নীতি ও দুর্নীতির কচকচি শেষ করে যেন সুস্থ হতাম, কিন্তু কোনো দিনই তার সাথে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতাম না, করবার প্রবৃত্তিও ছিল না। ধর্মকে আমি

ব্যক্তিগত বিশ্বাস মনে করি, সেখানে যুক্তি দেবার মতো যুক্তি খুঁজে পেতাম না।

খলিলকে আবার ফিরে পেয়েছি। তা বলে সেফাতুল্লা আসা বন্ধ করেনি, সেও আসত। খলিল কেনবা সেফাতুল্লাকে সহ্য করতে পারত না। রুচি বিগর্হিত কোনোরূপ মন্তব্য সে করেনি সত্যি কিন্তু তার কথার ভঙ্গীতে বেশ বোঝা যেত সেফাতুল্লা না এলেই সে খুশী হয়।

তবুও একদিন পড়ন্ত বেলায় তিনজনে একই ডিঙিতে উঠে ভাটির টানে ডিঙি ভাসিয়ে দিলাম।

খলিল জিজ্ঞাসা করল, খাঁ-সাব, আজ যদি ফেরা না হয়?

তাতেই বা কি? আপনারা তো থাকবেন। সেফাতুল্লা উদারভাবে জবাব দিল।

তা বটে। খলিল কি যেন জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে থেমে গেল।

ভাটিতে নৌকা ছুটেছে, খলিল শুধু হাল ধরে রয়েছে। তার সামনে বসে সেফাতুল্লা। আমি ছইএর তলায় গা এলিয়ে দিয়েছি।

খলিল অনেক ক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, মধুসূদন ইংরেজী কবিতা লিখতেন।

সেফাতুল্লা সায় দিয়ে বলল, কিন্তু, তার চেয়ে তাঁর বাঙলা কবিতা অনেক ভাল।

প্রথমে মনে করেছিলাম খলিল বোধ হয় সাহিত্য ও সাহিত্যিক নিয়ে আলোচনা করতে চায়। আমি শ্রোতা, তাই নীরবে শুয়ে রইলাম।

খলিল বলল, যা নিজস্ব তার চর্চা করলেই মানুষ বড় হয় বুঝলেন খাঁ-সাব।

সে তো বটেই।

খলিল হাসল, বলল, এত জ্ঞান যদি আপনার তাহলে চন্দ্রকান্তের মাথা মুড়িয়ে সেফাতুল্লা হলেন কোন দুঃখে!

সেফাতুল্লা থমকে গেল। আজ অবধি সবাই তাকে প্রশংসা করছে, সবাই সমাদর করছে, কিন্তু স্পষ্ট কথা কেউ তাকে বলেনি।

খলিল কোমর থেকে গামছা খুলে মাথায় জড়িয়ে নিল, বলল, যখন মানুষের জ্ঞানের অভাব ঘটে তখন মানুষ অন্ধকারে পথ খোঁজে। সে পথ ভাল নাও হতে পারে, তবুও না জেনে তাতে পা দেয়। সেই জ্ঞানের অভাব ঘটেছে আপনার। মুসলমানের জন্য ঈশ্বর আর হিন্দুর জন্য নয়, একথা কি কোনো ধর্মশাস্ত্রে পেয়েছেন ?

সেফাতুল্লা শেষ চেষ্টা করবার মতো বলল, প্রবৃত্তি সবার তো এক নয়। আমি মনে করেছি এই পথেই শান্তি ও মুক্তি, তাই এই পথে এসেছি।

আপনি শান্তি ও মুক্তি কোনোটাই চাননি, আপনি চেয়েছেন প্রতারণা করতে, তাই প্রতারিত হয়েছেন।

বাধা দিয়ে বললাম, খলিলসাব ও আলোচনা বাদ দিন।

সত্যি সত্যি যে খলিল আমার অনুরোধ রক্ষা করবে তা বুঝিনি, দেখলাম আমার অনুরোধের মর্যাদা সে রক্ষা করল।

সেফাতুল্লা বড়ই বিষণ্ণ। স্বেচ্ছায় সঙ্গী হয়েছে, ফিরে যেতেও পারছে না। আর চাইলেই এই গভীর মাঝ-নদী থেকে তাকে ডাঙায় সহজে তুলে দিয়ে আসা সম্ভবও নয়।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতেই খলিল তার খাবারের পোঁটলা খুলে দিল, দুজনকে খেতে দিয়ে নিজেও খেতে লাগল।

অনেক রাত অবধি চলার পর খলিলকে জিজ্ঞাসা করলাম, ক' মাইল এসেছি মনে হয় ?

আঠার বিশ মাইল।

আজ রাতে ফিরতে পারব কি ?

বাতাস থাকলে পারব, নইলে কাল দুপুর নাগাদ ফিরতে পারব।

তাহলে চরে নৌকা ভেড়ান। রাতের ঘুম নষ্ট করে কি হবে। সকালের উজান ধরা যাবে।

তা মন্দ নয়, বলতে বলতে খলিল নৌকার গলুই ঘুরিয়ে দিল। পাশ কাটিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকা কিনারায় ভিড়ল। নৌকা বাঁধা হলেই আমরা শুয়ে পড়লাম। সেফাতুল্লা বোধ হয় ঘুমোয়নি, খলিলও ঘুমোয়নি, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

সকালবেলার উজানে নৌকার মুখ ফেরান হল। সকালের মিষ্টি বাতাসে চোখ জড়িয়ে এসেছে। এমন সময় খলিল বলল, এখানে নৌকা বেঁধে চলুন বেড়িয়ে আসি।

সেফাতুল্লা প্রতিবাদ করে বলল, চেনা নেই শোনা নেই।

তাহলে আপনি ডিঙি পাহারা দিন, আমরা বেড়িয়ে আসি। চারটি খেতে হবে তো। যোগাড় করে নিয়ে আসি।

সেফাতুল্লাকে ডিঙিতে রেখে দুজনে রওনা হলাম।

রাস্তায় খলিলকে বললাম, সেফাতুল্লাকে ওসব কথা না বললেও হত।

খলিল হাসল।

হাসছেন কেন? মানুষের বিশ্বাসে আঘাত না দিলেও পারতেন, বিশেষ করে ধর্ম-বিশ্বাসে।

খলিল প্রতিবাদ করে বলল, সেফাতুল্লার কোনো বিশ্বাসই নেই। বাপ-মায়ের বয়ে যাওয়া ছেলে। বাপ ছিল জেল-দারোগা। তার নাম বললে চিনতেও পারবেন। বাপে পড়তে পাঠিয়েছিল কলেজে। দু-দুবার ফেল করে শেষবেলায় ঢাকায় এল বাপের তাড়না সহ্য করতে না পেরে। আতিথ্য গ্রহণ করল পিতার পরিচিত একজন উকিলসাহেবের গৃহে। উকিল ভদ্রলোক অসৎ নন, কিন্তু অসদাচরণ লক্ষ্য করা গেল বয়ে-যাওয়া ঐ ছেলের। উকিলের পঞ্চদশী কন্যার গৃহশিক্ষকরূপেই সে আশ্রয় পেয়েছিল, কলেজেও ভর্তি হয়েছিল। উকিল-গৃহিণী পাকা লোক, সংবাদ নিয়ে যখন জানল তার পূর্ব ইতিহাস, তখন দাবার চাল দিল। তিন চার মাস ছবিরনকে পড়াতে পড়াতে বয়ে-যাওয়া ছেলের চোখে নেশা জেগেছে। নিজের পড়ার চেয়ে ছবিরনের পড়ার দিকে তার বেশী নজর

হঠাৎ একদিন দেখল ছবিরন পড়তে আসেনি।

চন্দ্রকান্ত চিন্তায় পড়ল। অসুখ বিসুখ হয়নি তো।

ওদিকে উকিলগিন্নী ছবিরনকে হারেমে আটক করেছেন, চন্দ্রকান্ত তা জানে না।

সারাদিনে একবারও তার সাথে দেখা না হওয়াতে চন্দ্রকান্ত অস্থির হয়ে পড়ল। উকিলগিন্নী দূর থেকে সব লক্ষ্য করছিলেন।

বিকেলবেলায় ছবিরন আর চন্দ্রকান্তের দেখা হল। মায়ের শেখান কথা বলল ছবিরন।

তুমি কাফের, তোমার সাথে মেলামেশা করা আমাদের শরীয়তে নিষেধ।

চন্দ্রকান্ত তখন সাঁতার জলে। হাত পা আড়ষ্ট হয়ে এসেছে। যুক্তিতর্ক সব ভুলে গেছে। খড়কুটো পেলে বেঁচে যায়।

হতাশভাবে বলল, তাহলে কি হবে?

আমার সাথে তোমার আর দেখা হবে না। সে চেষ্টা কর না।

তোমার স্বজাত নই বলেই আমায় চলে যেতে হবে?

তা যদি ভাল মনে কর তাই কর। ছবিরন বন্যাহরিণীর মতো চকিতে পালিয়ে গেল।

চন্দ্রকান্তের চোখে ঘুম নেই, আহারে শান্তি নেই, এদিকে তিন দিন হল ছবিরনের সাথে দেখাও নেই।

হঠাৎ একদিন সকালবেলায় উকিলসাহেবের বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হল। উকিলসাহেব কোনো খবরই রাখেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার চেহারা অত খারাপ কেন চন্দ্রকান্ত?

চন্দ্রকান্ত বিনা ভনিতায় যা বলতে চেয়েছিল তা আর বলতে পারল না। আজে-বাজে কথা বলে বেরিয়ে গেল।

আবার পরদিন।

সেদিন সতর্ক হয়েই এসেছিল। উকিলসাহেবকে কোনো কথা বলতে না দিয়ে প্রথমেই বলল, আমি মুসলমান হব।

উকিলসাহেব অবাক হয়ে গেলেন। নানাভাবে তাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, নিবৃত্ত করবার সব চেষ্টা বিফল হল।

তারপর যা হয়। চন্দ্রকান্ত সেফাতুল্লা হল।

কিন্তু ছবিরনের সাথে আর দেখা হয় না।

হঠাৎ একদিন স্কুল-ফেরতা ছবিরন সেফাতুল্লার ঘরে এসে উঠল।

তোমার সাথে কথা আছে। বলে ছবিরন চেয়ার টেনে বসল।

এবার মায়ের শেখান কথা বলতে সে আসেনি, এবার সে নিজের কথাই বলবে।

তুমি মুসলমান হলে কেন?

তোমাকে পাব এই আশায়।

এমন কোনো প্রতিশ্রুতি তোমায় দিয়েছিলাম কি?

শঙ্কিতভাবে চন্দ্রকান্ত বলল, দাও নাই, আবার অমতও জানাওনি।

আমার একটা মত আছে তা বোধ হয় স্বীকার কর। আমি যদি বলি, নারীর মোহে যে বাপ-চৌদ্দপুরুষের ধর্মত্যাগ করে, সে আরও কিছু করতে পারে।

এটাই স্বাভাবিক, তোমার মাও হিন্দুর মেয়ে ছিলেন।

মা মেয়ের আদর্শ একথা তুমি স্বীকার করলেও আমি করি না।

ছবিরন বেরিয়ে গেল।

চন্দ্রকান্ত তবুও আশা ছাড়েনি। সে গিয়ে উকিলগিন্নীকে নিবেদন জানাল।

উকিলগিন্নী বোকা সেজে বলল, তা কি হয়? তুমি খাওয়াবে কি?

সেখানেও নিরাশ হয়ে চন্দ্রকান্ত দমে গেল, ধীরে ধীরে চোখের পাতাও খুলতে লাগল।

রাতের বেলায় উকিলগিন্নীর পরামর্শে উকিলসাহেব ছবিরনের পাত্র সন্ধানে বের হল। কাজী, মৌলবী, মোল্লায় ঘর ভরে গেল। চন্দ্রকান্ত ওরফে সেফাতুল্লার চোখের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অধ্যাপকের দ্বিতীয়া গৃহিণীর পদ গ্রহণ করে ছবিরন অতি দ্রুত যবনিকার অন্তরালে বিলীন হয়ে গেল।

নয়া মুসলিমকে বাদ দেওয়া যায় না তো। তার জন্যও পাত্রী ঠিক করা হল। মিঞাবাজারের মেনতু মিঞার তালাকি-বিবি কোনো এক ডেপুটিবাড়িতে বাঁদীর কাজ করত, তার সাথে কথাবার্তা চলতে লাগল। ইতিমধ্যে যোগসাজসে বুদ্ধিমানের দল সেফাতুল্লাকে আসামের জঙ্গলে পাঠিয়ে দিল। মতলব আলির হেপাজতে থাকলে নিশ্চয়ই সে খাস মোল্লা হতে পারবে, অন্তত পালিয়ে গিয়ে হিন্দুদের

কজ্জায় পড়বে না। এই বিশ্বাসেই তাকে ব্রহ্মপুত্রের এই বালির চরায় পাঠিয়েছিল'।

ঘটনাটি শেষ করে খলিল বলল, বুঝলেন, সেফাতুল্লার বিশ্বাস আর ধর্মমত। যারা ধর্ম ধর্ম করে পাগল তাদের কাছে এই সব ঘটনা অতি নিন্দনীয়, আর যারা স্বার্থান্বেষী তারা এরই মূলধনে অপর পক্ষকে আঘাত করবার সুবিধা পায়।

আপনি এত জানলেন কি করে?

কাল সারারাত সেফাতুল্লার এই দুঃখের কাহিনী শুনছিলাম।

খলিল অনেকক্ষণ নীরবে পথ চলবার পর বলল, দুনিয়াতে হিন্দু নেই, কৃশ্চান নেই, মুসলিমও নেই, আছে বিরাট মানুষ জাতি। মনুষ্যত্বকে যারা ফাঁকি দেয় তারা এমনি ধারা ফাঁকিতে পড়ে।

সুখচরের হাটে এসে চিড়েগুড় কিনে আবার ফিরে চললাম।

ফিরে এসে দেখি সেফাতুল্লা নেই।

বালির চড়ায় চাবিদিক তাকিয়েও তাকে দেখা গেল না। বেশ চিন্তায় পড়লাম। খলিল কিন্তু মোটেই চিন্তিত হয়নি। সে সানকিতে চিড়ে ভেজাতে ভেজাতে বলল, এই চিড়ে ভিজতে ভিজতে খাঁ-সাহেব এসে যাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নদীর বাঁকের ওপারে খাঁ-সাহেবকে দেখা গেল।

এসে গেলে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় গিয়েছিলেন খাঁ-সাহেব?

ঐ গাঁয়ে। বড়ই তেষ্টা পেয়েছিল।

নদীর স্বচ্ছ জল অফুরন্ত, তাতেও তেষ্টা মিটল না। গ্রামে যেতে হল জল খেতে। খলিল হাসল। হাসি তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট।

সেফাতুল্লা কোনো জবাব না দিয়ে ডিঙিতে এসে বসল।

কিছুদিনের মধ্যেই সেফাতুল্লার বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল।

একদিন রাতে গুটি গুটি এসে বলল, দাদা আমি চাকরি পেয়েছি।

কোথায়?

শিলং-এর গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ারের আফিসে।

বেশ ভাল। মতলব আলীকে বলেছেন ?

না, বলবও না। আমি পালাব। সব কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই। এবার ভুলের প্রায়শ্চিত্য করব।

সে যে ভুল করেছে এ কথা স্বীকার করি না, তবুও বললাম, ভুলের প্রায়শ্চিত্য করতে আরও কয়েকগণ্ডা ভুল তো করবেন না ?

সেফাতুল্লার মুখ শুকিয়ে গেল।

বললাম, মানুষের জীবনে উচ্চ আদর্শ না থাকলে ভুল হয়। হিন্দু মুসলমান হল, অথবা মুসলমান হিন্দু হল এটা বড় কথা নয়। আদর্শহীন লোক যেখানে যায় সেখানে অশান্তি সৃষ্টি করে। ভুলের অঙ্ক বৃদ্ধি হয়। হিন্দু অথবা মুসলমান কেউই লাভবান হয় না। ধর্ম শান্তি ও মুক্তি আনে না, আনে কর্ম। সে কর্মের একটি জাত, তা হল সু-কর্ম। বুঝলেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে সেফাতুল্লা উঠতে উঠতে বলল, একটা অনুরোধ করতে এসেছিলাম।

বলুন।

আমার বাবাকে একখানা চিঠি দিয়ে সব কিছু জানিয়ে যদি দেন তাহলে বিশেষ উপকৃত হব।

রেখে যান ঠিকানা।

এক টুকরো কাগজে নাম ঠিকানা লিখে দিয়ে বলল, আজ রাতেই নদী পার হব। নৌকা ভাড়া করে রেখেছি। সকাল পাঁচটার গাড়িতেই এ জেলা ছেড়ে চলে যাব।

আমি কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলাম। সে চলে যাওয়ামাত্র আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম।

শুয়ে ঘুম হল না। সেফাতুল্লা ওরফে চন্দ্রকান্ত সারা মন জুড়ে ছুটাছুটি করতে লাগল।

চন্দ্রকান্তের সব কাহিনী বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কেমন করে মানুষ এতটা হৃদয়হীন হতে পারে তা আমার বুদ্ধির অগম্য। মনে মনে ছবিরন আর উকিল-গৃহিণীর চিত্র আঁকতে চেষ্টা করছিলাম। কি রকম চেহারা হলে তার হৃদয়হীন অভিব্যক্তি ঘটে তা ভাবতে পারলাম না।

রাত দশটা নাগাদ ঘরের পেছনে চলাচলের আওয়াজ শোনা গেল। গলা খাঁকরি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কে ?

চাপা গলায় উত্তর এল, আমি চন্দ্রকান্ত। যাচ্ছি দাদা।

আচ্ছা, বলে পাশ ফিরে শুলাম।

মনে মনে আশা পোষণ করছিলাম তার সলিল সমাধির সংবাদ পাবার। বলা বাহুল্য, আমি নিরাশ হয়েছিলাম।

সেফাতুল্লা ওরফে চন্দ্রকান্ত পাদপীঠ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

তারপর মাঝে মাঝে তার চিঠি পেতাম, জবাবও দিতাম। যুদ্ধের পরোয়ানা এমন ঘোরাল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যার ফলে মতলব আলীর আস্তানা ছাড়তে বাধ্য হলাম, যেতে হল অতিথিশালায়। চন্দ্রকান্ত ডুবে গেল।

সেই চন্দ্রকান্তের ইরাক থেকে লেখা চিঠিগুলো আবিষ্কার করে বসে বসে ভাবছিলাম, চন্দ্রকান্ত আজও বেঁচে আছে তো !

তার চলে যাবার পর খলিলের সাথে মাঝে মাঝে তার সম্বন্ধে আলোচনা হত। একদিন খলিল বলল, চন্দ্রকান্ত লড়াইয়ে ফতে হয়ে যাবে। যদি না যায়, তাহলে বলব যাওয়া উচিত।

আপনার অত রাগ কেন ?

অপরিণত বয়সে চোখের নেশায় সে ছিল বিভ্রান্ত, সেই বিভ্রান্তি মানুষকে অশ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছে। তাই খাঁ সাহেবকে কখনো সুচক্ষে দেখতে পারিনি। আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য মাপ করবেন। খাঁ সাহেবকে হিন্দুও মনে করিনি, মুসলমানও মনে করিনি, তাকে মনে করেছি সমাজের অভিশাপ, মানুষ সমাজের অভিশাপ। সত্যিই যদি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সে মুসলমান হত তাহলে তার প্রশংসা করতাম। কিন্তু দাদা, ওর একটি কথাও বিশ্বাস করিনি। মনে হয় ওর প্রথম থেকে শেষ অবধি সবই মিথ্যা। এর মতো লোকেরাই অভিশাপ।

খাঁ সাহেব কতটা সত্যি কথা বলেছে তা জানি না, কিন্তু প্রেম জাতিধর্মের গণ্ডী দিয়ে বাঁধবার জিনিস নয়, ও বয়সে উদ্দাম বেগে মনের গতি ছুটে চলে, আশাহত মানুষ বিকৃত রুচির পরিচয় দেয়,

তবুও তাকে মানুষের সমাজ স্থান দেয়, হয়ত তাকে মানবধর্মের বিশিষ্টতা দিয়ে আপন করে নেয় না। খাঁ সাহেবের প্রেমও যেমন তুচ্ছ নয়, তেমনি তার আশা ভঙ্গের প্রতিক্রিয়াও অসমীচীন নয়।

খাঁ সাহেবকে কেন, নিজের জীবনকে দিয়ে বিচার করে দেখেছি, খাঁ সাহেব অভ্রান্ত না হতে পারে, সে মনের স্বাভাবিক বৃত্তিকে সংযত করতে না পেরে থাকতে পারে, তবুও জীবন্ত সব কিছুরই যা পরিণতি সেই পরিণতিকে সে সম্মান করেছে, সে চেয়েছে ঘর, সে চেয়েছে পরিবেশ, সে চেয়েছে শান্তির নীড়। সভ্যতার মেকী দানকে স্বীকার করে সত্যকে অস্বীকার করেনি।

এমনি ধারাই হয়ে আসছে জীবন্ত জগতে। গাছ তার ডালপালা মেলে দেয়, ফুল ফোটে, ভ্রমরের অপেক্ষায় বসে থাকে, সেও চায় বহুসৃষ্টির মাঝ দিয়ে নিজের সত্তাকে জাহির করতে, বনের হিংস্র বাঘ তার সঙ্গিনীর আশায় শৈলে শৈলে, সরসী তীরে, বনে বনান্তরালে আহ্বান জানায়; মানুষ উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী, জীবন্ত জগতে সব চেয়ে বেশী তার দান, প্রাপ্যও তার বেশী। তার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় আপনার জনকে খুঁজে পেলে। খাঁ সাহেব আপন জনকে খুঁজেছে, হয়ত পায়নি, এতে অভিনবত্ব কিছু নেই।

প্রভাকেও দেখেছি নিবৃত্তির আশায় অসংযমের আগুনে পুড়ে মরতে, এরামাকে দেখেছি অবলম্বন পাবার আশায় মোহাবিষ্ট, তেমনি দেখে চলেছি কমলাকে। প্রথম জীবন থেকে ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে করতে হঠাৎ মনে হয়েছে কমলা যেন এ সবের ব্যতিক্রম। যার প্রেম পাবার প্রত্যাশা করে না, হৃদয়ধর্ম উত্তেজনার মাপ কাঠিতে ধরা পড়ে না, সেই কমলার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ভেবেছি, বলতে ইচ্ছে হয়েছে ত্যাগ দিয়েই তোমার প্রেম ভাস্বর হয়ে উঠুক। তুমি দিয়েছ, নাও নাই; বিনিময় প্রার্থনা কর নাই, এই তো তোমাকে বিরাট করেছে!

*   *   *

থানা বিহপুর থেকে স্টীমারে গঙ্গা পার হয়ে ভাগলপুর কাছারি। স্টেশনে নেমে গাড়ি ছাড়বার অপেক্ষা করছিলাম।

গাড়ির তখনো অনেক দেরি। তাই আমবাগানের পাশ কাটিয়ে লাল সুরকি দেওয়া পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। দুধারে উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীদের সাজানো বাংলো ; ফুলের বাগান, পাতাবাহারের কেয়ারি, সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা। নয়নানন্দকর তো বটেই, তার উপর আমেজ সৃষ্টি করছিল তাদের বাসিন্দা।

গাছতলায় দাঁড়িয়ে একটা লনে ছেলেমেয়েদের খেলা দেখছিলাম। তারা বল ছুড়ছিল। ছোট টেনিস বল ছোড়াছুড়ি করতে করতে ছুটে রাস্তায় এসে পড়ল।

গড়ান বল দেখে কুড়িয়ে নিয়ে ভাবছিলাম এই বলের মতো গড়াতে গড়াতে এর-ওর পায়ের ধাক্কায় অর্ধেক এশিয়া গড়িয়ে বেড়ালাম, এই বেড়ানর আর শেষ নেই, গড়ানরও শেষ নেই। এই ভাগলপুর আসবার যে বিশেষ কোনো কারণ রয়েছে এমন নয়। কমলার চিঠি পেয়ে এসেছি।

বাংলোর দরজায় কমলাকে পেলাম।

তাকে অনেকদিন দেখিনি, চিনতে পারলাম না। কেমন রোগা হয়ে গেছে, সেই বেগমবাহার খোঁপা আর নেই, কমলার কঙ্কাল, চিনব কি করে।

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

সেও আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কি দেখছেন ? জিজ্ঞাসা করলাম।

চিনতে পারেন ? সলাজ জবাব ভেসে এল।

চেনা চেনা মনে হচ্ছে, আপনি, তুমি রুমা !

তাহলে ভোলেননি। কমলা হাসল।

ভুলেছি ঠিকই, তবে চিনতেও পেরেছি। এসেছিও ঠিকই।

আসুন ভেতরে, এই আমাদের বাংলো, এখানে আমরা থাকি। বাপরে ! কতদিন পরে দেখা। এগারো বছর হবে, নয় কি !

* * *

গৃহশিক্ষকরূপে যেদিন তাকে প্রথম পড়াতে গিয়েছিলাম, সেদিনও যেমন দেখেছি আজও যেন তেমনি দেখলাম।

সামান্য কুশল প্রশ্নের পর নিজের আস্তানা খুঁজতে শহরে আসতে হল। আসবার সময় প্রতিশ্রুতি দিতে হল পুনরায় আসবার।

কমলাদের বাংলোয় আবার এসে দেখা করে গেছি। ক'দিন না আসবার কৈফিয়তও দিয়েছি। যাবার বেলায় বলে গেছি, আমার বন্ধুর ঠিকানা, যেখানে আস্তানা পেয়েছি।

বন্ধু অর্থ কদমভাই। কলেজে পড়বার সময় একই হোস্টেলে থাকতাম। বিদ্যালয়ের স্বল্প বেতনের শিক্ষক তার বাবা। দুঃখ দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে তাকে লেখাপড়া শিখতে হয়েছে। কিন্তু অদ্ভুত মনোবল তার।

পাঠ্যজীবনের স্মৃতি আজও স্পষ্ট মনের কোণায় জেগে ওঠে। একদিন রাতে ডেকে তুললাম কদমকে।

কদম, চল তাল পেড়ে নিয়ে আসি।

তাল! তাল দিয়ে কি হবে? আর পাড়বেনইবা কেন? পয়সায় এক গণ্ডা তাল রেখে মাঝ রাতে তাল পেড়ে আনলে লাভ কি হবে?

পয়সায় একগণ্ডা তাল পাওয়া যায় তা আমার জানা আছে। কিন্তু সেই তাল যদি চুরি করে এনে খাওয়া যায় তার আনন্দ আর কেনা তাল খাবার আনন্দ এক নয় কদম। চল, ওঠ।

কদম উঠল। উঠবার সময় পেতলের পিকলু বাঁশি হাতে করে বের হল।

বাঁশি দিয়ে কি হবে কদম?

কি হবে! তাল পেড়ে কি হবে? আনন্দ। আনন্দকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলতে চাই দাদা।

কদম বাঁশিতে ফুঁ দিল।

বাধা দিয়ে বললাম, লোক জানাজানি হবে যে।

হোক। আমরা তো অভিসারে বের হইনি। সরকারী গাছের কয়েক গণ্ডা তাল পেড়ে আনতে চলেছি। তা জানলেই বা কি, না

জানলেই বা কি। জানেন দাদা, বীরভূমের লাল মাটিতে সোনা ফলে না তাল ফলে, তালের আকর্ষণ তাই সোনার আকর্ষণের চেয়েও অনেক বেশী মিঠে।

কদমকে ভুলতে পারিনি।

ভাগলপুর এলেই কদমের কাছে এসে থাকি। এবারও এসেছি। সেই কদম আর নেই। কোরিনথিয়ানদের সাথে খেলার দিন হকি স্টিক নিয়ে যে কদম আমার পাশে দাঁড়িয়ে শান্তিরক্ষকের অশান্তি দমন করেছিল সে কদম মিইয়ে গেছে।

ছোট বোন এক জোঁড়া সন্তান নিয়ে বিধবা হয়েছে, বৃদ্ধ পিতা শয্যাগ্রহণ করেছে, বৃদ্ধা মা কোনো রকমে সংসার সামলে নিয়ে চলেছে, সেই সাথে কদমেরও হাসি লুপ্ত হয়ে গেছে। কদম হাসে না। স্বল্প আয়ের সংসারে হাসি বিলাস, সে বিলাসকে বর্জন করেছে।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কদম তোমার সে হাসি আর নেই?

হাসি—বলে কদম মুখের দিকে চেয়ে রইল।

দাদা, হাসি আমার বিলাস, চোখের সামনে অর্ধাহারী ঐ পোষ্যদের দেখেও যদি হাসতে পারতাম তাহলে মহাপুরুষ না হয়ে পার পেতাম না। মহাপুরুষ হবার গৌরব আমার নেই, আমার যন্ত্রণায় আমি রৌরবে পচে মরছি।

এর উত্তরে কিছু বলবার নেই, তবুও আত্মপক্ষ সমর্থনের মতো বলেছিলাম, ভারতের শতকরা নব্বইজন লোক এই দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে, তুমিও কেন মেনে নাও না। দুর্ভাগ্যকে মেনে যারা নেয় তাদের হাসি কান্না একই তৌলে ওজন হয়।

হওয়া উচিত নয়। ঐ নব্বইজন লোক যেদিন হাসতে ভুলে যাবে, হাসিকে বিলাস মনে করবে সেই দিনই দুর্ভাগ্য পরাজয় মানবে, নইলে দুর্ভাগ্যের ক্ষত সমাজের সারা দেহে কলঙ্কের আলপনা এঁকে দেবে।

কদম বড় বেশী বাস্তববাদী। তার যুক্তির কাছে নতি স্বীকার করিনি সত্যি কিন্তু যুক্তি দিয়ে তাকে ব্যথিত করতেও চাইনি। শুধু বললাম, জান কদম, আমিও সরকারী চাকরি করতাম, একদিন অজান্তে সরকারী দণ্ড আমার মাথায় এসে পড়ল। সপরিবারে

সেদিন সেই দুর্ভাগ্যকেও হাসিমুখে গ্রহণ করেছি। তারপর যেদিন বহিষ্কারের আদেশ এল, দরজায় সেপাই পাহারা বসল, সেদিন ভয় পাইনি, চিন্তিত হয়েছিলাম। আমার সেই জাগ্রত যৌবনের সুখের দিনটিতে এমন বাধা এসে দাঁড়াল যাকে জয় করতে আরও প্রায় দশটা বছর কেটে গেছে, অথচ তা জয় করতে পারিনি। অভিযোগ নেই, আঘাত দেইনি, অনুনয় জানাইনি, নিজের ক্ষমতাকে এমন ক্ষেত্রে এনে দাঁড় করতে চেয়েছি, যেখানে যোগ্যতার মাপকাঠিতে আমার জয় হবে, কর্মীর কর্মের অভাব হবে না ; আজও সে জয় আসেনি, আজও কর্মকে খুঁজে পাইনি, হয়ত পাব না, কিন্তু হাসিকে হারাইনি, শত শত ঝড়-ঝঞ্চা বাত্যা-বিক্ষোভ নিয়ে দিনাতিপাত করি কিন্তু কারুর সাধ্য হয়নি আমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ মসীলিপ্ত করে। মসীহীন হাসি আমার সান্ত্বনা।

কদম নীরব শ্রোতার মতো মুখ বুঁজে রইল, আমিও কথা না বাড়িয়ে প্রসঙ্গান্তরে ছুটে গেলাম।

আবার সেই কদমের আশ্রয়ে এসেছি।

বিকেলে গঙ্গার কিনারায়, আদমপুরার বাঁধান ঘাটে একাই বেড়িয়ে বেড়াতাম। গঙ্গার আকর্ষণে ভুলে গেছি আমার দায় দায়িত্বের কথা।

একদিন সন্ধ্যায় এসে দাঁড়াল কমলা।

আমার বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, খুঁজে বের করেছি, কেমন ?

পাশে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এত খোঁজ কেন ?

বাঁধান সিড়িতে চেপে বসে কমলা বলল, জানি না। অসহনীয় এই জীবনের মাঝখানটায় হঠাৎ আমার মনের কথা বলবার মতো একজন লোক খুঁজছিলাম। খুঁজতে খুঁজতে আপনার কথা মনে পড়ল, অনেক কষ্টে খুঁজেও বের করেছি। মনে আছে কি আপনার, সেই যে পড়াতে বসে পেনসিল কাটতে গিয়ে আঙুল কেটে ফেলেছিলেন! সেই কাটা আঙুলের রক্ত আমার কপালে দিয়ে বলেছিলেন, কমলা এই তোমার জয়টিকা।

মনে মনে শঙ্কিত হলাম অথচ হেসে বললাম, এত কথাও তোমাদের মনে থাকে।

সেও হাসল। বলল, মনে থাকে। সেন্টিমেন্ট যাদের প্রখর তাদের ঐ সামান্য কথাই বড় হয়ে দেখা দেয়। সেদিন আমি কি বলেছিলাম মনে আছে কি?

ঠিক মনে করতে পারছি না।

আমি বলেছিলাম, হিন্দু কুমারী মেয়ের কপালে লাল দাগ দিতে নেই। দিলে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়।

কমলার বক্তব্য স্পষ্ট, আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। চমকে উঠলাম। বললাম, কি বলতে চাও তুমি?

বলছি সেই বাধ্যবাধকতার কথা। ষোল বছর বয়স ছিল, আজ সাতাশে পৌঁছেছি কিন্তু রক্তের দাগ মেশেনি।

কমলা কথা শেষ করে ধীরে ধীরে রওনা হল, যাবার বেলায় মুখ ঘুরিয়ে বলল, তাই অত সহজে আপনায় চিনতে পেরেছিলাম।

কমলা চলে গেল।

রেখে গেল তার আশাহীন জীবনের অতিগুরুতর কাহিনী। তাকে যদি বলতাম, আমার মহল পাহারা দেবার লোক এসেছে, তাকে ভালবেসেছি, তাকে আপন করে নিয়েছি, তাকে ঘর দিতে পারিনি, মনে মনে তবুও ঘরনী বলে মেনে নিয়েছি তাহলেই বোধ হয় ভাল হত। ভেবে দেখলাম, একথা তো তার অজ্ঞাত নয়।

কমলা কি ছাপ রেখে গেল তা জানি, আরও জানি এর তলায় প্রচণ্ড অভিমান আর অতৃপ্তির কাহিনী রয়ে গেলে।

আবার তার সাথে দেখা হল পরদিনই।

জিজ্ঞাসা করলাম বিয়ে করনি কেন কমলা?

সময় পাইনি। একবার ঠিক করেছিলাম বিয়ে করাই আমার উচিত। কবে কে আমার কপালে রক্তটিকা এঁকে দিয়েছে তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকা আমার উচিত নয়, বিবাহ যেখানে অবলম্বন সৃষ্টি করে, নিজের সত্তাকে উন্মেষ করবার সুযোগ দেয় সেখানে বিয়ে না করাটা অপরাধ।

তবুও বিয়ে করলে না কেন ?

ভাবতে ভাবতে অসুস্থ হয়ে পড়লাম, মনের মতো পাত্র জুটল না। রোগ বৃদ্ধি পেতে লাগল। তারপর একদিন আশ্রয় পেলাম হাসপাতালে। হাসপাতাল আমার জীবনের রোমান্সের আদি আর অন্ত।

কমলা সেদিনও তার কথা শেষ না করে উঠে গেল। যাবার সময় জানতে চাইল আর ক'দিন আমি থাকব। অনির্দিষ্টভাবে উত্তর দিলাম, ছ-সাত দিন হতে পারে।

তাহলে আমাদের ওখানে আসবেন কাল বিকেলে। বলেই সে বেরিয়ে গেল।

কদম প্রোগ্রাম ঠিক করেছিল নাথনগর যাবার।

শহর পেরিয়ে রেল লাইনের পাশ বেয়ে নাথনগরের দিকে যেতে যেতে কদম বলল, আজ গিয়ে কাজ নেই।

হঠাৎ মত বদলালে কেন ?

আজ সকালে খবর পেলাম নাথনগরে কলেরা আরম্ভ হয়েছে। গত তিন চারদিনে আট দশজন মারা গেছে।

তাই ফিরে যেতে হবে ?

আমার বক্তব্যে রূঢ়তা ছিল না, ছিল ব্যঙ্গ। কদম তা উপলব্ধি করেই বোধ হয় জোরে পা চালাতে লাগল।

অত জোরে ছুটছ কেন ?

ভয়কে জয় করতে। কদম মুখ ফিরিয়ে হাসল। বড়ই বিষাদময় সেই হাসি।

আবার বলল, কৈশোরের কদম মরে গেছে দাদা। আজ কদম ভারবাহী গাধা, অতি ভারে ন্যুব্জ তার দেহমন। সেদিনকার কদম বেঁচে থাকলে নাথনগরের কলেরায় কদম ঘরে বসে থাকত না। নাথনগরেই সে ঘর বাঁধত।

মেঠো পথে নেমে এসেছি। চাষীরা দল বেঁধে জটলা করছে। বোধ হয় তাদের আলোচ্য বিষয় ওলাউঠা। আমাদের দেখে সরকারী টিকাদার অথবা ঐ জাতীয় কিছু মনে করে বিরক্তির সাথে উঠে

দাঁড়াল। যখন বুঝল আমরা সরকারী লোক নই তখন বিরক্তির সাথে তাচ্ছিল্য ফুটে উঠল তাদের চেহারায়।

কদমকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওরা অমন তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাল কেন?

আমাদের সাথে দু রকম পার্থক্য রয়েছে ওদের। প্রথমত, এমন ভাবে প্রাদেশিকতা ছড়ান হয়েছে যার ফলে ওরা আমাদের স্বজন বলে গ্রহণ করতে পারে না, দ্বিতীয়ত, ওরা জানে বাবুদের সাথে ওদের পার্থক্য কোথায়। যতই আপন করে ওদের ভাবি না কেন, যতই আপন করে ওদের কাঁছে আমাদের বিলিয়ে দিই না কেন, সেন্স অব রিজেকশান ওদের মজ্জাগত হয়ে রয়েছে, যার ফলে ওরাও বাবুরদলকে তাচ্ছিল্য করতে শিখেছে। ওরা আবহমানকাল জেনে এসেছে বাবুদের সাজগোজের তলায় লুকিয়ে রয়েছে শোষণের দুষ্ট প্রবৃত্তি। খেটে খাওয়া ক্ষেতমজুর কখনো পরগাছা মানুষকে ভালবাসতে পারে না।

নাথনগরের গড় বেড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যাবেলায় ফিরে এলাম। গড়ের কিনারায় মহাবীরের পূজার আয়োজন থেকে বুঝতে পারলাম, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার চেয়ে অবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ওলাউঠাকে গ্রাম-ছাড়া করতে ওরা বদ্ধপরিকর। কলেরার টিকায় 'বোখার হোতা হ্যায়' তার চেয়ে বিনা বোখারের মরন তাদের অনেক বেশী কাম্য। নাথনগর অজ পল্লী নয়, ধনাঢ্যের হর্ম্যের ছায়ায় সহস্র সহস্র মানুষ আধা-শহরী জীবন যাপন করে, শহরের সাথে তাদের নিত্যকার যোগাযোগ রয়েছে, তবুও তারা শহুরে জীবনযাত্রার ভাল দিকটা দেখতে পায়নি। মনে হয় কেউ দেখিয়ে দেয়নি। ফেরবার পথে গঙ্গার কিনারা বেয়ে আসছিলাম। জেলে ডিঙি ছোটাছুটি করছে, নদীর তালে তাল দিয়ে ডিঙি যেন নেচে চলেছে, নদীর মৃদু কলতান, ঘরমুখো গরুর গলায় বাঁধা ঘণ্টার টিম টিমে আওয়াজ, সন্ধ্যার প্রথম আবেশমাখা আকাশী গেরুয়া আর নদীর বুকে তার আবছা প্রতিবিম্ব, নদীর বুক বেয়ে মন্থর গতিতে ভেসে আসা ফাল্গুনী বাতাস, সব মিলে উদাস করে তুলল।

কদম তখন জোর কদমে চলেছে। ছাত্র পড়াবার সময় হয়ে গেছে। বিলম্বে মানহানি, অর্থহানি অনেক কিছুর হানির সম্ভাবনায় সে ব্যস্ত। ইচ্ছে ছিল আমবাগানের কিনারায় বসে নদীর সাথে গল্প করি, নদীর স্রোতের সাথে মন ভাসিয়ে দেই, তা আর হল না।

পরের দিন বিকেলবেলায় আবার বের হলাম নাথনগরের পথে। কমলার নেমতন্ন ছিল, তা খেয়াল করিনি। আজকে একা তাই নদীর কিনারায় বসে পড়লাম। জেলে ডিঙিতে লণ্ঠন জ্বালান হয়েছে। নদীর ছোট ছোট ঢেউয়ে লণ্ঠনের আলো লাফিয়ে লাফিয়ে যেন লুকোচুরি খেলছে, মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক, পেঁচার ক্রুদ্ধ চীৎকার, বাদুরের ঝটপটানি কানে ভেসে আসছে। ফিকে জোৎস্নার রজত-তরঙ্গ উন্মাদ করে তুলছিল।

বাসায় ফিরে দেখি কমলা বসে রয়েছে।

তোমার আজ আমার ওখানে খাবার কথা ছিল ?

লজ্জিতভাবে বললাম, সে কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম।

ভুল ! তা হবে বৈকি। আমার চিঠি পেয়েই এদেশে এসেছ, অথচ আমাকেই ভুলে গেছ। আশ্চর্য ! চল।

কমলা সহজভাবে 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি'তে দাঁড় করিয়েছে। তার এই অতি আপন ভঙ্গীতে একটু ভয় পেয়ে গেলাম। তার অনুরোধকে আদেশ মনে করেই বেরিয়ে পড়লাম।

কোথায় ছিলে এত রাত অবধি ?

গঙ্গার কিনারায় আমবাগানে।

সর্বনাশ ! ও কাজ আর কখনো কর না। জান না ঐ সব বাগানে বুনো শুয়োর আর সাপের কি রকম উৎপাত।

তা হতে পারে।

অত তাচ্ছিল্য ভাল নয়, বুঝলে।

তাচ্ছিল্য নয়। তবে ভয়কে আস্কারা দিলে ভয় মাথায় চড়ে বসে।

তা বই কি। আচ্ছা আমার কথা তোমার কখনো মনে হত না ?

প্রশ্ন অতি কঠিন। কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না।

কৈ জবাব দাও ?

চল আদমপুরার ঘাটে গিয়ে বসি, সেখানে তোমার কথার জবাব ভেবেচিন্তে দিতে পারব।

তা পারবে। না ভেবেই কিছু বল না কেন?

সত্যি কথা শুনলে খুশী হবে কি?

খুশী অখুশীর প্রশ্ন অনেক দিন আগেই মিটে গেছে, আজ শুধু শুনতে চাই। তুমি বলবে, লাভ কি? আমি বলব, লাভ লোকসান হিসাব করবার যোগ্যতা আমার নেই।

তাহলে বলব, গত এগারো বছরে তোমায় মনে করবার ফুরসত পাইনি। তোমার চিঠি না পেলে আরও কত বছর কাটত কে জানে।

কমলা হেসে উঠল। সংযতভাষী কমলার হাসি আমায় কষে চাবুক মারল। তবুও বললাম, আর তুমি?

সেদিন যে বললাম হাসপাতালের কড়িকাঠ গুণতে গুণতে রোমাঞ্চের আমেজে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম, সেই আমার আদি সেই আমার অন্ত। গোপনে ভেনাসদেবী হাসপাতালকে তার পীঠস্থান গড়ে তুলেছিল। সবাই তো জানত আমি বাঁচব না, তাই দয়া করে বিকেলবেলায় অনেকেই দেখতে আসত, আহা বলত। বেশ লাগত। তারপর একদিন ...

কমলা থেমে গেল, জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর একদিন কি হল?

একদিন, ও সেইতো আমার রোমান্স সৃষ্টির প্রথম পর্ব। বৌদির ছোট ভাই হাসপাতালে এল বৌদির সাথে। কলেজের ছাত্র, ডাক্তারি পাস করতে কয়েকটা মাস বাকি। সে এল কতকগুলো বেলফুল হাতে করে। মাথার বালিশের কাছে ফুলগুলো রেখে দিয়ে প্রবীণ ডাক্তারের মতো নাড়ী টিপে দেখল। সেদিনকার মতো ঐখানেই শেষ।

তারপর থেকে রোজ দুবেলা এসে দেখে যেত, কোনো দিন, ফুল কোনো দিন ফল হাতে করে আসত। সত্যি বলছি তার উপর কেমন মায়া জন্মাল; মুখফুটে বলতে পারিনি কোনো দিন, কিন্তু সেই অষ্টাদশ বসন্তের রুগ্ন মুকুল তার পথপানে চেয়ে থাকত সারাদিন। ভরসা হল, মনে শক্তি সঞ্চয় হল, আমি বাঁচব। একদিন সে আসতেই চীৎকার করে বললাম, সুবীর আমি বাঁচতে চাই, বাঁচার মতো বাঁচতে চাই।

কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, তুমি বাঁচবে, নিশ্চয়ই বাঁচার মতো বাঁচবে।

কপাল থেকে তার হাত টেনে নিলাম আমার শীর্ণ হাতে। কত কি যে বলবার ছিল বলতে পারলাম না, কেঁদে ফেললাম। রুমাল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে সে উঠে গেল।

তার পরীক্ষার দিন এগিয়ে এল, আমিও ক্রমশ নিরোগ হতে থাকলাম। পরীক্ষার তাড়ায় সেও আসা-যাওয়া কমিয়ে দিল। আমি খুশী মনেই তার অনাগমনকে গ্রহণ করেছিলাম।

পরীক্ষা দিয়ে সে দেশে চলে গেল। আমার আর হাসপাতাল থেকে মুক্তি ঘটল না। খবর পেলাম, সে পাস করেছে।

আশা করছিলাম সে নিজে এসে বলে যাবে। সে এল না। ভাবলাম চিঠি দেবে, তাও দিল না। আমি নিরাশ হলাম। হাসপাতালে থাকতে থাকতেই শুনলাম সে বিলেত যাচ্ছে। সরকার খরচ দিয়ে তাকে বিলেত পাঠাচ্ছে। মনের আনন্দে কেঁদে ফেললাম। নিশ্চিত জানতাম সে দেখা করতে আসবে। দু বছর হাসপাতালে থেকেও আনন্দহীন হইনি। আশা রইল মনে, সে আসবেই আসবে।

এল একদিন।

বলল, রুমা কালকের জাহাজে বিলেত যাচ্ছি।

শুনেছি। অভিমানের সুরে বললাম।

সুবীর কোনো কথা না বলেই উঠে যাচ্ছিল। ডাকলাম।

বললাম, রাগ হল বুঝি। ভুলেইতো গেছ, আরও বেশী করে ভুলে যাবে এবার।

সুবীর বসল।

বললাম, সুবীর আমি বেঁচে উঠেছি, এবার বাঁচার মতো বাঁচতে দাও।

সুবীর গম্ভীরভাবে মুখের দিকে চেয়ে থাকল, বলল, তুমি বোধ হয় ভুলে গেছ রুমা আমি ডাক্তার। ডাক্তারের ধর্ম রোগীকে নিরোগ হতে সাহায্য করা।

সুবীরের কথাগুলো অতি স্পষ্ট। চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে সব কিছু ডাক্তারি ধর্ম! তার বেশী কিছু নয়?

না। তোমাকে বাঁচান আমার ধর্ম, সেই ধর্মপালন করতে অভিনয় করেছি। তুমি কেন, যে কোনো রোগীকে বাঁচাতে হলে অভিনয় করতে প্রকৃত ডাক্তার কখনো পেছপা হয় না।

উত্তেজিতভাবে বললাম, তুমি যাও সুবীর, তোমার কথা আমি সহ্য করতে পারছি না। অভিনয় সহ্য করেছি, বাস্তবকে সহ্য করতে পারছি না, তুমি যাও, তুমি যাও।

আমার চীৎকারে নার্স ছুটে এল।

সুবীর ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল।

তাই বলছিলাম, হাসপাতালই আমার আদি আর অন্ত।

তারপর আরও কত বছর কেটে গেছে। সুবীরকে মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করেছি। ভেবে দেখেছি সেদিনকার সেই উত্তেজনা অহেতুক। আমার মনেও তো সুবীর কোনো রেখাপাত করেনি। সেদিন যদি সেই উত্তেজনার মুখে সুীবর নিজেকে বিলিয়ে দিত, আমিও নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম, যা খুব সম্ভব ছিল, তাহলে কি যে সর্বনাশ হত আজ তা বুঝছি।

কমলা চুপ করে গেল।

আমি তন্ময় হয়ে তার কাহিনী শুনছিলাম। বললাম, আদি আর অন্তের পরেও তো কিছু থাকতে পারে।

আমার কাছে নেই। অন্যের কাছে যে নেই তাই বা বলি কেমন করে। হয়ত অন্য কেউ হলে থাকত।

ওটা তো দার্শনিক তথ্য। তোমার কিছু বক্তব্য নিশ্চয়ই আছে।

বক্তব্য নেই, ভাবছি অবলম্বনবিহীন হয়ে চিরটা জীবন কাটাতে পারব কি করে। আজকে দাদার বোন হয়ে রয়েছি, তার সামর্থ্য রয়েছে, হেসেখেলে দিন কাটছে, এমন দিন শীগগীরই আসবে যেদিন আমাকে আত্মরক্ষার চিন্তাও করতে হবে।

কমলা চিন্তিতভাবে মুখ ফিরিয়ে বসল। আমি প্রবোধ দেবার

মতো করে বললাম, আমার তো ঘর নেই, তবুও আমার তাঁবুর দরজা খোলা রইবে তোমার জন্য।

কমলা আশ্চর্য হয়ে বলল, কি বলছ?

বলছি, মানুষ অবলম্বন চায় না, মানুষ চায় স্নেহের আধার, সেই স্নেহ অকৃপণভাবে তোমার জন্য জমা রইল। যে রক্ত তোমার কপালে এঁকে দিয়েছিলাম, সেই রক্ত দিয়ে তোমার জীবনকে অসার্থকতার মাঝেও পরিতৃপ্ত করতে চেষ্টা করব।

প্রতিশ্রুতি দিলাম। ওজন না বুঝেই প্রতিশ্রুতি দিলাম। পরিণতি সেদিন চিন্তা করিনি। দুজনে উঠে পথ ধরলাম। ভিন্নমুখী চিন্তার ধাক্কায় দুজনেই নীরবে বাংলোর দরজায় এসে গেলাম।

জীবনের সব প্রাপ্যকে হারিয়ে আমি ভগ্নপদ সৈনিক। ভাঙা তলোয়ারখানা মাঝে মাঝে ঘসে মরচে তুলে চকচকে করতে চাই। এই আমার সহস্র অপরাধের মাঝখানটায় একটি মাত্র সান্ত্বনা। সেই সান্ত্বনার একটি কণিকা তাকে ভাগ করে দিতে পারব কি!

তার পরও আরও বছর কেটে গেছে, অকৃপণ স্নেহ উভয়পক্ষীয়, তাই প্রয়োজনবিহীন জীবনের বল্গাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চেষ্টা করছি। আজ সেও আমাদের একজন। তাকে বাদ দিয়ে কোনো মেনু তৈরি হয় না, কেন তা জানি না।

একদিন জিজ্ঞাসা করল, গুড আর্থ পড়েছ?

হাঁ, পড়েছি।

আচ্ছা বলত জেসমিন কেন ওয়ানের [illegible]কের তলায় আশ্রয় নিল? বৃদ্ধের আশ্রয়কে যুবতী অত নিরাপদ মনে করল কেন?

হেসে বললাম, জেসমিনই সেকথা বলেছে। বুড়োরা ভালবাসে, অত্যাচার করে না। তাদের মন স্থির, দেহ অচল, তারা সত্যি কথা বলে, তারা ভালবাসতে জানে।

কমলা হাসল।

বললাম, তাই তুমি কোনো বৃদ্ধের আশ্রয় খুঁজছ!

অনুপাতের গড়ে তোমাকেই বুড়ো মনে করে নিয়েছি।

কমলা হেসে গড়িয়ে পড়ল।

ওয়ানের মন কিন্তু বার্ধক্যের ছাপে নিস্তেজ নয়।

হেসেই বিদায় দিলাম। কমলা আমার কাছে এত স্পষ্ট, এত স্বচ্ছ যে তাকে বিশ্লেষণ করবার দরকার হয় না।

একদিন উপদেশের সুরে বলে, চুপ করে বসে থেক না, কিছু কাজ-কর্ম কর।

করা তো উচিত। যেদিন কাজের তলায় নিজেকে হারিয়ে ফেলব, সেদিন তোমাকেও হারিয়ে ফেলব। সেই ভয়েই তো কাজ করি না।

তোমার সংসার চলবে কি করে ?

কেন, তুমি আছ।

আমি তো পিয়ারী বাইজী নই, বৈঁচি ফুলের মোহে তোমার সংসারকে টেনে বেড়াব। মেয়েদের মনের কথা মোটেই বোঝ না। তারা যে ঘর চায়, বর চায়, সম্পূর্ণভাবে রাজত্ব করতে চায়।

বললাম, তাই হবে।

গম্ভীর হয়ে বলল, তোমাকে বোঝাতে পারব না! তোমার বউকে বরং জিজ্ঞাসা করে নিও।

তাই নেব। কিন্তু তুমি তো ওসব মেয়েদের চেয়ে আলাদা।

তা বটে। চেহারায়, মনে নয়।

শিলচরে তার একখানা চিঠি পেয়েছিলাম। অতি সাধারণ পোস্টকার্ড। কোনো খবর বহন করে আনেনি, শুধু একটি জিজ্ঞাসা, 'কবে তুমি আসবে ?'

হঠাৎ একদিন বলেছিল, আমি বিয়ে করব।

অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

বিনিয়ে বিনিয়ে বলল, বুঝতে পারলে না, তোমার দারিদ্র্যকে সহ্য করতে পারছি না। আমার বাস্তব কোনো অভাব তো নেই, তোমার অভাব-অভিযোগ দেখে আমার বুক ফেটে যায়। কাল সারারাত ভেবেছি কোনো ধনীর দুলালকে বিয়ে করতে পারলে তার কাছ থেকে

কিছু আদায় করে তোমার আর্থিক দৈন্য ঘোচাতে পারি। তাই ঠিক করেছি বিয়ে করব। প্রার্থীর অভাবও নেই।

আমি না হেসে পারলাম না।

হাসলে কেন?

শরৎবাবুর দত্তা পড়েছ? নেড়া বটগাছতলায় জগদীশ, বনমালী আর রাসবিহারী কি প্রতিজ্ঞা করেছিল মনে আছে?—কল্পনাবিলাসীরা নানারকম উদ্ভট কল্পনা করে, বাস্তবত তার কোনো মূল্যই নেই, বুঝলে। তবে তুমি ঘর পাও ঘরণী হও, সেটা আমি মনেপ্রাণে চাই। কিন্তু ছেলেমানুষি কর তা চাই না।

কমলা ক্ষুণ্ণ হল। হয়ত সে পরে বুঝেছে এই উদ্ভট আবিষ্কার বাস্তবের সংঘাতে কোনো স্থান-ই গড়ে নিতে পারব না।

কমলার খেয়াল আর খুশীর খোরাক জোটাতে জোটাতে হাঁপিয়ে পড়তাম। কমলা যে কি চায় বুঝতে পারি না। এমন নির্লিপ্তভাবে কেনইবা ভালবাসে, কেনইবা ছুটে আসে তার প্রতিদিনকার কাহিনী দিয়ে আমায় সজাগ করতে!

সুবীরের প্রত্যাখ্যান তাকে পুরুষবিদ্বেষী করেনি, করেনি কেন না সে বোঝে পৃথিবীতে সুবীরের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

একবার কমলার চিঠি পেয়েছিলাম।

সে চলেছে। কোথায় যাবে তা জানায়নি। শুধু জানিয়েছে সে কলকাতার জীবনকে ভালবাসে না, তাই মুক্তি খুঁজতে বেরিয়ে যেতে চায় অজানার পথে। অথচ ক'দিন আগে তার চাকুরিস্থল কলকাতার বাইরে হওয়াতে সে চাকুরি গ্রহণ করেনি। বুঝতে পারলাম না।

ঠিকানাও দেয়নি যে তাকে চিঠি লিখব। পরবর্তী চিঠির প্রত্যাশায় বসে থাকা বিনা উপায় নেই।

চিঠি এল না, এল সে নিজে।

তোমার না কলকাতা ছেড়ে যাবার কথা। বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম।

যাওয়া হল না।

কেন?

জানি না, সে কেঁদে ফেলল।

যাওয়া আমার হতে পারে না, আমি যেতে পারব না।

বছরের পর বছর পেরিয়ে গেছে, কোনো দিন তাকে ক্লান্ত হতে দেখিনি, বয়স তার মুখে গাম্ভীর্যের রেখা টেনে দিতে পারেনি। লিক-লিকে দেহটা নিয়ে তালপাতার সেপাইয়ের মতো তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে বেড়ায়। অবসর পেলেই ছুটে আসে আমার আস্তানায়।

একদিন বলল, কি ন্যাস্টি তোমরা। আর কখনো আসব না। বলেই কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে ঢকঢক করে গলায় ঢেলে দেয়। রাস্তায় বেরিয়েই প্রতিশ্রুতি ভুলে যায়, আবার ছুটে আসে, আবার এসে সেই একই কথা বলে, আর কখনো আসব না। আমি জানি, সে আসবে চিরকাল, যতদিন বাঁচবে ততদিন বাঁচার মূল্য সে সুদে আসলে আদায় করবে।

আজ নিভৃতে বসে তার কথাই ভাবছিলাম। মনের দর্পণে তার সরল সুঠাম মুখখানা ভেসে উঠল, মনটা তোলপাড় করে দেখলাম, সেই শুধু ভালবাসে নাই, সে ভালবাসা আদায়ও করেছে। অজ্ঞাতসারে তাকে আপন করে ভেবেছি, তার খেয়ালখুশির অত্যাচারকে স্নেহের অবদান বলে ভাবতে শিখেছি। হয়ত এই পরিবেশ ঢিমিয়ে যাবে, হয়ত কঠিন আঘাত আসবে, তবুও আজকে যা সুন্দর তাকে কালকের ভাবনায় অসুন্দর মনে করতে পারি না, পারবও না। এগারটা বছরেও পুরাতন হয়নি, সে যেন চির বর্তমান। অতীত ও ভবিষ্যতের রেখা তার কল্পলোক, বর্তমান তার আপন জন।

কাল সকালে আবার যাত্রা হবে শুরু।

আজকে তাই অনেক বেশী চিন্তা করে ফেলেছি।

বিকেলে আনমনা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে এসে গেছি। সেখান থেকেই পাহাড় শুরু। উঁচু নীচু টিলার বুক কেটে পিচের রাস্তা আর রেলপথ পাশাপাশি ছুটে চলেছে। পাশেই চা-বাগান, পাহাড়ী ঝরনার উপর লোহার সাঁকো, সাঁকোর

বুকে দার্জিলিং যাবার রেলপথ। পা ঝুলিয়ে রেলপথের ধারে সাঁকোর মাথায় বসলাম। নিস্তব্ধতা মনের কমনীয় বৃত্তিকে সতেজ করে তুলছিল, মাঝে মাঝে ছোট ছোট বাস ও অন্যান্য চলতি গাড়ি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল সত্যি, কিন্তু মনের কোনোই পরিবর্তন হচ্ছিল না। সাঁকোর ওপারে ছোট একটা রেল স্টেশন। এপাশে একখানা দোচালা টিনের ঘর। পায়রার খোপের মতো কয়েকটা খোপ। রেলের পোর্টারদের বাসস্থান। সেই টিনের দোচালার তলায় যেটুকু বারান্দা তারই খানিকটা দরমা দিয়ে ঘিরে তারা রসুইখানা করে নিয়েছে। পাহাড়ী পোর্টাররা খুব নিশ্চিন্তে নিশ্চয়ই সেখানে বাস করে, নিশ্চিন্ত আর্থিক দিক থেকে কি না বলা দুষ্কর তবে নিশ্চিন্ত হবার মতো আশ্রয় সেটা নিশ্চয়ই।

প্রয়োজন তাদের কম, শহরের গমগমানি নেই, বিলাসের হাতছানি নেই, অপরের চোখ ধাঁধাবার কমপিটিশন নেই। তাই তারা নিশ্চিন্ত। একবোঝা শুকনো কাঠ নামিয়ে তাদের একজন ঘরের তালা খুলে সংসারের কাজে লেগে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিশুকে পিঠে বেঁধে এসে দাঁড়াল তার স্ত্রী।

রমণী তার শিশুকে শুইয়ে এসে নিজের দেহের পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে উঠল। স্বামী তখন উনুনে আগুন দিয়ে ভাঁড়ে করে জল তুলে দিয়েছে, স্ত্রী তখন ভাঙা চিরুনি দিয়ে কেশ প্রসাধন করছে।

গুটি গুটি উঠে এসে তাদের ঘরের সামনে দাঁড়ালাম। রমণী মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, কি চাই?

জল।

আয়না চিরুনি রেখে সে লোটা বের করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

স্বামী কাঠের ছোট টুল টেনে বসতে দিল।

এখানেই বুঝি থাক? রেলে কাজ কর? আলাপ জমাবার চেষ্টায় প্রশ্ন করলাম।

হাঁ বাবুজি। আপনি?

বেড়াতে এসেছি।

বাগানে?

না, শহরে। বেড়াতে বেড়াতে তোমাদের এধারে এসেছি।

খুব ভাল কথা। অনেক বাবুই এধারে বেড়াতে আসে, রোজই দেখি।

রমণী ঝরনা থেকে লোটা মেজে পরিষ্কার করে জল নিয়ে এসে সামনে রাখল।

এসব জায়গা কেমন লাগে তোমাদের।

আমাদের বাপঠাকুরদার দেশ, ভাল লাগবে বইকি।

তোমরা কখনো কলকাতা যাওনি।

দরকার হয়নি বাবুজি। পাহাড়িয়া লোক পাহাড় ছেড়ে নীচে যেতে ভরসা হয় না।

তোমাদের মতো লোককে তো দেখেছি কলকাতায়।

তা বটে। ওরা, ওরা কেন, আমরা সবাই বড়ই গরীব বাবুজি। পেটের দায়ে বাপঠাকুরদার জমি ছেড়ে ছুটে যেতে হয়, নইলে বাঁচব কি করে। আমি রেলে চাকরি করি, সবাই তো তা করে না। তাদের কাজ খুঁজতে হয় চা-বাগানে, নয়ত চাষবাস করতে হয়। চাষের জমি কোথায়, আর যা আছে তার মালিকানা তো পাহাড়ীদের নেই বললেই হয়।

স্বামী গল্পে জেঁকে বসল, স্ত্রী চা তৈরি করল। মাটির ভাঁড় পরিষ্কার করে গরম চা এগিয়ে দিল।

সন্ধ্যা হতে বড় বেশী দেরি নেই।

উঠলাম।

বসুন।

না, সন্ধ্যে হয়ে গেল। অনেকদূর যেতে হবে।

সাতটায় শেষ গাড়ি, সেই গাড়িতে যাবেন। বসুন, রুটি খেয়ে যান। আপনি দয়া করে এসেছেন।

সামান্য প্রতিবাদ জানালাম। কিসের আকর্ষণে বসতে বাধ্য হলাম। বসলাম।

রমণী ক্ষিপ্র হস্তে রান্নার যোগাড় করে নিল, পাহাড়িয়া পুরুষ স্বয়ং রাঁধতে বসল। তারা দুজনে একসাথে কাজ করে চলেছে, আমি তাদের পাশে বসে কাজ দেখছিলাম, গল্প করছিলাম। উনুনের তপ্ত শিখায় পুরুষটির হলদে মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

কয়েক গণ্ডা রুটি সেঁকে ঘি মাখিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিল।

কাঁসার থালায় রুটি, লোটা ভর্তি জল, এক বাটি দই সামনে রেখে বলল, এবার দয়া করুন।

এত ঘটা করে নেমন্তন্ন জানিয়ে দই-রুটি খেতে দেবে তা ভাবতেও পারিনি। সেই দইও মিষ্টিবিহীন, কয়েক দিন পূর্বে তৈরী, টকে জোঁদা হয়ে গেছে। সুস্থ রুচি নিয়ে ঐ দই খাবার প্রবৃত্তি কারুরই হত না। তার সামর্থ্য সীমাবদ্ধ, হৃদয়বৃত্তি উন্নত কিন্তু আহারের প্রবৃত্তি আমার নিজস্ব। দই আর রুটিতে রয়েছে তার প্রাণের প্রলেপ তাই প্রবৃত্তি বাধা মানল না।

আধখানা রুটি আর অতি সামান্য দই খেয়ে নেমন্তন্ন রক্ষা করলাম।

অতিথিপরায়ণ পাহাড়িয়া পোর্টার জাতিতে ব্রাহ্মণ। অতিথির পরিচর্যা শেষ করে, আমার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে খেতে বসল। খাওয়া শেষ করে অতি যত্নের সাথে কপালে তিলক দিয়ে রামজিকে স্মরণ করে লণ্ঠন হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তায় এসে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমিই সব রান্না করলে দেখলাম, তোমার স্ত্রী কি অসুস্থ।

না বাবু, ও ছোট জাত। আমি ব্রাহ্মণ আর ও ভেইশ্যা। ওর হাতে পাকান খাবার খেলে জাতে আটক হব বাবুজি।

তোমার স্ত্রী, তার হাতে খেলে তোমার জাত যাবে?

আমাদের দেশে ব্রাহ্মণের বড়ই সম্মান।

কিন্তু তোমার ছেলে মেয়েরা।

ওরাও ব্রাহ্মণ।

ছেলেমেয়েরা মায়ের হাতে খাবে না না কি?

মায়ের হাতে খেলে দোষ নেই।

স্ত্রীর বেলায় দোষ।

আমাদের শাস্ত্রবিধি অমান্য করতে তো পারি না। ব্রাহ্মণ সব জাতকে বিয়ে করতে পারে, তা বলে ব্রাহ্মণ বিয়ে করলেই মেয়েরা ব্রাহ্মণ হয় না।

তা বটে। মহাভারত রামায়ণে এই রকম নিয়মই না কি আছে।

ঠিক বলেছেন বাবুজি, উৎফুল্ল হয়ে সে আবার বলতে লাগল, ভীমসেন রাক্ষসী শাদি করল, বিশমিত্তির ঋষি মেনকাকে শাদি করল।

ভাগ্যি ট্রেনের আলো দেখা গিয়েছিল নইলে একটা ইতিহাস হয়ত সে মুখস্ত বলে দিত।

তাড়াতাড়ি টিকিট কেটে প্রস্তুত হয়ে নিলাম।

গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে পাহাড়িয়া পণ্ডিত হাত জোড় করে বলল, সেলাম বাবুজি, আবার কাল আসবেন, একটু সকাল সকাল আসবেন।

*

হোটেলে ফিরে এসে আজ বিশ বছরের কাহিনী লেখা আংশিক শেষ করছি।

যে পত্রের সূচনা হয়েছে তালাতনৈ-এর ত্রিতল প্রাসাদে, প্রাচ্যের ভেনিসে, সেই পত্রের পরিসমাপ্তি ঘটুক শিলিগুড়ির এই টিনের দোতলায়। সারা জীবনের সুখদুঃখের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গিনী তুমি, তোমার দৃষ্টির অন্তরালে যা ঘটেছে তারই আলেখ্য উন্মোচন করছি, যে বিরাট জিজ্ঞাসার সমাধান খুঁজে বেড়িয়েছি দেশে দেশান্তরে, প্রাসাদে পর্ণকুটিরে, নরনারীর দেহে ও হৃদয়ে, হাসিতে কান্নায়, দেওয়া-নেওয়ার সংঘর্ষে ও সম্প্রীতিতে তারও পরিণতি কি তাও ভেবে দেখতে বসেছি। তুমিও দেখ, দেখবে সবারই অন্ত রয়েছে, জীবন্ত মানুষের ভাবনার কোনো অন্ত নেই। অন্তহীন চিন্তারাজ্যে বাস্তবের ঘাত প্রতিঘাতে জর্জরিত মানুষকে ভালবেসেই সুখ, নিজের সুখের সৌধ রচনা করতে অপরকে বঞ্চনা করলেই দহন, সেই দহনে পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বাকি ক'টা দিনকে আর কষ্টজনক করতে চাই না। তোমার দুর্ভাগ্যের হয়ত পরিসমাপ্তি আসবে না, তোমার চির-বাসনার ঘর তুমি হয়ত পাবে না তবুও ধিক্কার দিও না জীবনকে, অভিযোগ উত্থাপন কর না। তোমার আমার মতো হাজার হাজার মানুষের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস বিষাক্ত, তাকে আরও বিষাক্ত করতে চেও না। যে জীবনের জন্ম এই ধরণীর কঠিন মৃত্তিকায়, সে জীবনের পরিসমাপ্তিও এই কাঠিন্যের মাঝে। এস আমরা হাত ধরাধরি করে ছুটে চলি সেই

জীবনকে মানুষের চলার পথ তৈরি করতে বিলিয়ে দিতে। আমাদের দানে গড়ে উঠুক ভবিষ্যত মানুষ।

আজ রাতে এই শীতের আবেশে মনে হচ্ছে ব্যর্থ হয়নি আমার এতদিনকার পরিক্রমা, এতদিনকার জানবার, বাঁচবার, বাঁচাবার অক্লান্ত প্রচেষ্টা। দেশ দেশান্তর থেকে রত্ন খুঁজে এনেছি, সেই আঁচলে বেঁধে জানার গৌরবে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। এ কি কম সৌভাগ্য!

তারপর।

কাহিনী অসমাপ্ত রইল। বিশ বছরের কাহিনী বিশ হাজার পৃষ্ঠায় লেখা হয় না, এই সঙ্কলন শুধু তার মুখপত্র, এলোমেলো ছিন্নপত্র।

রইল লুকিয়ে মানুষের কাঁদা, বুভুক্ষার আর্তনাদ, অত্যাচারীর গরিমা। সব কিছু বলতে গেলে নিশ্চল হয়ে উঠবে লেখনী। প্রাণহীন লেখনীও হয়ত ডুকরে কেঁদে উঠবে।

তার চেয়ে বারান্তরের আশায় বসে রই, সেদিন আমার তোমার জল্পনা-কল্পনার ভিত শক্ত করে নিতে পারব। সেইদিন বলতে পারব বাকি জীবনের কাহিনী,—ছন্নছাড়া কেন চাইল ঘর।

রইল আমার শুভেচ্ছা, এই রয়েছে দেবার, আর তো কিছু নেই। এ শুভেচ্ছা অক্ষমতার আর্তনাদ মাত্র। এতেই খুশী থেক।

শিলিগুড়ি
মার্চ ১৯৫৪